সূত্রধার

সম্পাদিত

।। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ।।

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি: ৯

শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, জ্যোতির্ময় বসু রায়
সেবাব্রত গুপ্ত

—করকমলেষু

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব: নাট্যরচনা ও নাট্যরূপ শিক্ষা

দ্বিতীয় পর্ব: অভিনয় ও অভিনেতা

তৃতীয় পর্ব: নির্দেশনা ও প্রয়োগকলা

চতুর্থ পর্ব : মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চস্থাপত্য

পূর্বরঙ্গ

১.

কোন মহাপুরুষ বলেছিলেন সঠিক স্মরণ নেই, সম্পূর্ণ কথাটাও আর মনে করতে পারছি না ; শুধু এটুকুই ভাবতে পারছি যে, সেই বাণীতে সমুদ্রের কথা বলা হয়েছিল, এবং এর সঙ্গেই তিনি তুলনা করেছিলেন। বিস্মরিত সেই বাণীর ভাবটুকু নিয়ে আমার উপলব্ধি অনুভব অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি কথাটাকে মনোমত সাজাই তবে তা এরূপ দাঁড়ায় যে, সমুদ্রের বিশাল ব্যাপ্তিতে ভ্রমণ করার আনন্দ নিশ্চয় আলাদা। অজানাকে জানা, সাগরের বিচিত্র রহস্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, অজেয়কে জয় করার মধ্যে বিস্ময়জনিত উন্মাদনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের আনন্দ নিশ্চয় আছে, কিন্তু হে নাবিক, তোমায় যদি শুধোই সাগরের অতলে কি আছে, তখন তুমি কী জবাব দেবে ?

এই যে সাগর, অন্তহীন সমুদ্র তাকে আমি শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করছি। আমার কোনো অগ্রজস্থানীয় বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছিলেন : পৃথিবীতে যত কিছু কঠিন কর্ম আছে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রটি তার মধ্যে সব চাইতে কঠিনতম। তুমি যখন লিখতে বসবে, ঠিক তখন চোখ বুজলে এই সত্যটি তোমার জানা হবে। সেই সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে আমি যা উপলব্ধি করেছি, তা থেকে বলছি, তুমি যখন লিখতে বসে ভাব-গভীরে ডুবে গেছ, তখন চোখ বুজলে অনুভব করতে পারবে, বন্ধ-চোখের গভীরে পারাপারহীন এক বিশাল সমুদ্র। এ সমুদ্র কেবলই শব্দের। কত শব্দ— অজস্র, অসংখ্য, অনিঃশেষ শব্দের সমন্বয়ে গড়া এই জলধি। এই সমুদ্রের মালিকানা এখন তোমার। তুমি কথাকার, তোমার উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যে যখন ভাষার আশ্রয় নিয়ে ভাব ব্যক্ত করতে বসবে, তোমাকে তখন শব্দ চয়ন করতে হবে। মনের মতন প্রয়োজনীয় এক একটি শব্দ তুলে

এনে বাক্যগঠন, তা দিয়ে যথোপযুক্তভাবে কাহিনী সাজানো, অবশেষে পরিণতিতে আসা। এই পরিণতিই যদি সাহিত্যসৃষ্টির শেষ কথা হ'ত, গোটা পৃথিবীটাই তাহ'লে প্রায় সাহিত্যিকে ছেয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা নয়; কাজটি এখানেই সমাপ্ত হতে পারে না—কারণ তোমার যে জীবনভাষ্য, তোমার যে দর্শন, বক্তব্য তথা উপলব্ধ-সত্য তা পরিস্ফুট হলে তবেই তুমি কথাশিল্পী, স্রষ্টা, নয়তো সাধারণ লেখকদের সঙ্গে তোমার তফাৎটা কোথায়?

বদ্ধ-চোখের গভীরে যে বিশাল সমুদ্র, নাবিকের মতন বিহার করে তার কতটুকুই বা জানা যায়, চেনা যায়, সংগ্রহ করা চলে? যায় না বলেই, স্রষ্টাকে ডুবুরী হতে হয়। কারণ আমরা জানি লঘু বস্তু জলে ভাসে, ভারী বস্তুগুলি সর্বদা অতলে, গভীরে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়। অতএব সেই গভীর থেকে গভীরত্বে যাবার সামর্থ্য শক্তি উদ্যম কি সাহস যার নেই, দুনিয়ার তামাম মানুষ তাকে যা খুশি বলুক, আমি অন্তত তাকে সৃষ্টিশীল শিল্পী বলব না, সাহিত্যিকও না।

আমি নিজে বলি না, অন্য কেউ এমন কথা বলুক তাও চাই না যে, মানুষ জন্মাবার পর থেকেই অনুভব ও উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে; একটা বিশেষ সময়ে, বয়সে পৌছতে হবে এ জন্যে। প্রতিভা জন্মায় এরূপ বিশ্বাস যাঁদের আছে, তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে আমি অক্ষম। আবার আমি এমন কথাও বিশ্বাস করি না যে, যত মানুষ জন্মায় তারা সকলেই দেহগত সমান পুঁজি তথা মালমশলা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। জন্মাবার সময় দেহগত গঠন, ওজন, রূপ, রং পরন্তু ধীশক্তির কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্ক তথা মগজের পার্থক্য অল্পবিস্তর থাকেই। এবং তার বিকাশ হয় পরে, ধীরে ধীরে। খাদ্য, পরিবেশ, শিক্ষা কালে কালে তাকে পরিপূর্ণতা দান করে। খাদ্য যদি দেহের পুষ্টিসাধন না করে, তবে তার মানসিক বিকাশ হওয়া অসম্ভব। এর পরে প্রয়োজন পরিবেশের; এবং শিক্ষারও। ঠিক এই সূত্র ধরে বলা যায়, শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই পরিবেশ ও শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। যে মানুষটি জীবনে কোনোদিন অভিনয় দেখেনি, নাটক কী তা জানে না, তার পক্ষে সৃষ্টিশীল অভিনেতা কি নাট্যকার হওয়া কখনই সম্ভব হতে পারে না।

পরিবেশ এবং শিক্ষার কথায় এলে আমরা ভিন্নতর কিছু দেখতে পাব। শিক্ষা এখানে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা কি ডিগ্রিলাভের লক্ষ্য নয়। এর সঙ্গে অভিজ্ঞতা কথাটার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। খুব ছোট এবং সাধারণ একটি উদাহরণ এ-ক্ষেত্রে উপস্থিত করা যেতে পারে। এক ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তার কিশোর পুত্রকে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত সতর্কভাবে তৈরি করেছিল। ছেলেটি দিনে আটঘণ্টা বই মুখে করে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এবং এই বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষার জন্য যোগাড় করা তামাম প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে সে পরীক্ষা দিয়েও উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয় নি। কারণ পরীক্ষকেরা অভিজ্ঞতার ওপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা মস ফার্ণ আর শ্যাওলা রেখেছিলেন একদিকে, অন্যদিকে ছিল কয়েকটি মৃত মৌমাছি, ভ্রমর, মথ, খুদে-প্রজাপতি আর গঙ্গাফড়িং। ছেলেটিকে প্রথমে মস দেখাতে বললে সে ফার্ণ দেখাল, মৌমাছি বেছে নিতে বলায় সে ভ্রমর তুলে এনেছিল। ঠিক সেই কিশোরের মতন বাংলা নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমরা মসের বদলে ফার্ণ এবং মৌমাছির বদলে নিরন্তর ভ্রমর তুলে আনছি।

বাংলাদেশে হালআমলে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হচ্ছে না, এই অভিযোগ যেমন সত্য নয়, তেমনি যা রচিত হচ্ছে তাই উৎকৃষ্ট এ-কথাও বলা যায় না। আমি নিজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রকৃত মানসম্পন্ন নাটক কদাচিৎ আমি পড়তে সুযোগ পাই, সার্থক-অভিনয়ও খুব কমই চোখে পড়ে। বাংলা নাটক ও তার অভিনয়ের এই শোচনীয় অবস্থা নিশ্চয় পীড়াদায়ক। তবু আমাকে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রেই আমরা নাটকের নামে যথেচ্ছাচারিতা করছি। নাটক কি এবং কেন, নাটকের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক কি, এর প্রকাশগত রূপ কত রকমের হতে পারে বা হওয়া সম্ভব, নাট্যবিষয়ক কি কি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, এছাড়া প্যাটার্ন, শেপ ফর্ম এবং এই তিনের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্নতা বলতে কি বোঝায়, নাটকে বাস্তববাদ,

প্রকৃতিবাদ, এর কাব্যধর্মিতা ও প্রতীকী প্রকাশ ছাড়াও জীবন এবং সমাজের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত হওয়া সত্ত্বেও এ-দেশে বৎসরে শতাধিক নাটক রচিত হয়, অভিনয় পরিবেশিত হয় কয়েক সহস্র। আমরা নাট্য-আন্দোলন করতে বসে নাটককে স্থূল রাজনীতি প্রচারের হাতিয়ার করেছি, এর উন্নয়নের নামে সম্মেলন আর প্রতিযোগিতা করে বহু অক্ষমকে সম্মানমাল্যে ভূষিত করেছি ও করে যাচ্ছি। বহু নাট্যামোদীর মনে অতএব প্রশ্ন উঠেছে। এবং ওঠা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

মূল কথা, আমাদের কিছু শিখতে হবে। পায়ের তলায় যার মাটি নেই সে কিসের ওপর দাঁড়াবে? এই মাটিকেই আমি শিক্ষা বলব। সাধারণ প্রচলিত নাটক কি অভিনয় সম্বন্ধে যদি আমাদের জ্ঞান না থাকে তবে কোন মূলধন নিয়ে আমরা পরীক্ষানিরীক্ষায় নামতে পারি? অবশ্য আমি একথা কখনই স্বীকার করব না যে, কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কি শিক্ষক যে কোনো মানুষকে প্রকৃত শিল্পস্রষ্টা রূপে গড়ে তুলতে পারে। শিল্পী স্রষ্টা হয় আপন বোধে; উপলব্ধি অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক অনুভাবনা তার মূল সহায়। কিন্তু তাই বলে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করা যায় না। শিল্পকলার ক্ষেত্রের মহাজন ব্যক্তিরা এ-সম্পর্কে কে কি বলে গেছেন, তাঁদের বোধ বিশ্বাস বক্তব্য আমাদের জানা দরকার। না জানলে তোমার আমার ধারণা বিশ্বাস এবং বোধ যেমন বাড়বে না, তেমনি তা পরিশীলিত হওয়ার সুযোগও পাবে না কোনোদিন।

এ-পৃথিবীতে একজন যেমন আর একের মতন হুবহু দেখতে নয়, তেমনি মহাজন কি মনীষীরা কখনই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন নি। তাঁদের বলার কথা সম্পূর্ণভাবেই প্রায় স্বতন্ত্র। পুনরাবৃত্তি যাঁরা করেন, তাঁদের বলা যায় অনুগামীমাত্র, এ-সকল ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র জীবনভাষ্য বলে কিছু নেই। মনীষীরাই তাঁদের লক্ষ্য। আমরা শেক্সপিরীয়ান অভিনয়ের ধরন দেখেছি, দেখেছি স্তানিস্লাভস্কির মেথড অব এ্যাকটিং—তারও পরে নাট্যক্ষেত্রে এসেছে কত না স্বতন্ত্র ধরনের অভিনয়রীতি। ঠিক এমনি নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও নিরন্তর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। চেকফ এবং গর্কী থেকে শুরু করে সিডনি কিংসলে ক্লিফর্ড অডেটস হয়ে, হালের কিচেনসিঙ্ক ও এ্যাবসার্ড

পর্যন্ত মত ও পথের কত না পরিবর্তন। গত ছ'বছরে এ-বিষয়ে সহজলভ্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং বহু বিদেশী পত্রিকা পড়ার পর 'নাট্যচিন্তা' গ্রন্থ প্রণয়নের কথা আমি ভেবেছিলাম। পরে পরিকল্পনা করা হয়; সেই পরিকল্পনা এখন রূপ পেল।

এ-গ্রন্থের রচনাগুলি অনুবাদ নয়। মূল লেখকদের বক্তব্য, নির্দেশ এবং তাঁদের বলবার প্রতিটি 'পয়েণ্ট'কে মুখ্য করে এদেশীয় পরিবেশোপযোগী করে সবগুলি রচনা সযত্নে রচিত হয়েছে। আমি বেছে বেছে প্রকৃত শিক্ষামূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছিলাম মোট ১২৩টি। পরে তিনবার কাটছাঁট করে যা দাঁড়িয়েছে, তারই অনুসরণে লেখা প্রবন্ধ নিয়ে এ-গ্রন্থের প্রকাশ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি প্রবন্ধের বক্তব্য স্বতন্ত্র। কিভাবে নাটক রচনা করা যায়, বা নাট্যরচনা বস্তুটি কী এবং কেন—সার্ত্র এ-প্রসঙ্গে যে মত পোষণ করেন, আর্নল্ড ওয়েস্কার, অসবোর্ন, পল গ্রীন কি হাওয়াড লিণ্ডসে তার ধার দিয়েও যান নি। এর অভিনয়াংশ, পরিচালনা কি মঞ্চস্থাপত্য প্রভৃতি অধ্যায়েও এই লক্ষ্যের প্রতি আমার স্থির দৃষ্টি রয়েছে।

এ-গ্রন্থটিতে একটি ঘরোয়া আলোচনার আমেজ আছে। যেন একটি আসরে বসে বহুবিধ পণ্ডিত ব্যক্তি শিল্পক্ষেত্রে স্ব স্ব বোধ ও বিশ্বাসের কথা বলছেন। শ্রোতা তথা পাঠক এর সঙ্গে নিজের বিশ্বাস ও বোধকে মিলিয়ে দেখতে পারে। সে যা ভাবে, যা সত্য মনে করে তার কতটুকু খাঁটি, কতটুকু যুক্তিসহ ও সঙ্গত তা যাচাই করার সুযোগ এখানে উপস্থিত। এ-সকল ব্যক্তিরা তাঁদের বলবার কথার মধ্যে তত্ত্বকথার আধিক্য রাখেন নি। নিজেদের কথাগুলোই এমনভাবে বলেছেন, যা পাঠ করে নাটক ও নাট্যকলার সঙ্গে জড়িত যে কোনো ব্যক্তিই কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

৩.

এর প্রথম-পর্বটি নাট্যরচনা সংক্রান্ত কয়েকটি শিক্ষামূলক রচনায় সমৃদ্ধ। নাটক কী এবং কেন, নাটক রচনা করা ও কি উপায়ে সেই রচনা সার্থক করে তোলা যায়, এরই সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশ ইঙ্গিত ও সাহায্য এখানে পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিগতভাবে এ-রচনাগুলোকে মোটামুটি মূল্যবান বলে স্বীকার করলেও, সব রচনার সকল যুক্তির সঙ্গে আমি একমত নই। আমার বিশ্বাসটি স্বতন্ত্র। কেন আমি নাটক লিখব, এ-কথাটার ওপর সবচাইতে বেশী জোর যদি দেওয়া হয়, তবেই আমার বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যাঁরা কেবল নাটক লেখার জন্যেই নাটক লেখেন তাঁদের নাট্যকার বলবেন অনেকে, বলেনও। বলেন বলেই নাট্যকার বলতে আজ আমরা বিশেষ একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীকে আলাদা করে ভাবি। ছুতোর যেমন কেবল কাঠের কাজ করে, তাঁতী তাঁত বোনে, জেলে মাছ ধরে চাষা চাষ করে—ঠিক তেমনি নাট্যকার বলতে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় কি গড়ে উঠছে না? তা যদি ওঠে তবে সেটা বড়ই দুঃখের। পৃথিবীর তামাম সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে এর ব্যতিক্রম দেখা যাবে অনেকই। সকল দেশে নাটক সাহিত্য, এ-দেশে নাট্যরচনা যেন অনেকটা সাহিত্যবহির্ভূত ব্যাপার এরকম ধারণা অনেকেরই হয়েছে। কিন্তু কেন? কারণ এদেশীয় যত নাটক, তার প্রায় সবই রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে লেখা হয়েছে। দর্শকের মনোরঞ্জন করাই এ-নাটকগুলির লক্ষ্য। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে আগে রঙ্গমঞ্চ, পরে নাটক। কথাটা কি আসলে তাই? না। অভিনয়কলার মূল কথাটি নাটক, এর উৎসও তাই। এই জগৎ, তার মানুষ, মানুষের মানসিকতা কিংবা আমার কোনো বোধ বা বিশ্বাস অথবা উপলব্ধ সত্যের কথা যদি আমি বলতে চাই, তবে তা বলার জন্য সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ প্রচলিত আছে—ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি। ধরা যাক, এই পাঁচটি অঙ্গ পাঁচটি যান—আমার লক্ষ্যস্থলে নিশ্চিতভাবে পৌঁছতে যে যানটি আমায় সাহায্য করবে আমি নিশ্চয় তারই আশ্রয় নেব। অর্থাৎ আমাকে আগে ভাবতে হবে, আমার বক্তব্য, জীবনভাষ্য তথা দর্শনকে স্পষ্ট করবার জন্যে কোন আঙ্গিকের আশ্রয় আমি নেব। আর তা যদি নেওয়া হয়, তবেই নাট্যকার বলতে আমরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে আলাদা করে ভাবব না যেমন, তেমনি নাট্যরচনা বস্তুটিও রঙ্গমঞ্চের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে।

নাট্যরচনার কয়েকটি ধরাবাঁধা প্রচলিত সংজ্ঞা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গেরও। অত জটিল ব্যাপারের মধ্যে না গিয়ে

খুব সহজভাবে এক একটি বিশিষ্ট অঙ্গের পার্থক্য বিচার করলে দেখা যাবে, নাটকের প্রাণবস্তু মূলত সংলাপ। আমার মনে হয় এটাই প্রধান এবং এটাই শেষ কথা। শিল্পী যেমন তুলির আঁচড়ে তার চিত্রশিল্পীকে প্রাণবন্ত ও সার্থক করে তোলে, তেমনি সংলাপই নাট্যকারের তুলি। বিশেষ বিশেষ পরিবেশ, ঘটনা, দ্বন্দ্ব, মুহূর্তের মধ্য দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূলতঃ সংলাপই এ-ক্ষেত্রে চরিত্রসৃষ্টির একমাত্র অবলম্বন। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অন্যান্য বিষয়। একজন লেখক যদি সার্থক নাট্যসৃষ্টি করতে বসেন, তবে তার বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটি কাহিনী নির্বাচন করবেন। সে-কাহিনী যত নিটোল নিখুঁত হয় তার দিকে নজর দেওয়া তার প্রাথমিক কর্তব্য। এ-জন্যে একটি ছক করে নিলে সবচেয়ে সুবিধে হয়। পরে সেই কাহিনীটি যত কম চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব তাই করা উচিত। এবং এখানে আমি ওয়েস্কারের সঙ্গে একমত যে, ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, যেটুকু না বললে নয়, কেবল সেটুকু সংলাপই নাটকে থাকবে। একআধটি কথায় যদি একটি চরিত্র বিকশিত হয় এবং আমার স্পষ্ট নাটকের প্রয়োজন মেটায় তবে অযথাই কেন আমি বেশি সংলাপ ব্যবহার করব।

নাটক লিখবার আগে নাট্যকারকে ভেবে নিতে হবে, তিনি কি চাইছেন? কারণ শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দু'টি পথ খোলা আছে। এর একটি দর্শক বা পাঠকদের সন্তুষ্টিবিধান করা, অন্যটি নিতান্তই নিজস্ব ব্যাপার। আমি নিজে দ্বিতীয় পথটিকে শ্রেয় মনে করি। আমার উপলব্ধ সত্য যেহেতু এখানে মূল কথা, অতএব আমি যা বলব, আমি যা দেখাব দর্শক-পাঠক তাতে যদি তুষ্ট না হয় আমার কিছু করার নেই। প্রথম পথটিকে আমি এখানে কুম্ভকারের কাজের মতনই মনে করছি। তুমি যদি দ্বিতীয় পথের পথিক হও তো, তোমার উদ্দেশ্যে আমার শেষ কথা এই যে, মাত্রা সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকতে হবে। সেটা যেমন কাহিনী-বর্ণনের ক্ষেত্রে ; তেমনি ঘটনা, গতিবেগ সৃষ্টি, সংলাপ, চারিত্রিক আচরণ, দ্বন্দ্বমুহূর্ত গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমগ্র বস্তুটিকে রসস্থ করার জন্যে, প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি করার জন্যে যেখানে এর যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত ব্যবহার হলেই বস্তুটি বেমানান হতে পারে।

৪.

নাট্যকলার প্রথম কথা নাটক, দ্বিতীয় কথা অভিনয় নয়, পরিচালনা। অন্তত এটাই আমার বিশ্বাস। নাট্যকারের মতন পরিচালককেও আমি স্রষ্টা বলি, বলি জীবনভাষ্যকার তথা দার্শনিক। আমায় যদি কেউ শেক্সপীয়র কি বার্নার্ড শ'র কোনো নাটক পরিচালনা করতে বলে, আমি নিশ্চয় তাতে সম্মত হব না। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন, তবে আমার জবাব হবে এই যে, জীবন, মানুষ, সমাজ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, পরন্তু আমার বোধের যে নিজস্ব পরিমণ্ডলে আমি বাস করি, তার সঙ্গে এ-দু'জনের বক্তব্যের আদৌ মিল নেই। বরং আমি উৎসাহিত হব এলিয়টের বিশেষ বিশেষ কাব্য-নাটকের নির্দেশনার ব্যাপারে, আমি হ্যারল্ড পিণ্টার কি এন এফ সিম্পসন এমন কি বোল্ট এবং লিভিংসেরও কোনো কোনো নাটক পরিচালনা করতে আগ্রহী হতে পারি। পরিচালক হিসাবে আমি প্রথমত আমার মনোমত নাটক বেছে নেব, যে-নাটক আমার বক্তব্য প্রকাশের সহায়ক হবে। এ-ক্ষেত্রে অনেক জটিল বাধার সম্মুখীন হতে হবে আমাকে। যেমন ধরুন জন হুইটিং-এর 'দি ডেভিল'। হুইটিংয়ের এই নাটকটি পড়তে পড়তে আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। পড়বার সময় একে আমি আমার বোধের পরিমণ্ডলের মধ্যে পেয়েছি। কিন্তু এর শেষাংশ অর্থাৎ পরিণতি যথেষ্ট অস্পষ্ট। হুইটিংকে যদি বলি, তোমার এই নাটকটি নিয়ে আমি মঞ্চে উপস্থিত হব। কারণ তোমার বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু ভাই, শেষাংশটি আমার নির্দেশ মতন তোমাকে লিখতে হবে, অথবা আমি নিজে তা করে নেব। হুইটিং যদি যথার্থ জীবনভাষ্যকার হন, এবং তাঁর অক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি যদি সচেতন হতে পারেন, তবে তিনি সম্মতি দেবেন। আবার নাও দিতে পারেন। সুতরাং নির্দেশকের সঙ্গে নাট্যকারের মতবিরোধের সৃষ্টি হবে। নাটক এখানে যেহেতু প্রধান; অতএব পরিচালককে নাট্যরচনা বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ হতে হবে। নাটকের পর আমার কাজ একে ভিস্যুয়াল আর্ট-এর আঙ্গিকে একে সার্থক করে তোলা। এবং এজন্য আমার করণীয় কাজগুলি এক এক করে করতে হবে। যেমন অভিনেতৃ নির্বাচন, রিহার্সাল করা, আমার প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট সম্পর্কে

মঞ্চসজ্জাকরকে নির্দেশ দেওয়া প্রভৃতি। অর্থাৎ নাট্যকার নাটক লিখবেন, অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করবেন, মঞ্চরূপকার দৃশ্যপট সাজাবেন, আলোকবিজ্ঞানী আলোর কাজ করবেন। কিন্তু আমাকে অর্থাৎ নির্দেশককে এর সকল অঙ্গ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। এরা হবে নির্দেশকের যন্ত্র, নির্দেশক নিজে এক্ষেত্রে যন্ত্রী নিশ্চয়। কারণ একটি নাট্যরচনাকে দৃশ্যশিল্প করার দায়িত্ব মূলতঃ পরিচালকের।

নাট্যকার এবং নির্দেশকের মতন চরিত্রশিল্পীকেও আমি স্রষ্টা বলি। তাঁদের সম্পর্কেও বলার কথা আমার অনেক। কিন্তু আমি এখানে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করার পক্ষপাতী নই। গোটা গ্রন্থে এর প্রতিটি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতকে আমি 'নাট্যচিন্তা'য় গ্রথিত করে দিলাম। নাট্যবিষয়ক আগ্রহী ব্যক্তি, শিল্পীরা এ-থেকে কিছু শিখতে পারবেন, অথবা নিজ নিজ বোধকে পরিশীলিত করতে সক্ষম হলেই যথেষ্ট। সবশেষে, আমি আমার এই রচনার প্রথম কথাতে ফিরে যাব। যাঁরা শিল্পী, যাঁরা শ্রষ্টা তাঁরা যেন শিল্পরূপ সমুদ্রে নাবিকের মতন নৌকা ভাসিয়ে সম্পদ আহরণ করতে না যান।

অনেকে প্রশ্ন তুলবেন ; বলবেন,-এ দেশীয় শিক্ষামূলক রচনা কেন এতে স্থান পায় নি। যাঁরা এ-কথা বলবেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, হে, নাট্যামোদী, সম্ভবত আপনি জ্ঞাত আছেন, একদা আমরা দেশীয় নাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্যকে যথেষ্ট মনে না করে, বিদেশ থেকে হালের থিয়েটারী মঞ্চবস্তুটিকে তুলে এনে এ-দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। কিন্তু এক দশক আগে পর্যন্ত এ-সব মঞ্চে আমরা যা অভিনয় করেছি তা এই মঞ্চোপযোগী 'ড্রামা' নয়, সেগুলি মূলতঃ পালাধর্মী রচনা। বহুকাল পরে, আজ, যখন মোটামুটি কিছু সার্থক নাটক লেখা হচ্ছে, হিসেব করলে দেখা যাবে বিদেশের তুলনায় এখনও আমরা বহু পশ্চাতে পড়ে আছি। শতাধিক বৎসর আগে যদি ও-দেশীয় মঞ্চের দিকে আমাদের চোখ পড়ে থাকে, তবে আজ, একশ বৎসর পরে, ও-দেশের মনীষীদের নাট্যচিন্তার সঙ্গে নিজেদের বোধকে মিলিয়ে নিতে ক্ষতি কি। ক্ষতি নেই, কারণ বিদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সেই আদিকাল থেকেই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে—ইতিহাস তার সাক্ষী।

আমার পরিকল্পিত এ-গ্রন্থটি সকল দিক থেকে শিক্ষামূলক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-কাজে যিনি সবচেয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি নাট্যকার সুনীল দত্ত। এককথায় বলা যায় এ-গ্রন্থের তিনি সহযোগী সম্পাদক। শ্রীমান দুলেন্দ্র ভৌমিক, তাপস সুর চৌধুরী, স্বপন মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, অসীম চক্রবর্তী, গৌর বোস এবং বিদ্যুৎ গোস্বামী ও দ্বিজেন ঘোষের সাহায্য না পেলে এ-গ্রন্থ প্রণয়নে আরও বিলম্ব হ'ত। ভরত আচার্যের রচনাটির জন্য 'বহুরূপী' পত্রিকার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম। লেখকরা প্রত্যেকে আমার নির্দেশগুলি ঠিক ঠিক মেনে নিয়েছেন, সুতরাং তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

—সূত্রধার

ওপরে ঃ চেকফ 'সীগাল' নাটক পড়ে শোনাচ্ছেন, স্তানিস্লাভস্কি ও মস্কো আর্ট থিয়েটারের অপরাপর ব্যক্তিরা শুনছেন। (১৮৯৮)

নীচে ঃ লী স্ট্রাসবার্গ পরিচালিত 'দি কেস অব ক্লাইড গ্রিফিথস' নাটকের মহড়া বৈঠকের একটি দৃশ্য।
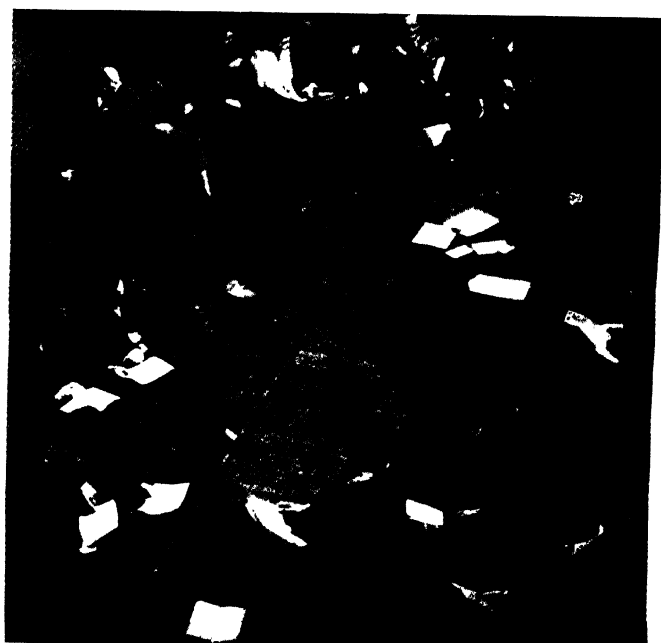
'এণ্ড্রোক্লিস এণ্ড দি লায়ন' নাটকের একটি রিহার্সালে বার্নার্ড শ নিজের একটি মুহূর্ত সৃষ্টি করছেন।
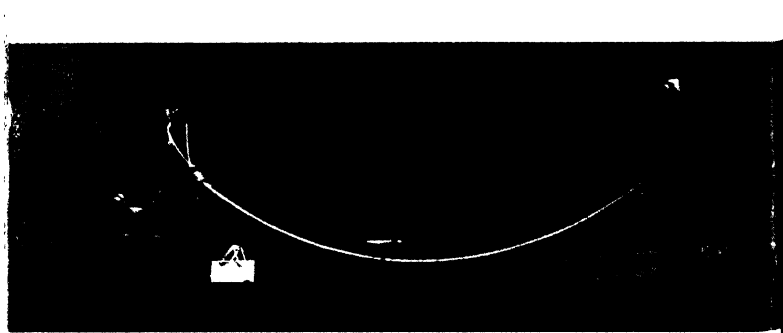
ফ্রেডারিক থন পরিচালিত 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকের একটি দৃশ্য।

॥ প্রথম পর্ব ॥

নাটক লেখার টুকিটাকি। শিল্প শুধু সব নয়। অচেনা মঞ্চ অন্য নিরীক্ষা। প্রকৃতি ও নাটক। মায়ামঞ্চ এবং নাটক ভিন্ন দৃষ্টি : অন্য বোধ।

নাটক লেখার টুকিটাকি

মূল রচনা : হাওয়াড লিণ্ডসে
অনুসরণে : উমানাথ ভট্টাচার্য

নাটক-লেখা নিয়ে কোন তাত্ত্বিক আলোচনা আমি করব না। আমি থিয়েটারে এসেছি মঞ্চের পেছন-দরজা দিয়ে। এবং একটানা তিরিশ বছর মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলশ্রুতি যতটুকু হতে পারে, ঠিক ততটুকুই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার কথাই আজ আপনাদের বলব। কথাগুলো হাওয়াড লিণ্ডসের।

'নাটক লেখার মূল সূত্র হ'ল—দর্শকের অনুভূতি, গল্পের স্বচ্ছন্দ গতি ও নাটকীয়তার প্রকাশ—এই তিনের সমন্বয় সাধন। এর মধ্যে দর্শকের অনুভূতি সম্পর্কে সজাগ থাকা অবশ্যই নাট্যকারের প্রথম কাজ। একটু খুলে বলি :

বহু বছর আগে আমি প্রায়ই কুস্তীর আখড়ায় যেতাম। (লড়তে নয়, দেখতে) সেখানে কি হ'ত শুনুন।

দু'জন যোদ্ধা এসে হাজির হ'ল মল্লভূমিতে। একজনের পরনে আঁটসাঁট সবুজ পোষাক, আর একজনের নীল। যুদ্ধ শুরু হল। এ ওকে একটা থাবা মারল, ও পাশ কাটিয়ে সরে গেল ; এ ওর হাত ধরল, হাত ছাড়িয়ে নিল,

যাচাই করে নিল প্রতিপক্ষের গায়ে কত জোর। এরপর হঠাৎ সবুজ-পোষাক নীল-পোষাকের মুখ লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল, ঘুসিও চালাল সেই সঙ্গে। আচমকা লাথি-ঘুসির চোট সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল নীল-পোষাক। এতক্ষণে দর্শকরা চিৎকার করে উঠল, "কুত্তার বাচ্চা কি করল, দেখেছ!" এবং মনে মনে আশা করল, নীল-পোষাক উঠে দাঁড়িয়ে তখনই এর শোধ নেবে।

যোদ্ধারা দর্শকের অনুভূতিকে সংগঠিত করলেন। অর্থাৎ দর্শকের কাছে একজন হলেন নায়ক, আর একজন শয়তান। প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে দর্শক লড়াই দেখতে লাগল। কখনও নায়ক হারে, কখনও শয়তান। অবশেষে, যুদ্ধের শেষের দিকে নীল-পোষাক (নায়ক) একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ মনে হচ্ছে, তার আর জেতার সম্ভাবনা নেই (তাহলে কি শয়তানই জিতবে?) সেই সময় নীল পোষাক লাফ দিয়ে উঠে এক আঘাতে সবুজ-পোষাককে মাটিতে ফেলে দিল। আর তার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না। নীল-পোষাক তার বুকের উপর চেপে বসে রইল।

শয়তান হেরেছে। দর্শকের উত্তেজনা ফেটে পড়তে লাগল।

কারণ আর কিছুই না; যোদ্ধারা দর্শকের অনুভূতিকে সংগঠিত করতে পেরেছে। একজনের স্বপক্ষে (অপরজনের বিরুদ্ধে) তারা দর্শকের অনুভূতিকে সজাগ করতে পেরেছে।

তাই বলছিলাম, নাট্যকারের প্রধান কাজ হ'ল, 'নাটকে বর্ণিত এক বা একাধিক চরিত্রের প্রতি দর্শককে সহানুভূতিশীল করে তোলা। অনুভূতি নিয়েই তো থিয়েটারের কারবার! এখানে আমরা অভিনয় করে গল্প শোনাই। দর্শক থিয়েটারে আসে নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্রতি মমতা অথবা ঘৃণার উদ্রেক হোক—এই চাহিদা নিয়ে। এবং দর্শকের এই চাহিদা পূরণ হওয়া চাই। যদি আপনি তা পূরণ করতে পারেন, তাহলে যে-দর্শক পয়সা খরচ করে আপনার নাটক দেখতে এসেছে, তারা খুশী হয়ে বাড়ি ফিরবে। এবং তাহলেই আপনার নাটক সফল। অন্যথায়, নয়। দর্শকের ভাবের ঘরে কুলুপ লাগানো, আপনি সেই কুলুপ খুলতে পারলেন কি না – তার উপরই নির্ভর করবে, আপনার নাটক সার্থক অথবা অসার্থক।

'চাহিদা পূরণ করবার দু'টি উপায় আছে। এক : দর্শক যে-যে চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল, অন্য চরিত্র অথবা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই-সেই চরিত্রকে জিতিয়ে দিন; অথবা, দুই : প্রতিকূল পরিবেশ কিম্বা অন্য মানুষের সঙ্গে লড়াই করে তাদের মহৎ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করুন। অর্থাৎ, চরিত্রগুলির প্রতি করুণার সঞ্চার করুন। হতাশার মধ্যে যে-নাটকের যবনিকা, দর্শকের তা ভাল লাগতে পারে না। কারণ হতাশার অনুভূতি বড় বেশী পীড়াদায়ক।

নাটক লিখতে শুরু করার আগে আপনাকে ভেবে নিতে হবে, আপনি নাটক শেষ করবেন কোথায়। কোন নবু নাট্যকার একবার জর্জ কাউক্‌ম্যানকে একটি পাণ্ডুলিপি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, "নাটকটি পড়ে এর তৃতীয় অঙ্কে কি কি গলদ রয়েছে, আমাকে যদি একটু বুঝিয়ে দেন।" কাউক্‌ম্যান পাণ্ডুলিপি হাতে না-নিয়েই জবাব দিলেন, "আমি এখুনি বলে দিচ্ছি, গলদ রয়েছে আপনার প্রথম অঙ্কে।" কাউক্‌ম্যানের বক্তব্য ছিল, শুরু করার আগে লেখক একবারও ভাবেননি, কোথায় তিনি শেষ করবেন। এমন পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে আমারও খুব খারাপ লাগে—যার প্রথম অঙ্ক চমৎকার, দ্বিতীয় অঙ্ক চমৎকার, কিন্তু তৃতীয় অঙ্কটা কিছুই নয়। এমন হয়, শুধু আগে থেকে না-ভাবার জন্যেই।

'প্রধানতঃ দুই কারণে নাটক মার খায়। প্রথম : নাটকের চরিত্র অথবা ঘটনাবলী দর্শকের চোখে বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় : বিশ্বাস্য মনে হলেও, চরিত্র অথবা বর্ণিত ঘটনাবলীতে দর্শকের কিছু আসে যায় না। এমনটি ঘটলে সে নাটকের ভবিষ্যৎ নেই।

নাটকে চরিত্র এবং ঘটনাবলীর প্রতি যদি দর্শককে উৎসুক ও আগ্রহী করে তুলতে পারেন, তাহ'লে তার পরের কাজ হবে, দর্শককে উত্তেজিত করা। কেমন করে? দর্শক মনে মনে যে-চরিত্রের জয় কামনা করছে, তাকে এমন অবস্থায় ফেলা, যাতে মনে হতে পারে—তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দর্শক যাকে সুখী দেখতে চাইবে, তাকে দুঃখ পাইয়ে দর্শকের সহানুভূতিকে জর্জরিত করুন। এবং সবশেষে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা পার করিয়ে, যার শেষ দর্শক

যেমন দেখতে চায়, তাকে তাই করুন, দেখবেন, আপনার নাটকের মার নেই।

দর্শকের অনুভূতিকে আঘাত করার কয়েকটি সহজ উপায় আছে। যেমন, দর্শকের ধারণায় যা সবচেয়ে মূল্যবান, তার প্রিয় চরিত্রকে সেই মূল্যবান বস্তু থেকে বঞ্চিত করার অবস্থায় ফেলে দিন। আমরা জানি প্রাণ-সম্পদ বড় সম্পদ। এই প্রাণটুকু ধরে রাখার জন্যেই তো আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম-কাণ্ড। এখন, আপনি যদি দর্শকের প্রিয় চরিত্রটিকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন কিছুক্ষণ, ব্যস, তাহলেই বাজী মাৎ।

আপনার গল্পের অংশবিশেষ দ্রুত অথবা মন্থর গতিতে এগোবে, তা নির্ভর করবে দর্শকের অনুভূতির গভীরতার উপর। অনুভূতির সুর যদি গভীর হয়, আপনার গল্প তখন এগোবে শম্বুক গতিতে। অন্যথায়, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেই অংশটি আপনাকে পার করিয়ে দিতে হবে। প্রহসনের গতি হবে দ্রুততর। যেন আপনি চলন্ত ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে দেখছেন, টেলিগ্রাফের থামগুলো আপনার চোখের সামনে দিয়ে এক এক করে সরে যাচ্ছে। ওই থামগুলো হচ্ছে গল্পের এক একটি পয়েন্ট। এবং আপনাকে অতি দ্রুত ওই পয়েন্টগুলো পেরিয়ে যেতে হবে। কোথাও দাঁড়িয়ে পড়া চলবে না, গতি শিথিল হবে না, ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে একটা ঘটনা থেকে আর এক ঘটনায়, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা.........

আমি একজন নাট্যকারকে জানি যার প্রধান দুর্বলতা হ'ল, তিনি খুব ভাল লেখেন। কোন দৃশ্যে কয়েকটি চরিত্রকে একখানে পেলেই তিনি তাদের দিয়ে এমন একটি মনোজ্ঞ আলোচনা শুরু করবেন, যা শুনতে ভাল, কিন্তু নাটকের সংলাপ হিসাবে অবান্তর। এতে নাটকের গতি ব্যাহত হয় এবং নাটকের মূল বক্তব্য হালকা হয়ে যায়। যে-দৃশ্যে ঠিক যতটুকু বলা প্রয়োজন, তার এক বর্ণও বেশী লিখবেন না। অতি কথন মনোহারী হতে পারে, কিন্তু নাটকে তা একেবারেই অচল।

'দৃশ্যগুলিকে অযথা বিলম্বিত করবেন না।

বছর তিনেক আগে আমরা একবার মফঃস্বল যাত্রা করি "Life with

father" নাটকটি নিয়ে। আমরা ভেবেছিলাম, প্রথম অঙ্কটা কোনো রকমে পার করে দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু করতে পারলে আর আমাদের ভাবনার কিছু থাকবে না। প্রথম অঙ্কে আমরা দর্শকের কোনো প্রতিক্রিয়াই আশা করি নি। কিন্তু অভিনয় শুরু করতে ফল হল উলটো। প্রথম অঙ্কে মুহুর্মুহু দর্শকের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়তে লাগল। আমরাও উৎসাহিত হয়ে বলাবলি করলাম, "যাক, আর ভয় নেই।" কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে দর্শক কেমন চুপসে রইল; প্রথম অঙ্কের সেই উচ্ছ্বাসের নামগন্ধ আর দেখতে পাওয়া গেল না তাদের মধ্যে। ভাবতে বসলাম। যা আবিষ্কৃত হ'ল, তা অতি তুচ্ছ কথা। আসলে নাটকের সব কটি দৃশ্যই অযথা বিলম্বিত। সুতরাং, এখান থেকে এক লাইন, ওখান থেকে তিন লাইন, সেখান থেকে দু'লাইন—এমনি করে কিছু কিছু সংলাপ কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। আমাদের পরবর্তী অভিনয় অনেক ভাল হয়েছিল।

মনে রাখা দরকার, দু-একটি বাড়তি সংলাপ নাটকের গতিকে বিলম্বিত করতে পারে। দুটি-চারটি বাড়তি সংলাপের দরুণ নাটক একঘেয়ে লাগতে পারে। আর চারটি-ছটি বাড়তি সংলাপে "অসহ্য!"—এমন কথা দর্শকের মনে হওয়াও বিচিত্র নয়।

নাটকের মূল চরিত্র এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে-চরিত্রের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি অতি সহজেই আকর্ষণ করা যায়। বারবনিতাদের নিয়ে নাটক লেখার বাসনা অনেকেরই হয়; কিন্তু লিলিয়ান হেল্‌ম্যান যেমন লিখেছিলেন, যদি তেমন লিখতে না-পারেন, তাহলে এদের নিয়ে না-লেখাই ভাল। দর্শকের সামনে এমন সব চরিত্র এনে হাজির করুন, যাদের দেখলে দর্শক খুশী হয়, যাদের সঙ্গে সময় কাটাতে দর্শক আনন্দবোধ করে। যদি গল্পের খাতিরে অন্য ধরনের কোন চরিত্র এসেও পড়ে, গল্পের প্রয়োজন ফুরোলেই তাকে বের করে দিন।

নাটক দেখতে দেখতে দর্শকের যদি মনে হয়, সে যা দেখছে সব সত্যি, তাহলেই আপনার লেখা সার্থক। দর্শককে ভুলিয়ে দিন যে, সে নাটক দেখছে; তাকে মনে করতে দিন যে, সে যা দেখছে তা অভিনীত নয়, তা ঘটছে; ওই-খানে—মঞ্চের ওপর। তাহলেই সে খুশী হবে।

ব্রুক অ্যাটকিনসন, "রীপ দি হারভেষ্ট" নাটকটি তাঁর তত ভাল লাগেনি কেন, এই আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, "সম্ভবত নাটকের অনেক কিছুই বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারে নি।" দেয়ালে একটা দেয়াল ঘড়ি দেখান হ'ল, কিন্তু সেটা চলে না। মোটর গাড়ির হর্ণ বাজান হ'ল, কিন্তু তার আওয়াজ মোটেই হর্ণের মতন নয়। এবং টেবিল এখান থেকে ওখানে সরিয়ে রাখবার জন্যে অনাবশ্যক একটি চরিত্রকে মঞ্চে এনে হাজির করা হ'ল —এমনি আরো খুঁটিনাটি অনেক কথা।

চিঠি লিখে আমি অ্যাটকিনসনকে জানিয়েছিলাম, "খুঁটিনাটিগুলো কিছুই না; আসলে নাটকটিই আপনার কাছে প্রকৃত বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারেনি।"

এইসব তুচ্ছ কারণে নাটক যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তা আমি বলছি না, আমার বক্তব্য হ'ল, নাটক যদি ভাল লাগে তাহ'লে ঘড়ির কাঁটা নড়ল কি না কিম্বা হর্ণের শব্দ হর্ণের মত শোনাল কি না—এ নিয়ে কেউ মারামারি করে না। কিন্তু নাটক যে মুহূর্তে অনাবশ্যক বিলম্বিত হয়ে দর্শকের মনে একঘেয়েমীর (বিরক্তির?) সৃষ্টি করে, তখনই এই সব দিকে নজর যায়। প্রশ্ন ওঠে, "ঝাড় লণ্ঠনটা অত উঁচু করে ঝুলিয়েছেন কেন মশাই? অত উঁচুতে তো ঝাড় লণ্ঠন থাকে না"। আমি তখন কেমন করে বোঝাই যে, দোতলা তেতলায় যাঁরা বসেছেন তাঁদের দেখতে অসুবিধা না হয়—সে কথা ভেবেই অত উঁচু করে ওটা বসানো হয়েছে।

নাটক একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করলেই দর্শক বারে বারে ওই দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাবে আর তার মনে হবে: কই, ঘড়ির কাঁটা তো কই নড়ে না একটুও!

নাটক ভাল লাগলে এর কোনো কিছুই তাদের নজরে আসবে না।

আর এক কথা, দর্শকের কাছে আজ যা বিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, কাল কিন্তু তা হবে না। সুতরাং আরও ভারী কিছু, গভীর কিছু দিয়ে যেতে হবে। এটা দর্শকের দাবি। এ দাবি পুরণ করার দায়িত্ব নাট্যকর্মীর। পুরণ করতে পারলে পাশ, না পারলে ফেল।

দর্শকের আর একটি মনের কথা, "আমরা শুনতে চাই না, দেখতে চাই।"

ঘটনা যা কিছু, তা ঘটুক মঞ্চের উপর। যেমন করেই হোক, ঘটনাকে উপস্থিত করতে হবে দর্শকের চোখের সামনে। তা না হ'লে সে ধৈর্য ধরে বসতে নারাজ।

সাধারণভাবে, এটা আমি লক্ষ্য করেছি, প্রথম অঙ্কটি সার্থকভাবে লিখে ফেলা বা সেটি সুন্দরভাবে অভিনয় করা সত্যিই বড় কঠিন কাজ। কেন না, প্রথম অঙ্কেই তো নাটকের ভিত্তি স্থাপনা করা হয় অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্রের অবতারণা করে। এবং যেগুলো দর্শকের কাছে একেবারেই অপরিচিত। চরিত্রগুলো অচেনা, কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক— এটাও তাদের জানা নেই। কাহিনী, পরিবেশ একেবারে নতুন। বুঝে উঠতে সময় যায়। রসের বোধ থাকে লুক্কায়িত।

সুতরাং, আপনার কাজ হল, প্রথম অঙ্ককে অনেক হাসি ঠাট্টা অথবা খানিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দর্শকের সামনে হাজির করা। প্রথম অঙ্কে কোনো চরিত্র যদি মঞ্চের উপর একটি সেকেলে চেয়ারে বসে গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে আরম্ভ করেন, "তারপর বুঝলেন কিনা, এটা হল ১৭৯১ সাল। ফরাসী দেশটা দেখছি অন্তর্দ্বন্দ্বে একেবারে রসাতলে যেতে বসেছে।"—তাহলেই আপনি গেলেন। থিয়েটারে এসে গল্প শুনতে কে চাইবে? আপনার যদি কিছু বলার থাকে, ঘটনা তৈরী করুন এবং সেই ঘটনার মধ্যে দিয়ে আপনার বক্তব্য বেরিয়ে আসুক।

নাটক বিচার করতে বসলে প্রথমে গল্প এবং সেই গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কি কি ঘটনা আমদানী করা হয়েছে,—এই বিচারটাই আমার আগে এসে পড়ে। ধরুন, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে পরস্পরকে ভালবাসে। এখন এই ভালবাসার কথা দর্শককে জানাতে গিয়ে যদি দেখা যায়, ছেলেটি এবং মেয়েটি নিরালায় বসে আলাপ করছে, আর সেই সময় বন্দুক হাতে হাজির হ'ল একটি লোক; সে বলল—ছেলেটিকে সে গুলি করে মারবে।—তাহ'লে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? খুব খারাপ। অর্থাৎ গল্প বলার জন্যে এমন একটি ঘটনা আমদানী করা হ'ল যেটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ দু'জনে পরস্পরকে ভালবাসে --এই কথাটা বোঝাবার জন্যে বন্দুকধারীর প্রয়োজন কি?

যখন নাটক লিখতে বসবেন, নাট্য-পরিচালকের কথা একেবারে ভুলবেন না। আপনার চরিত্রগুলো কথা বলে ; তাছাড়া আর কি কি করে তার কিছু আভাস দিয়ে দেবেন ; নইলে বেচারা পরিচালককে অনেক সময় বড় দুর্ভাবনায় পড়তে হয়। চরিত্রগুলো আর পাঁচ জনের মত সামাজিক (অথবা অসামাজিক) মানুষ ; এটা তো তাকে প্রমাণ করতেই হবে। সুতরাং তাকে একটু সাহায্য করবেন।

কি নিয়ে লিখবেন ? আমি জানি না। বিষয় নির্বাচন বড় শক্ত কাজ। তবে থিয়েটারের সবদিক ভালরকম জানা থাকলে কাজটা তত শক্ত নয়। ওয়েন ডেভিস বলেছেন : নাটক লেখা শুরু হওয়ার আগেই অনেক সময় বলে দেওয়া যায়—নাটক চলবে, কি, চলবে না। কথাটা ভাববার মত। একেবারে আনকোরা বিষয়বস্তু তো যখন তখন মাথায় আসে না। কিন্তু একবার এসে গেলে তখন তার গল্প হবে আনকোরা, চরিত্রগুলো দেখা দেবে নতুন চেহারায়, একটার পর একটা ঘটনা ঘটবে—আগে যা কোনদিন ঘটেনি (অবশ্য দর্শকের চোখের সামনে), এবং সব মিলিয়ে দর্শকের অনুভূতির তারে একটি নতুন স্বর ধ্বনিত হবে। সুতরাং অভিনবত্বের কথা মনে রাখবেন।

নাটকের মধ্যে উপদেশ ছড়াবার চেষ্টা করবেন না। বিশ্বস্তভাবে মানুষের ভাল-মন্দ, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে অথবা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মানুষ কেমন করে বেঁচে আছে—এইটুকু দেখাতে পারলেই যথেষ্ট। এ থেকে যা বোঝবার, দর্শক নিজগুণে বুঝে নেবে। ভগবান কি, বা আমাদের পৃথিবীতে কোন্ জিনিসটা খাঁটি আর কোন্‌টা মেকী—বেশি কথা বলে দর্শককে তা বোঝাতে হবে না।

আপনি যদি চান যে, আপনার নাটক হবে প্রচার-মূলক, তাহ'লে কোনো চরিত্রকে এমন কথা বলাবেন না যা থেকে মনে হ'তে পারে—লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছে। তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অভিনয় করতে দিন ; দেখবেন আপনার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। অন্যথায়, প্রচারও হবে না ; নাটক তো কস্মিন কালেও না।

শেষ কথা বলে আপাতত শেষ করি। নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ দাঁড়িটি

দেওয়ার পর আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, বেশ লেখা হয়েছে ; অন্ততঃ আপনার পক্ষে যতখানি বেশ লেখা সম্ভব। সুতরাং চল, শুনিয়ে আসি পরিচালককে অথবা থিয়েটারের মালিককে। পাণ্ডুলিপি বগলে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক ?

না। পাণ্ডুলিপি আপনার ঘরে তালাবন্ধ থাক। থাক কিছুদিন ; জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হোক। মাস দুই পরে আপনি নিজে পড়ুন, প্রয়োজন মত সংস্কার করুন। (প্রয়োজন হবেই।) আবার দু'মাসের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দিন। আবার বের করে পড়ুন। পরিচালক অথবা মালিকের হাতে যাওয়ার আগে এমনি চলুক কয়েকবার। এতে ফল ভালই ফলবে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

'নোটস অন প্লে রাইটিং'
অনুসরণে

শিল্প শুধু সব নয়

মূল রচনা : আর্নল্ড ওয়েস্কার

অনুসরণে : অমিতা রায়

রঙ্গালয় সম্বন্ধে লোকে এত কথা না বললেই ভাল হ'ত। সমালোচনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু লোকের মতামত প্রকাশের ফলে মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে বহু সময় নষ্ট হয়, সেইটাই আমার বক্তব্য। আর্নল্ড ওয়েস্কার তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেছেন : The kitchen নাটকটি যে তাঁর নিজস্ব ধারায় সাফল্যলাভ করেছিল, তার একটা কারণ—ঐ নাটকটি লেখার সময় রঙ্গালয় সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা ছিল গণ্ডীবদ্ধ। একটা নাটকে বত্রিশটা চরিত্র থাকতে পারে না ·····নাটকের মধ্যে বিরাম না হলে চলবে না···রঙ্গমঞ্চের ওপরে উনুন রাখতে পাবে না···এই সব কথা আমার কাণের কাছে বলার মতন কেউ ছিল না তখন। কিন্তু গতানুগতিক হব মনস্থ করে যে আমি Trilogy-তে (নাটকত্রয়ী) গতানুগতিক ধারা বজায় রেখেছিলাম তা নয়। বরং বলা যায় যে, আমি যা বলতে চাই তা ঐ বিশেষ গতানুগতিক শৈলীর সঙ্গে আপনা থেকেই খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো দিকে অবশ্য আমি যেন নতুন পথের দিকেই যাচ্ছি।

রঙ্গমঞ্চের আকৃতি প্রোসিনীয়াম, এখন এসব নিয়ে কোনোদিন মাথা

ঘামান নি ওয়েস্কার। তিনি বলেন: লেখার সময়েও আমি কোন বিশেষ রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা করে লিখি না। অভিনেতাদের স্টেজে আসা-যাওয়া করতেই হবে—সেটা প্রোসেনিয়াম স্টেজেও তাঁরা যেমন পারবেন, অন্য স্টেজেও তাই। সম্প্রতি রোমে গিয়ে আমার একটি আশ্চর্য সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা ওখানে Trilogy-র নাটক তিনটির কয়েকটি খণ্ড দেখাতে গিয়েছিলাম। ঘটনাগুলি কালানুক্রমিক ভাবে দেখানো হচ্ছিল। প্রথমে—Chiken soup with Barley থেকে দুটি দৃশ্য, তারপরে I'm talking about Jerusalem, আবার Chiken soup—এইভাবে অভিনয় হচ্ছিল। এই প্রদর্শনীর জন্য আমাদের বাধ্য হয়েই ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়েছিল, তাই কোনো জিনিসই আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি নি। যে কটি পোশাক-আশাক, টেবিল-চেয়ার, বাক্স পাওয়া গেল, তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের পিছনে ঝোলাবার একটা পর্দা অবশ্য আমাদের ছিল আর জন ডেক্সটার আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। দৃশ্যপট, সেট, খুঁটি প্রভৃতি উনকোটি চৌষট্টি রকম জিনিস একেবারে বাদ দিয়েও যে ঐ খণ্ডগুলি অভিনয় করতে পারা গেল—সেটা আবিষ্কার করে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এসব সত্ত্বেও অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠাতে আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। দর্শক ও সমালোচকদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, জন ডেক্সটার এবং আমি নিজেও মেতে উঠলাম। এখন এটা একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে চলতে পারে কিনা জানি না। কিন্তু এই নাটিকাগুলির সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার মনে হ'ল যে, সেটিং বা দৃশ্য বিন্যাস দ্বারা পরিবেশ সৃষ্টির ওপর কিছুই নির্ভর করে না। নাটকের বক্তব্য সংলাপের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়।

আজ যদি আপনি নতুন একটা ঘরে থাকতে যান, প্রথমেই তো আপনি আসবাবপত্রগুলোকে অন্যভাবে সাজাবেন, অন্য ছবি টাঙাবেন ও সমস্ত জিনিসটাকেই আপনার ইচ্ছামত বদলে নেবেন। আপনার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়বে এই সমগ্র পরিবর্তনে। এর থেকে এ সহজ সত্যটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, গৃহসজ্জা গৃহস্বামীর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয়বাহী। ওয়েস্কার যখন Trilogy

লিখেছিলেন তখন কিন্তু এগুলিকে লেখার বিষয়বস্তুর মতনই দরকারী ও ভাব-প্রকাশের সহায় স্বরূপ তিনি ভেবেছেন। আমার নতুন নাটক Chips with Everything আমি রোমে যাবার আগেই লিখতে শুরু করেছিলাম। এর প্রথম খসড়াটি আমি আগে করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এর বেলা আর আমি দৃশ্য বা সেটের কথা ভাবছি না। চাকরীজীবিদের এক বাসাবাড়িতে দৃশ্যটি সংঘটিত হচ্ছে এইটুকুই আমার পক্ষে বলা প্রয়োজন। তারপরে সেখানে দেয়াল থাকবে না বিছানা থাকবে বা আদৌ কিছু থাকবে কিনা তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি এখন আর দৃশ্যপট সম্বন্ধে কিছু ভাবি না। সত্যি কথা বলতে কি শুধু যে দৃশ্যপট কমাবার জন্যেই আমি এত চেষ্টা করছি তা নয়। নাটকের সংলাপও যথাসাধ্য কমাতে চাই আমি। আমি এখন নাটকের শৈলীর সম্বন্ধেই উত্তরোত্তর সচেতন হচ্ছি। আমার অন্য নাটকগুলি যে এ ধরনের নাটকের থেকে এমন কিছু মারাত্মক রকম ভাল নয় সেকথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। নাটকে কথা যত কম বলি আমার ততই ভাল লাগে। চলচ্চিত্রজাতীয় ধারার প্রতি আমার আগ্রহ থাকার জন্যেই যে এরকমটা হচ্ছে তা আমার মনে হয় না। রঙ্গশালায় কাজ করতে করতে, অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে করতে আমি একটা বিষয়ে উত্তরোত্তর সচেতন হচ্ছি যে—রঙ্গালয়ে লোকে আসে কিছু একটা ঘটছে সেটা দেখবার জন্যে। I'm Talking About Jerusalem নাটকে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু আভাস ছিল। বিশেষতঃ যে দৃশ্যে ঝগড়ার পরে অ্যাডা ও ডেভ্-এর ভাব হ'ল আর ডেভ্ অ্যাডাকে ফুল ও টেব্‌লক্লথ দিয়ে সাজালো সেই দৃশ্যে অথবা শিশুটির সঙ্গে 'সৃষ্টি'-দৃশ্যে এটা বেশ বোঝা যায়। একমাত্র যে সমালোচক এটা ধরতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মাইকেল কাস্টো। তিনিই খুব উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন যে 'জেরুসালেম'-এর কয়েকটি জিনিসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কালক্রমে হয়ত আমি এই বিশেষ ধারাটিরই বিকাশসাধন করতে পারি।

কিন্তু কস্মিনকালেও কি মানুষ এ ব্যাপারে একটা ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলতে পারে? পারলেই বা সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় কেমন ভাবে?

রঙ্গশালা যে দৃশ্যেরই স্থান এবং পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেটটা দেখলেই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—এ কথা অবশ্যই বলা যায়। কথাটাও কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু আমার মতে এ বিষয়ে একটা সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে নেওয়া দরকার। সেটা হ'ল এই যে, লোকে আসলে কোন জিনিসটার দাম দেয়—সেট দেখে যে উত্তেজনা হয় তার, না, রঙ্গমঞ্চে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে—সেইটার ?'

Chips with Everything নাটকে একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে একটাও কথা নেই। আছে কেবল অভিনয়। ওয়েস্কার মনে করেন যে, এই দৃশ্যটি তিনি যেমন মজার আর যেমন উত্তেজনাপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনিই হয়েছে। এই নাটকের খসড়াটা সম্বন্ধে ওয়েস্কার বলেছেন : আমার একটু ভাবনাই হচ্ছে এখন। তার কারণ, আমি যেন গতানুগতিকতার বন্ধন ছিঁড়ে বেরোবার জন্যে মরিয়া হয়ে বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝখানে এসে পড়েছি। এই নাটকের অনেকখানি করে অংশ আমি খুবই অস্বাভাবিক করেছি। কিন্তু গতানুগতিকতার বন্ধনটা এত দৃঢ় যে সেটাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছি বলে আমার মনে হচ্ছে না। অবশ্য Trilogy-র গঠনরীতি আর আঙ্গিক দুই গতানুগতিক। কিন্তু আমি তো গোড়া থেকেই বলছি যে আমার যদি কোন মূল্য থেকে থাকে তাহ'লে সেটা আমার শৈলীর জন্যে নয়, আমার বক্তব্যের জন্যে। কিন্তু এই কথা বললেই তো আবার সেই পুরনো তর্কটা উঠে পড়ে—'বিষয়বস্তু আর রচনাশৈলী তো বলতে গেলে একই জিনিস।… তোমার বলবার ধরনটাই যদি বস্তাপচা হয়, তাহলে যা বলছ সেটাই বা তা ছাড়া আর কি!' আমি বলব যে, পুরোনো ধরণটা আমার বেশ আসে। আর আমি যে গতানুগতিক পথে চলেছি তাতে তো আর আমার বক্তব্যের গুরুত্ব কিছু কমে নি—যদি অবশ্য বক্তব্যের গুরুত্ব কিছু থেকে থাকে। নতুন একটা রচনাশৈলীতে যে আমার খুব বেশি সুবিধে হবে তা নয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, একই জিনিস আর আমার ফেনাতে একটুও ভাল লাগছে না।'

একটি গীতিনাট্য রচনাকালে শ্রীওয়েস্কার বলেছেন : এই নাটকটাকে অনেকাংশেই দৃশ্যকাব্য বলা যায়। এতে সংলাপ খুব বেশি নেই। আছে

খালি প্রধান চরিত্রগুলির মুখে তিনটি বড় বড় গল্প। ঐ গল্পের মধ্যে দিয়েই নাটকটা রূপ নিচ্ছে। প্রথম গল্প দিয়ে নাটক শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় গল্পটা আসছে মাঝখানে। আর তৃতীয় গল্প দিয়ে নাটক শেষ হচ্ছে। তাছাড়া বাকি অংশটা প্রায় সবই দর্শনীয়—শ্রবণের এক্তিয়ার বিশেষ নেই বললেই চলে। এর গানগুলো বেশ কয়েক মাস আগে লিখে ফেলে রেখেছিলাম। এখন এতদিন পরে আবার এতে হাত দিয়ে দেখি যে, মাঝে মাঝে সুরকারকে বলতে ইচ্ছে করে—'ঐ প্রেমের গানটা অর্থহীন– ওটা আর ভাল লাগছে না।'

এবার যা বলব সেটা শুনে আপনারা খুব দুঃখ পাবেন। শিল্প সম্বন্ধে ওয়েস্কারের ধারণার কথাই সেই দুঃখের কারণ। শ্রীওয়েস্কার তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেছেন : এখন দেখছি যে, শিল্প যেন আমার কাছে দিন দিন নিরর্থক হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে শিল্প শুধু সব নয়। বসে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে হিসেব করে করে গীতিকাব্য লেখা—গান তৈরি করা। তারপরে তাই দিয়ে একটা বক্তব্যপুর্ণ নাটক খাড়া করা—এ তো খুনের ষড়যন্ত্র করারই সামিল। একেবারে বাজে ব্যাপার। আগে তবু এর জন্যে একটা ছুতো খুঁজে পেতাম—এখন তাও পাই না। এর বিকল্পে শুধু ক্রিয়া, শুধু অভিনয় ছাড়া আর কিছু আমার দেবার নেই। তাই মনে হয় প্রতিরক্ষা দপ্তরে যদি যাই তাহ'লে আমি হয়ত তার বাইরেই বসে থাকব। তাছাড়া আর যে কি করার আছে তা তো আমি ভেবে পাই না।

আমার নতুন নাটক Chips with Everything-এর একটা অংশ এই প্রশ্নটাকেই ছুঁয়ে গেছে। মোটামুটি নাটকটা হ'ল একটি সৈন্যদলকে পিটিয়ে ঠিক করার ঘটনা নিয়ে রচিত। একদল নতুন সৈন্যের আসা থেকে গল্প শুরু হচ্ছে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে এক ব্যাংকারের ছেলে। খুব ধনী আর সংস্কৃতি-বান পরিবার তাদের। সে এই সৈন্যদলের অফিসারদেরও দেখতে পারে না, আবার, নিজের বাড়ির লোকেদের প্রতিও.তার ঠিক তেমনি মনোভাব। অফিসাররা তার সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করতেন, যাতে সে লজ্জা পেয়ে স্বীকার করে যে ব্যক্তিগত কারণেই সে এমনি আচরণ করছে। অফিসাররা তার সঙ্গে কেমন ভাবে চলতেন তার একটি নিদর্শন দিই।

একজন অফিসার একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতে তোমার বেশ ভাল লাগে, তাই না টমসন ?

টমসন বলল : বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই আমার মিশতে ভাল লাগে।

অফিসার বললেন : আমাদের সঙ্গে মিশতে কিন্তু ভাল লাগে না তোমার। কি বল ?

টমসন বলল : কারো সঙ্গে মিশতে হ'লে তার একটা বিশেষ মান থাকা দরকার।

অফিসার বললেন : এটা তো খুব গায়ে-জ্বালা-ধরানো কথা হ'ল টমসন। খুব কাণ্ডজ্ঞানহীন হলে লোকে এমন কথা বলে—অস্বাভাবিক রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন হলেই। তবু দেখ, আমরা তো এ কথা শুনে কঠিন হয়ে গেলাম না। আমাদের তো গায়ে জ্বালা ধরল না। তোমাকে এর জন্যে কেউ আঘাত দেবে না। কোনো অভিযোগও করবে না কেউ। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কেউ তোমার কথাটা গ্রাহ্যই করি নি। আর আমরা যে গ্রাহ্য করি নি সেই কথাটাই তোমাকে স্বীকার করতে বলছি টমসন। এর নামই —বৃটিশ ডেমোক্রেসী। এই বৃটিশ ডেমোক্রেসীই হ'ল আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্র আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হেনে আসছি —এর বিরুদ্ধে কিছু করবার সাধ্য নেই তোমার। আমরা তোমার কথা শুনি, অন্য লোকেদেরও শুনতে দিই। তুমি যাই বল না কেন, আমরা অসম্মানিত হওয়ার কোনো রকম লক্ষণ দেখাই না। বরং তোমার প্রশংসা করি। তোমার সাহস আর আদর্শবাদের কথা বলে চাটুকারিতাও করি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমরা তোমার কথা শুনি, কিন্তু সে কথায় কান দিই না। আমরা তোমার সঙ্গে ভাব করি, কিন্তু তোমার গায়ে হাত দিই না। আমরা তোমাকে মুখে প্রশংসা করি, কিন্তু কাজে তা প্রকাশ করি না। বলতে পারি যে, আমরা তোমাকে সহ্য করেছি এবং তোমাকে সহ্য করেই তোমাকে তাচ্ছিল্য করেছি। আমাদের সব বিদ্রোহীদেরই আমরা এইভাবে শায়েস্তা করেছি

কোনো কোনো সঙ্কটের মুহূর্তে ওয়েস্টার নিজেকে এই বলে বুঝ দিয়েছেন

যে, তাঁর বক্তব্য খুব অল্প লোকেই বুঝেছে। কিন্তু তাতে তো মন ভরে না। মানুষ যা চায় তা হল রক্তাক্ত বিপ্লব। উদ্ভট কথা? কিন্তু কথাটা খুবই সত্যি।

মানুষ যা চায় ঠিক সেইটুকুই তারা নাটক থেকে গ্রহণ করে—এ একটা ভয়ঙ্কর সত্য। তাদের মনের মতন জিনিসটি পেলে তারা সবটাই নিতে পারে। সেই জন্যেই জন হুইটিং জটিলতা সৃষ্টির জন্যে যতখানি সময় ব্যয় করতে পারেন ওয়েস্কার তা পারেন না। পারেন না বলেই বলেন: জটিলতা আর সূক্ষ্মতায় আমার বিরক্তি ধরে গেছে। তাই বলে আমি যা করব সেটাও যে নগণ্য হবে না এটুকু আশা আমি রাখি। সহজ হবার জন্যে, সরল হবার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। মানুষ যত সহজ হবে ততই সে চতুর বক্রোক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারবে—এড়িয়ে যেতে পারবে খুঁটিনাটির কারুকার্য। তত বেশি সততা তার মধ্যে দেখা দেবে।

আর্নল্ড ওয়েস্কার মূল প্রবন্ধের শেষে বলেছেন: যখন বলি যে, আমার মনে হয় শিল্প শুধু সব নয়। তখন বোধহয় এই কথাটাই আমি বোঝাতে চাই। আমার সত্যি ইচ্ছে করে যে একটা নাটক লিখি, যার আরম্ভটা হবে এইরকম—'একদা এক স্থানে'।

'আর্ট ইজ নট এনাফ'
অনুসরণে

অচেনা মঞ্চঃ অন্য নিরীক্ষা

মূল রচনাঃ জাঁ পল সার্ত্র
অনুসরণেঃ মনোরঞ্জন বিশ্বাস

অশ্রান্ত নিরীক্ষাই নব নব সাহিত্য-মূর্তির প্রণেতা। সাহিত্যের উপনিবেশ নির্মিত হয় মানব সত্যের পুনঃ পুনঃ আবিষ্কারের অববাহিকায়। জীবনের অনিঃশেষ আবেগ সাহিত্যের সমুদ্রে শ্রেয় মূল্যবোধের বন্দর নির্মাণ করে। যে শুদ্ধ সত্তার যন্ত্রণা মানুষ নিয়ত অনুভব করে, সেই যন্ত্রণাই তাকে কঠিন চেতনায় প্রত্যর্পণ করে। প্রত্যাহের অবসানে প্রত্যাহের নবজন্ম ঘটায়। নবজাত সেই প্রত্যয়ই সাহিত্যের মর্মমূল্য হয়ে দাঁড়ায়।সাহিত্যের তরঙ্গ উত্তাল হয়। সাহিত্য আন্দোলন হয়। আলোড়িত করে জীবন, সমাজ ও চৈতন্য।

ফরাসী শিল্প সাহিত্যে এই চৈতন্যের আন্দোলন যত বেশী হয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যে তা হয় নি। অপরিজ্ঞাত জীবন ভাবনা ফরাসী সাহিত্যে যত চলচ্ছবি নির্মাণ করেছে, ইউরোপের আধুনিক কালের সাহিত্যে তা আজও নেপথ্যে। কালের যাত্রার ধ্বনি দুঃসাহসী দর্শনের রথে উধাও করে দিতে ফরাসী দেশের মতন এমন দেশ আর নেই।

আত্মার অন্তরীন যন্ত্রণার অন্ধকার থেকে মুক্তির সংবাদ ও মনোত্থভনের নিপুণ, অনুশীলনী সন্ধিৎসা সাহিত্যের ভুবনে ফরাসী দেশ ছাড়া আজও অচেনা।

মনের অতল গহনে নিদ্রিত যে আত্মা, সহসা আমরা যাদের কখনও ভুলেও ঘুম ভাঙ্গাই না। সেই অচেতন অর্থহীন আত্মার বদ্ধ দরজার ওপর যখন সত্যের আলো এসে পড়ে, বিদীর্ণ হাহাকারের মধ্যে আত্মার ঘুম ভাঙ্গে এবং বন্ধন মুক্তির মধ্যেই যখন আবার বন্ধনের অনুভূতিতে জাগ্রতের বিবেক আর্তনাদ করে - অস্তিত্বের সেই হতাশ, বিবমিষার সাংবাদিক নেতা জাঁ পল সার্ত্র। যে দার্শনিক এষণার বাণী ঘোষণা করলেন সার্ত্র তা হ'ল অস্তিতিবাদ। সত্য ও স্বপ্ন, যুক্তি ও অযুক্তি, আছে আর নেই-এর বিস্ময়কর সৌভ্রাত্রই সার্ত্রের সাহিত্য ভাবনার পরিমণ্ডল। মানুষের স্নায়ুর শব্দ এখানে অর্থহীন, তার কোনো মুক্ত সত্তা নেই, বিবেক অর্গলিত, বিশ্বভুবন বোবা, মানুষ নিঃসঙ্গ, একাকী সংসারের কর্কশ শূন্যতা মানুষকে চতুর্লোক থেকে অবরোধ করে রেখেছে। তার মুক্তি নেই। কেননা মুক্তিই তার পুনঃ বন্ধনের হেতু। সার্ত্রর অস্তিতিবাদের এই হ'ল বিশেষ লক্ষণ। বলা বাহুল্য, ফরাসী দেশের নব্য সাহিত্যসমূদের এই হল আধুনিকতম বৃত্ত। তীর বেঁধা অস্তিত্বের যন্ত্রণার তারাই পারিভাষিক।

সাহিত্যের এই নব তরঙ্গে যাদের আবির্ভাব রাসিন, বোদলেয়র, র‍্যাবো, মরিয়াক তাদেরই অন্যতম। অস্তিতি দর্শন-আন্দোলনের নেতা শিল্পী আলবেয়র কামু ও জাঁ পল সার্ত্র।

এই অবিনাশী দর্শনের জন্মভূমি মূলতঃ এক বিচিত্র মানসিকতা-বোধ। যে অভিন্ন ঐক্যধারার ফসল এই অস্তিতিচিন্তা, তা হ'ল দেকার্তের বিজ্ঞানজাত চিন্তা ও যুক্তি, অন্যদিকে পাসকালের আন্তর গহন সত্যের সন্ধানী দৃষ্টি। সন্ধানী আত্মা অন্বেষণ করতে করতে গিয়ে জানতে পারল, মানুষের স্বভাবের অন্তর্নিহিত অন্ধকারই তাকে আনন্দিত হতে বাধা দিচ্ছে—আলোকিত করছে না। সন্ধিৎসা, যুক্তি ও আত্মার শৃঙ্খল ভাঙার কান্নার অনুভবই দেকার্তে পাসকালের এই দুই চিন্তাস্রোতের সমন্বয়িত শিল্পী সার্ত্র—অস্তি ও অনস্তির উপলব্ধ সত্যের দার্শনিক নেতা।

তাই যখন ক্যাথারিণ কর্ণেলের প্রযোজনায় জাঁ আজউইলির "আন্টি গো" নাটক নিউইয়র্কে প্রযোজিত হ'ল, নাট্য সমালোচকগণ খুশী হতে অসমর্থ হলেন।

সংশয়িত প্রশ্ন উঠেছিল এই প্রসঙ্গে যে, প্রাচীন পুরানবৃত্তের আদৈব মঞ্চজীবন পাওয়ার অবকাশ আর আছে কিনা। অন্যবিধ তিরস্কার ছিল এই বলে যে "আন্টি গো" নাটকীয় চরিত্রের বিরহে নিষ্প্রাণ। সুতরাং অপ্রশংসনীয়। সাত্র্ মনে করেন যে, যে নব্য সাহিত্য শিল্পিগণ অধুনা ফরাসী ভূমিতে তাদের চিন্তার বিভিন্নতা সত্ত্বেও, ঐক্যবদ্ধ সাহিত্য লক্ষ্য ব্যতিরেকে যে শিল্প ভাবনায় নিমগ্ন, সেই অভিভাবনের রসিক সংবাদী এই সমালোচকবৃন্দ নন।

এমন কি ফ্রান্সের পাদপ্রদীপের আলোকে ট্রাজেডীর প্রত্যাবর্তন সম্ভব কিনা, কিংবা দর্শনমুখী নাটক আবার সৃষ্ট হবে কিনা তা নিয়ে অন্তহীন আলোচনা হয়ে গেছে এবং তা বাতিল হয়েছে।

ট্র্যাজেডী এমনই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিকশিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। সাত্র্ বলেন, এ নিয়ে চিন্তা করার অভিপ্রায় তাদের আর নেই। দর্শন-নির্ভর নাটকের জন্যও তারা আর উন্মুখ নয়—সে দর্শন মার্কস্, সেণ্ট টমাস কিংবা অস্তিত্ববাদ যাই হোক না কেন। কেননা নতনত্ব প্রবর্তনার চেয়ে ঐতিহ্য প্রিয়তার প্রত্যাবর্তনে তাদের অভীপ্সা কম এবং সেই কারণেই তারা এমন থিয়েটার-ভাবকে আশ্রয় করতে চায়, যা চল্লিশপূর্ব দশকের থিয়েটার ভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পৃথিবীর দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্ত্তী কালের থিয়েটার-ভাব যা সম্ভবত যুক্তরাজ্যেও চিন্তার সামগ্রী হয়ে উঠছে, সে হচ্ছে চরিত্র-চিন্তার থিয়েটার। থিয়েটারের মৌল প্রসঙ্গ চরিত্র ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ এবং চরিত্রগুলির সম্মুখ সংঘাত। তথাকথিত "মুহূর্ত সংস্থান" সক্রিয় থাকতে কেবলমাত্র চরিত্রগুলিকে উপযোগী অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশের সাহায্য করবে। এই সময়ের নাটকগুলিতে মূলতঃ মনোবিজ্ঞানের নিরীখে কোন এক কাপুরুষ, কিংবা মিথ্যাবাদী কিংবা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি কিংবা আশাভগ্ন মানুষের সমীক্ষা-দীপ্ত অন্বেষণ ছিল। কদাচ কোনো নাট্যকার হয়ত ভালবাসা প্রমুখ আবেগ নির্ভর বৃত্তিজনিত শিল্পকর্মের প্রয়াস পেয়েছেন কিংবা অবরচেতনার ছবি এঁকেছেন।

এই নির্দ্ধারিত রীতি অনুসারে "অন্টিগোন" কোনোক্রমেই চরিত্র-প্রধান বলা সম্ভব নয়। কিংবা মনস্তাত্বিক রীতি পদ্ধতির অনুযায়ী আবেগশীলতার পাত্রী সে নয়। সে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ; একটি বিশুদ্ধ, মুক্ত চাওয়ার মানবী। ফরাসী নাট্যরচনাকারগণ বিশ্বাস করেন না যে, মানুষ, নির্দ্দিষ্ট অবস্থার প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হতে পারে এমন একটি তৈরী করা মানবিক প্রকৃতি। তাঁরা একথাও মনে করেন না যে কোনো ব্যক্তিসত্তা কেবলমাত্র কোনো ঝোঁক বা আবেগ দ্বারা বিধৃত হতে পারে—যার শুধু মাত্র ব্যাখ্যা চলতে পারে কোনো উত্তরাধিকার, আঞ্চলিকতা ও কতকগুলি অবস্থাকে ভিত্তি করে। তাঁরা মনে করেন যে, যা চিরকালীন, তা প্রকৃতি নয়, তা হচ্ছে ঘটনা। যে ঘটনার কক্ষে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে। অর্থাৎ মনস্তাত্বিক বিশেষত্বের কোনো পরিণাম নয়, সে হচ্ছে একটি তামসী প্রতিবন্ধকতা, একটি অন্ধকার সীমানা—যা তাকে দিকদিগন্ত ঢেকে আবৃত করে আছে। তাদের ধারণায় মানুষ যুক্তিবাদীও নয় সামাজিকও না। সে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব মাত্র। পরিপুর্ণ অনির্ণেয়। সে শুধু আপন অস্তিত্বকে তখনই উপলব্ধি করে, যখনই সে প্রয়োজনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। যেন ভয় ও সৌন্দর্য ভরা চলতি বসুন্ধরায় অনেক মানুষের মধ্যে সে এসেছে, যারা এই দুয়ের মধ্যে অনেক আগেই তাদের চাওয়া পাওয়া শেষ করে নিয়েছে। এবং যারা এই পৃথিবীর মানে অনেক আগেই জেনে নিয়েছে। কর্মের যে প্রয়োজনীয়তা কিংবা নির্মাণের যে ধ্রুবতা সে যেন তারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে নিজেকে এমন জীবন ভঙ্গীর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে যে, জীবনকে সে নিজে রচনা করেছে, এবং সে তাই যা সে নিজেকে নির্মাণ করে এবং নিজেই নিজের ফসল। তার সম্মুখে যেন দ্বিতীয়বার আর এই অবকাশ আসবে না। যে খেলা তাকে খেলতে হবে সেই হবে তার শেষ খেলা, তার জন্যে তাকে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন। সেই কারণেই তাঁরা অনুভব করেন যে মঞ্চে এমন কিছু ঘটনা সৃষ্টি করা হোক যাতে করে মানুষের অবস্থার মৌল বিষয়ের ওপর আলো এসে পড়ে এবং এই আবর্তে মানুষ কি করছে, কি ভাবছে, মুক্ত মনে কি চাইছে সে, প্রেক্ষকও তার সঙ্গে মিলিয়ে নিক তার ভাবনা আর তার চাওয়াকে।

এই চালচিত্রে "এন্টিগোন"কে সময়ে সময়ে অমূর্ত বলে মনে হতে পারে কেননা স্মরণের ওপার থেকে কিছু ছায়া নিয়ে যৌবনা গ্রীক রাজতনয়ার মতন। যে মুহূর্তে সে তার আপন মৃত্যুর স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করল তখনই তাকে বাহুল্য বর্জিত স্বাধিকার প্রমত্তা নারীর মতন মনে হয়েছে। অনুরূপভাবে দেখি Simone De Beauvour's Les Bonchero juntiles এ Vauxelles এর মেয়রকে যখন সিদ্ধান্তে আসতে হবে, তার অবরুদ্ধ নগরীকে কি ভাবে তিনি রক্ষা করবেন, সে কি নগরীর অর্দ্ধেক নর যত্তেক নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করে ফেলবে, নাকি সকলকে বাঁচাবার সঙ্কল্প নিয়ে সকলের সর্বনাশের ঝুঁকি নিয়ে এই অবস্থায় আমাদের বিন্দুমাত্রও জানবার আগ্রহ সেই যে তিনি ইন্দ্রিয়বাদী না অনাসক্ত কিংবা তিনি ওয়েদিপাউস চেতনায় আচ্ছন্ন, না কি তিনি রাগী অথবা আমুদে স্বভাবের মানুষ? সন্দেহ নেই যদি তিনি গোঁয়ার কিংবা অবিমৃষ্যকারী হন, কিংবা দাম্ভিক অথবা ভীরু স্বভাবের তাহ'লে তিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। আগে থেকে আমাদের ভাববার কোনোই প্রয়োজন নেই যে, কোনো যুক্তি অথবা কোনো মনোভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তিনি স্থির করবেন। বরং আমরা লক্ষ্য রাখব সেই মানুষটির মানসিক যন্ত্রণার প্রতি, যে মানুষটি মুক্তমতি এবং বোধাশ্রয়ী এবং সনিষ্ঠ প্রয়াসে স্থির করতে চাইছে কোন পথে সে চলবে। কে জানে যখন সে সবার জন্যে ভেবে যা স্থির করছে, সেই সঙ্গে তার স্বভাবের স্বরূপচিত্তকেও সে সজ্জিত করে ফেলে এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে সে স্বৈরাচারী কিংবা গণতন্ত্রী বলেও নিরূপিত হয়ে যাচ্ছে?

আমাদের মধ্যে যদি কেউ মঞ্চে কোনো চরিত্রকে উপস্থিত করেন তাহলে সে কেবলমাত্র সেই চরিত্রের উদ্দেশ্যকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই করবেন। যেমন আলবেয়ার কামুর 'কালিগুলা' নাটকের প্রথমেই একটি চরিত্র আছে। সবাই মনে করবে যে, সে অত্যন্ত ভদ্র ও অতিশয় সদাচারী। কিন্তু যেইমাত্র তার সম্মুখে জগতের অযৌক্তিকতার ভয়ঙ্করতা উদঘাটিত হ'ল সেই মুহূর্তে তার সমস্ত সদয়তা ও বিনয়তা নিঃশেষিত হ'ল। এখন থেকে সে অন্য সকলকে

এই অযৌক্তিকতার কথা বলবে বলে স্থির করল এবং কেমন করে সে তার উদ্দেশ্যকে রূপ দিতে সচেষ্ট হল তাই হ'ল নাটকের গল্প।

যে মানুষ তার নিজস্ব অবস্থায় চার দেওয়ালের মধ্যে স্বাধীন, সে মানুষ কি ভাবল না ভাবল, কি সে স্থির করল—যা করল সেই হচ্ছে আমাদের নাটকের বিষয়ভাব। চরিত্র-চিন্তার থিয়েটারের উত্তরসূরী হিসেবে আমরা চাই পরিস্থিতির নাটক। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানব অভিজ্ঞতার যে সকল পরিস্থিতিগুলি চিরচেনা এবং যা সামগ্রিক জীবনে একবার না একবার দেখা দেবেই তার আন্তর সত্তার উদ্বোধন ও আবিষ্কারের জন্যে অনুসন্ধান করা।

আমাদের নাটকের মানুষগুলি একটি আরেকটি থেকে স্বকায়তায় স্বতন্ত্র। তার মানে এই নয় যে একজন কৃপণ ব্যক্তির সংগে একজন কাপুরুষের যা পার্থক্য কিংবা একজন কৃপণের সঙ্গে আর একজন সাহসী পুরুষের যা তফাৎ তাই। তার মানে হচ্ছে এই, কিনাগুলি কেন্দ্রাপসারী ও সংঘাতমুখী—যেন একটি অধিকারের সঙ্গে অন্য একটি অধিকারের সংগ্রাম।

এর থেকে বোঝা যাবে, কেন আমরা মূলতঃ মনঃসমীক্ষার পন্থাবলম্বী নই। সহসা কোনো প্রবৃত্তির পরিপূর্ণ উদঘাটনের জন্যে আমরা কোনো সঠিক সংলাপের ওপর নির্ভরশীল নই, কিংবা প্রেক্ষক সাধারণের সামনে অনিবার্য বাস্তবতার ছবি আঁকবার জন্যে কোনো দৃশ্য রচনা করতেও চাই না। মনঃস্তত্ত্ব আমাদের কাছে বিমূর্ত বিজ্ঞান বলে মনে হয়। কেননা মানুষকে তার সত্তা পারিপার্শ্বিকে না নিক্ষেপ করে মনস্তত্ত্ব তার শুধুমাত্র আবেগের ক্রিয়াগুলিকেই পর্যবেক্ষণ করে। সমাজের কোনো নিষেধ অথবা আদেশের কিংবা ধর্মীয় অথবা নৈতিক মূল্যবোধের জাতির বা শ্রেণীর অধিকার, অভিপ্রায় ও কর্মের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ না করে, আমাদের ধারণায় একটা মানুষ আপনাতে আপনি সমাহার। এবং আবেগ তার আপন প্রয়াসের খণ্ডাংশ।

এইখানে যেন আমরা গ্রীক ট্র্যাজেডী তত্ত্বের কাছে ফিরে আসি হেগেল দেখিয়েছেন গ্রীকদের কাছে আবেগধর্ম শুধুমাত্র হৃদয়-বৃত্তির ঝড় নয়, মূলতঃ অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সফোক্লিসের ক্রেয়নের ফ্যাসীবাদ, এন্টিগোনের অবাধ্যতা, এবং কামুর কালিগুলার মত্ততা যেন আমাদের অস্তিত্বের গহন

গহ্বর থেকে উঠে আসা অনুভূতির প্রবাহ। দুর্ভেদ্য ভাবনার ভাষা। যা শুধু অধিকার ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি—যেমন নাগরিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার, একক ও যৌথ নীতিবোধ, হনন ইচ্ছার অধিকার, মানুষের অস্তিত্বের কাছে তার করুণ মুক্তির উদ্ঘাটন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা মনঃসমীক্ষণকে বরবাদ করছি না, সে হবে অযৌক্তিক। কিন্তু আমরা অখণ্ড জীবনের কথা বলি।

অতিক্রান্ত পঞ্চাশ বছর ধরে ফরাসীদেশে যে মৌখিক আলোচনা প্রচলিত ছিল, সে হচ্ছে রাসিন, যে মানুষকে, সাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন সে মানুষ একান্তই তার মনের সৃষ্টি, এবং মননশীলতার রূপময় ভাষ্য। করনেইল, অপরপক্ষে, রূপ দিয়েছেন সেই মানুষকে, যে মানুষ সম্পূর্ণ মাটির মানুষ এবং তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে সে মানুষ। যে নতুন সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে তারা করনেইলের সাহিত্যসৃষ্টির অনুসারক। আজকের এবং ভবিষ্যতের অচেনা মঞ্চের জন্যে যে নিরীক্ষা কম্পমান তা হচ্ছে চরিত্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পরিবর্তে অধিকার দিয়ে সংঘাতের চিত্রের সঞ্চায়ন। সুতরাং আমাদের নবনাট্য তরঙ্গে তথাকথিত রিয়ালিস্টিক থিয়েটারের কোনো মূল্য নেই, যে রিয়ালিজম শুধুমাত্র পরাজয়ের গল্প শোনায়, এবং মানুষকে ধীরে ধীরে বাইরের শক্তির আক্রমণে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটে। আমরা নিজেদের সত্যিকারের রিয়ালিস্ট বলে দাবী করি, কেননা প্রত্যহের জীবনে ঘটনা এবং অধিকার, বাস্তব ও কল্পনার মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতার মধ্যেকার সত্যিকারের ব্যবধান কি, তা আমরা জানি।

আজকের থিয়েটার, কোনো ভেবে রাখা কল্পনা বা থিসিসের থিয়েটার নয়। আজকের থিয়েটার আপন পরিপূর্ণতার মধ্যে একজন মানুষের পরিস্থিতির উদ্ঘাটন, আধুনিক মানুষের আপন সমস্যার উপস্থাপন, তার স্বপ্ন ও সংগ্রামের আপন চিত্রায়ন। আমরা যদি কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কিংবা বিশ্বজনীন বিশেষ মানুষ যেমন—কৃপণ, মানবদ্বেষী, নষ্টিতস্বামী প্রভৃতির প্রতীক মানুষের জীবন সৃষ্টি করতাম তাহলে আমরা আমাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

করতাম। যদি আমাদের মঞ্চকে সমস্ত মানুষের হয়ে কথা বলতে হয়, তাহ'লে তাদের ভাষায় তাকে কথা বলতে হবে, পুরাণের আঙ্গিকে তাদের মতন করে বলতে হবে—যা তাদের পক্ষে গ্রহণ করা এবং অনুভব করা সহজতর হবে।

১৯৪০ সালে যখন আমি জার্মানীর বন্দী শিবিরে, তখন আমি থিয়েটারের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করি। আমি একটি নাটক লিখি। নাটক ও উপস্থাপক একজন বন্দী। অভিনেতা বন্দীরা। বন্দীরাই দৃশ্যপট অঙ্কনকারী, বিষয় বন্দীপ্রসঙ্গ। যখন আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাদপ্রদীপের ওপারের বন্দী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাদের বন্দীদশা বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছিলাম, আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তারা স্তব্ধ, গভীর মন দিয়ে শুনছে। তখন আমি বুঝলাম, থিয়েটার কি হওয়া উচিত। থিয়েটার যেন একটি সর্বজনীন প্রপঞ্চ।

এ ক্ষেত্রে হয়ত একটি বিশেষ পরিবেশের সুযোগ ছিল। নিশ্চয়ই এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটবে না যে, নাটকের শ্রোতা সবসময়েই একটিমাত্র সাধারণ বিষয়ের বশবর্তী হবে। সাধারণত দর্শকশ্রেণীর সমাবেশ হয় ভিন্ন ভিন্ন, পেশা, মেজাজ ও চরিত্রের সমবায়ে একটি বিচিত্র নরনারীর মেলা। নাট্যকারের কাছে এ এক চ্যালেঞ্জ। বিশেষ যে, তাকে সকল শ্রেণীর দর্শক চিত্তের অন্তরে এমন একটি সুরের আগুন জ্বালাতে হবে যাতে করে প্রেক্ষাঘরের দর্শক সাধারণের মৌলিক বিভিন্নতা মুছে গিয়ে একটি অখণ্ড বন্ধনের সৃষ্টি হয়।

তার মানে এই নয় যে প্রতীক ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত বাইরের দিক থেকে বোঝা কিংবা বোঝানো সম্ভব হয় না বলেই অপ্রত্যক্ষ অথবা কাব্যিক ব্যঞ্জনার আড়ালে বাস্তবতার অভিব্যক্তি ঘটানো হয়। মেটারলিঙ্ক যে ভাবে ব্লুবার্ড-এ মানুষের সুখকে উপস্থিত করেছেন আজকের দিনে তা অচল। আজকের দিনে মঞ্চে সাংকেতিকতার ব্যবহার আমরা না করলেও পুরাণের ব্যবহার চাই। মৃত্যু, নির্বাসন কিংবা নিঃসঙ্গতার মত ভাবগুলির মহৎ পৌরাণিক ব্যবহারকে সাধারণের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াসকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

আলবেয়র কামুর লা ম্যালেন্তাঁদু'র কুশীলবগণ প্রতীকী নয়। তারা রক্ত,

মাংসের সজীব জীবন্ত অস্তিত্ব। দেখা গেল, জননী, কন্যা, পুত্র যখন দূর দেশ ভ্রমণ সেরে ঘরে ফিরে এল, তখন অন্তরের দিক থেকে তাদের সকল সর্বনাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। যে ভুল বোঝাবুঝি তাদের নিজেদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে এনেছে—পৃথিবীর কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে—তা ফরাসী পুরাণ ভাবেরই অন্তর্গত।

তথাপি এই পর্যায়ের নাটকগুলি কঠিন। এই নাটকগুলির পাত্রপাত্রীরা এবং কাহিনী অংশ সহসা সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, প্রথাসিদ্ধ ক্লাসিক নাটকের রীতি বিন্যাস সম্মত ধাপে ধাপে চরম মুহূর্তের দিকে ধাবিত হয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটায় না। আমাদের নাটকগুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রচণ্ডতায় পূর্ণ। একটি মাত্র ঘটনাকেন্দ্রিক। অল্প চরিত্রের স্বল্প সময়ের পরিসরে কয়েক ঘণ্টার নাটক। একটি দৃশ্যে, কয়েকটি চরিত্রের আসা যাওয়ার মধ্যে, অধিকার রক্ষার সংগ্রামের আবেগময় যুক্তিসমূহ, নিউইয়র্কের কল্পিত নাটকগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফরাসী জনসাধারণের কাছে যা গভীর, ভীষণ, নিউইয়র্কে তা একটি প্রশ্ন খচিত অপ্রশংসা।

সুতরাং আমাদের নাটকের সংলাপ প্রক্ষেপের জন্যে নতুন রীতির প্রয়োজন হয়েছে। সংলাপ একাধারে যেমন সহজ হবে, তেমনি এমন কথা দিয়ে গাঁথা হবে যা সকল মানুষের প্রত্যহের ব্যবহারিক কথার সম্মান পাবে। যদি আমরা সংলাপ সীমিত করতে পারি তাহ'লে ঐতিহ্যময় ট্র্যাজেডীর ঐশ্বর্য-গুলিকে আয়ত্ত করতে পারি। আমার সাম্প্রতিক মর্ট সাঁস সেপালটুর নাটকে আটপৌরে প্রবাদ, শপথ উক্তি এমনকি অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করেছি চরিত্রের দাবীতে। কিন্তু আমি যত্ন নিয়েছি বক্তব্যগুলিকে সাধ্যমত সংক্ষেপে বলতে, এমনকি অনেক শব্দকে অনুচ্চারিত রাখতে এবং প্রবাদ প্রযুক্তির অভ্যন্তরে এমন একটি উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিতে যা চলন কথার সহজ ধ্বনির বহির্ভূত।

যে নাটক ছোট এবং প্রচণ্ড, বড় একাঙ্ক আয়তনের নাটক, একটি ঘটনাগত, অধিকার-সংঘাত মন্দ্রিত, পরিমিত চরিত্রের ঘন বিন্যস্ত নাটক, তাই আজকের দিনের থিয়েটারের নাটক।

যে নাটকে চরিত্রগুলি একটি ঘটনার পরিমণ্ডলে স্বাধীন ইচ্ছার মুক্তি দিতে চায়, যে নাটক চরিত্রে দুঃসহ, নীতি সম্পন্ন ও পৌরাণিক ভাব-গুণে সমৃদ্ধ যুদ্ধ অতিক্রান্তকালে সেই হচ্ছে ফ্রান্সের নব নাটক।

ফরাসী জীবনভঙ্গীর অমর সত্তার সঙ্গে এই নাটকগুলির কঠিনতার একটি অন্তরঙ্গতা আছে। ফরাসী জীবনের নৈতিকতা এবং আধিবিদ্যক বিষয় জাতির ঐতিহ্যের আলোকচিত্র। তারাই সৃজন করেছে এবং পূর্ণবিন্যাস করেছে নব নব নীতি মূল্যের অন্বেষণ করেছে তারা কি শুধু চলতি কালের—সময়ের ফসল? নাকি তারা তাদের সৃষ্টির প্রচণ্ডতা নিয়ে, দুর্বিনীত দর্শনের কঠোরতা নিয়ে অন্য দেশ, অন্য মানুষের দরজায় উপস্থিত হবার ছাড়পত্র পাবেন, সেই হচ্ছে তাদের নিজেদের কাছে, তাদের আত্মগত জিজ্ঞাসা।

'ফরচুন অব মিথ্‌স: দি
ইন্‌স্পিরেশন অব ফ্রান্স'
অনুসরণে

মায়ামঞ্চ এবং নাটক

মূল রচনা : জন বোয়েন

অনুসরণে : মনোজ মিত্র

ভাষা অথবা আইনের সৃষ্টি অরাজকতা দমন করতে। কাজেই আমাদের উচিত ব্যক্তিগত স্বার্থে এক একটি অর্থ শব্দের ওপর না চাপিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুবিধার জন্যে একটি চুক্তিতে আসা, একটি শব্দের জন্য একটি অর্থ নির্ধারণ করা।…আইন আমরা প্রণয়ন করে থাকি অন্যের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের ঘাড় যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে। ফলতঃ প্রচণ্ডরকম সঙ্কোচন-প্রসারণে ভাষা বা আইন বহুক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত চেহারা হারাতে বসেছে—অনেক সময় কোনোরকম চেহারাই থাকছে না। এমনি দু'টি নিরাকার শব্দ : বস্তুবাদ ও স্বভাববাদ। এরা যে একে অন্যে থেকে পৃথক, অন্তত একসময় যে ছিল, তা আমরা জানি। কিন্তু শব্দদ্বয় আজ মুখ থেকে মুখে এমন চাল ভাতের মতো হয়ে গেছে যে, একজন বোদ্ধাই কেবল বলতে পারেন কোনটি কখন কি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর একজন কমবুদ্ধির ভদ্রলোক কাজে কাজেই ঘাড় নেড়ে সে ব্যাখ্যা মেনে নেবেন।

আভিধানিক বিচারে বস্তুবাদ একটি তত্ত্ব, স্বভাববাদ তার ব্যবহারিক দিক। অক্সফোর্ড অভিধানে অবশ্য বস্তুবাদ ও স্বভাববাদ সার্থক। আমরা প্রথমোক্ত

পার্থক্যটি মেনে নিয়ে বলছি, থিয়েটারে বস্তুবাদ বলতে বস্তুধর্মী বা জীবনধর্মী নাটককেই বোঝায়। যে নাটক বাস্তব জীবন, তার প্রাতিভাষিক রূপটি নয় শুধু তার অন্তরের কামনা বাসনা আবেগ প্রক্ষোভ নিয়ে রচিত সেই নাটকই জীবন-মুখী বা বাস্তবধর্মী। থিয়েটারে স্বভাববাদের প্রশ্ন উঠে থাকে নাট্য প্রয়োগ-কর্ম সম্পর্কে। যখন মানবিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি অভিনেতা অভিনয়ে প্রতিফলিত হয় তখনই তা হয়ে উঠে স্বভাবী। এদিক দিয়ে দেখলে বাস্তবতার বিপরীত কৃত্রিমতা; স্বাভাবিকতার উল্টোপিঠে আকারধর্মিতা স্বভাব প্রযোজনায় তাই একটি অ-বস্তুধর্মী নাটক চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠতে পারে। অপরদিকে একটি বস্তুধর্মী নাটকের আকারগত প্রযোজনা শুধু সম্ভবই নয়, লাভজনকও।

এ বিচারে হ্যামলেটকে বস্তুধর্মী নাটক বলতে পারি; কিন্তু 'নিউ টেনান্ট' নাটকের অভিনয়ে আসবাবপত্রের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তা নয়। নয় লণ্ডনে বর্তমানে যে সব নাটক চলছে তার অধিকাংশই—যেহেতু এদের চরিত্রগুলি জীবনলক্ষণাক্রান্ত নয়, যান্ত্রিক। অনেক সময় মঞ্চে সচরাচর দোকানে কি বাড়িতে যেসব আসবাবপত্র দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করে বা পাত্রপাত্রীর বাচনভঙ্গী, আচার ব্যবহার যেমনটি দেখতে শুনতে পাওয়া যায় ঠিক তেমন করে নাটককে, বাস্তবধর্মী নামে চালাবার অপচেষ্টা চলছে। "Amorous prawn," কি "Fings Ain't wot They used T'Be"—নাটক দু'টির সম্পর্কেও এ কথা সত্য। প্রথম নাটকের টেবিল চেয়ার বা অন্যান্য জিনিসপত্র বেশ চেনা, মঞ্চের কল্যাণে চিনেছি—আমাদের মধ্যে অনেকের বাড়িতেও সে সব আছে (থিয়েটারের দর্শকরা বেশির ভাগ বিত্তবান)। তুলনায় 'Fings'···এর সাজসরঞ্জম অচেনা। তবু আসবাবপত্র চেনা বা অচেনা হওয়ার ওপর একটি নাটকের জীবন ঘনিষ্ঠ হওয়া না-হওয়া বোঝায় না। যদিও জীবন আমাদের যুগপৎ চেনা ও অচেনা! তার ওপরটা আমরা চিনি—বৃহৎ অংশটা অপরিচিত থেকে যায়। দু'টি নাটকে এই জীবনের একটা ভাসা-ভাসা ছবি পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, দুঃখ তখনই হয়, একজন তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যকার যখন হন' পরিশ্রমী। অনেক আছেন তৃতীয় শ্রেণীর পরিশ্রমী...

যারা মনে করেন দু'চক্ষুতে যা দেখা যায় তাই জীবন…তার অতল গভীর আলোকিত করার দৃষ্টি তাঁদের নেই—ম্যাগাজিনের গপ্‌পোগুলিই এঁদের পুষ্টিসাধন করে…পুরনো আমলের জনপ্রিয় নাটকগুলির দৃষ্টান্ত হয় এঁদের পথপ্রদর্শক। তবে হয়তো প্রকৃত শিল্পীদের পক্ষেও সত্যিকারের জীবনধর্মী রচনা সম্ভব নয়। তাঁরা তো আর সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নন। সবজান্তা হতে পারেন না কেউ। তাই তাঁদের জন্যে কিছুটা নিরীক্ষণ, কিছুটা অনুধাবন কিছুটা আবিষ্কার—আর একটি দর্শন। এই স্বল্প সঞ্চয়ে দূরপাল্লার যাত্রী তাঁরা।

* * * ৭

'ধরি মাছ না ছুঁই জল' নীতিতে যেমন একটি রচনা জীবনধর্মী হয়ে ওঠে না, ঠিক তেমনি প্রকৃত বস্তুবাদী নাটকের জন্যে স্বভাববাদী প্রয়োগরীতির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ মঞ্চে আমরা যা দেখি তাকে কখনো সত্য বা স্বাভাবিক বলে মনে করি না। মঞ্চসজ্জা কি অভিনেতার হাঁটা চলা কথা বলা যতই কেন স্বাভাবিক হোক না, আমরা জানি তা সত্য নয়…জানি আমাদের সামনে এক মায়ামঞ্চ উন্মোচিত। আমরা স্বেচ্ছায় ঐ মিথ্যা সত্য বলে গ্রহণ করি—মুক্তের মায়াকাজল চোখে পরি।

ঐ যে ঘরের দেওয়ালগুলি…জানি ওগুলি সত্যিকারের ইঁটের নয়, জানালাগুলি কাচের নয়, যে তীব্র আলো ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে মঞ্চ সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা করছে—জানি ওটা করা হচ্ছে, প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে না। আসবাব পত্র বা অন্যান্য জিনিসপত্র হয়তো আসল ; না হলেও কিছু আসে যায় না। কেননা মিথ্যাকেই মেনে নিতে প্রস্তুত আমরা। তাছাড়া ঐ জিনিসগুলি কিছু নয়, পরিবেশই মুখ্য। ওগুলো রাখা হয়েছে যাতে নাটকের পাত্র পাত্রীরা কিছু একটা ধরতে পারে, কোনও কিছুর ওপর বসতে পারে। হয়তো এর চেয়েও বড় প্রয়োজন ওদের আছে—নাটকের চরিত্রগুলির আনন্দ, দুঃখ, ভয়, বিতৃষ্ণা বা বিরক্তির কারণও হতে পারে। তবু যেন ওরা আমাদের প্রতারিত না করে। তার কোনো সম্ভাবনাও নেই অবশ্য। কারণ দর্শকরা জানেন তাঁরা থিয়েটারে এসেছেন আর অভিনেতৃবৃন্দ অভিনয় করছেন। ব্রেশ্‌ট এসে একথা না শোনালেও চলবে, শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

দর্শকেরা বুঝেছেন 'Red Riding Hood' নাটকের মঞ্চে খাটের ওপর কোনোদিন জীবন্ত নেকড়ে শুয়ে থাকে নি। আমরা দর্শকেরা সব বুঝি—বুঝেও সর্বজ্ঞানী রাজনীতিকের মতো মিথ্যাটাকেই সত্য বলে ধরি...কেননা আমরা টিকিট কেটেছি রজ্জুতে সর্প দেখবার জন্যেই।

মঞ্চের সব জারিজুরি দর্শক ও প্রযোজককে একই মায়াজালে ঢাকতে। মনে হয় এই ভ্রম সৃষ্টির উপাদানগুলি যদি সুনির্বাচিত এবং তাদের উপস্থাপনা যদি সুপরিকল্পিত হয়—তবে দর্শক সবরকম কনভেনশন মেনে নেবেন।...গ্রীক থিয়েটারে মুখোশ ব্যবহার করা হ'ত—তার কারণ স্বল্পালোকে দূর থেকে মুখের চেয়ে মুখোশই মুখের মতো লাগতো। কিন্তু আজ আমরা যখন ছোট রঙ্গশালার পাদপ্রদীপের তীব্র আলোর সামনে মুখে মুখোশ আঁটি, তখন সেটাকে গ্রীক নাট্যকলা নিয়ে ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

* * * *

পাঠকের সন্দেহ হতে পারে, আমার বক্তব্য, সকল সৎ নাটকই বস্তুধর্মী নাটক। আসলে সন্দেহের নিরসন ঘটুক, আমার বক্তব্য ঠিক তাই। জীবনই সাহিত্যের নিরবয়ব উপাদান সরবরাহ করে। শিল্পস্রষ্টা এই উপাদানগুলিকে সুসমঞ্জস করেন, তাঁর দায়িত্ব তাকে অবয়বী করা। সৃষ্টি তাই সৌন্দর্যসাধন। আর—এই সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টা যখন সবাক হন, যখন কিছু বলেন, তাঁর দায়িত্ব তখন নৈতিক। এই সৃজন এবং কথন লেখকের কাছে অভিন্ন। বস্তুত নীতি ও নন্দন—উভয়েই এক। উভয়ই সত্য।

* * * *

শিক্ষা পেলে মানুষ নাকি অমানুষী, আচরণে পারঙ্গম হতে পারে। ইচ্ছে করলে মঞ্চের ওপর তাঁদের পুতুলের মতো নাচানো যায়। নিকোল ডেনিসের মতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে পুতুলেরা মানুষদের চেয়ে দক্ষ। কেননা তাদের আচরণে সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু মানুষের আবেগ মানুষের চেয়ে ভালভাবে কেউ কি প্রকাশ করতে পারে? দর্শকেরাও সৌভাগ্যক্রমে মানুষ—মানুষের আবেগে তারা সাড়া দিতে পারে—পুতুল নাচলে তা দেবে কি? বস্তুবাদ...

যার অর্থ মানুষকে দিয়ে মানুষেরই কাছে মানুষের জীবনের মানবিক উপস্থাপনা—থিয়েটারে তার সম্ভাবনা সন্দেহাতীত।

বলা বাহুল্য, লণ্ডনের সাম্প্রতিক নাটকগুলি বাস্তবধর্মী নয়। অধিকাংশই এনটারটেনমেণ্ট। এতে কিন্তু অবাক বা ভাত হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিল্পপ্রীতি খুব সহজ নয়। আর বেশির ভাগ মানুষের এ-প্রীতি নেইও। মানুষের মধ্যে যে অংশটুকু মানবিক—সেই অংশটুকুই শুধু জীবনধর্মী নাটকের প্রতি আসক্ত। তবে মানুষের মিথ্যাপ্রীতি কিছু কম নয়—আমরা নিজেরা মিথ্যে কথা বলি, অন্যে বলুক তাও চাই। কাজেই সত্য বাজার থেকে উধাও হবে, এ কিছু মাত্র আশ্চর্য নয়। তাই বলছি জাতীয় নাট্যশালাকে জাতীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগের আওতায় এনে ফেলা হোক। সত্য চিরকাল ওষুধের মতন—স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কিন্তু প্রায়শ অখাদ্য।

* * * *

মিষ্টার পিটার ব্রুকের নাটকে নাকি মানুষের আবেগ ইত্যাদিকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি নিটোল অমূর্ত ব্যবহার রূপ দেখানো হবে। মঞ্চের ওপর নির্জনতা, ক্লান্তি, বিষণ্ণতার সম্পূর্ণ স্বাধীন সদর্প বিচরণ শুরু হবে। মনে তো হয় না—এ ধরনের নাটক আদৌ লেখা যায়। মিষ্টার ব্রুক অবশ্য লেখার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নন, তিনি অভিনয়ের কথাই বলেছেন। পঞ্চাশ বছর আগে চিত্রকলায় যে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল—সেটা শুধু চিত্রকলা বা সঙ্গীতেই সম্ভব। ছবি বা গান অমূর্ত হতে পারে। কিন্তু নাটক পারে না। যেহেতু নাটক ভাষাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। মঞ্চের ওপর যে সব কথা বলা হবে, এটা অভিপ্রেত যে তাদের অর্থ দর্শকেরা বুঝতে পারবেন। এখন শব্দ থেকে অর্থ সরিয়ে নিলে, কিংবা নতুন নতুন শব্দ আবিষ্কার করলে—যা দাঁড়াবে তা' কিছু অর্থহীন আওয়াজ—ভাষা নয়। এমন বস্তু কি নাটক হবে? এ সেই আরবীতে লেখা নাটক, মঞ্চে দৃশ্যজাতীয় কোনও কিছু নেই, সাজ নেই, পোষাক নেই, আর নেই জিনিসপত্র—সামনে আছেন দর্শকেরা—কিন্তু হায় তাঁরা আরবী জানেন না—ব্যাপারটা সেই রকম হয়ে দাঁড়ালো না?

যে কথা আগে বললুম, বস্তুবাদী নাটকের কোন স্বভাববাদী প্রয়োগরীতির প্রয়োজন নেই—তারই প্রেক্ষিতে বলছি, একদল লোক স্বভাবধর্মী প্রযোজনায় নাটককে বস্তুমুখী করার চেষ্টায় রত। এঁরা মনে করেন এইভাবেই নাটক বেশী সত্য হয়ে উঠবে। এই মতবাদের স্বপক্ষে দু'টি অবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক: নাটকের মহলা চলার সময় যখন নাট্যকার তাঁর এতোবৎকাল কাগজের ওপর লেখা সংলাপগুলি অভিনেতৃদের মুখে শোনেন, তখন তাঁর হুঁশ হয়—অনেক লেখাই ভুল, অনেক সংলাপই অচল। অতএব নাট্যকার সংলাপ সংশোধন বা পুনর্লিখনে নিয়োজিত হন। তাছাড়া সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত কিছু কিছু গুণ বা দোষ থাকেই। মহলা দেখতে দেখতে নাট্যকারকে কলম চালিয়ে তাদের ঐ গুণ গুলির প্রকাশ আর দোষ ঢাকার ব্যবস্থা করতে হয়। নাট্যকার সকলের উপদেশ শুনে নাটককে আরো বাস্তব ঘেঁষা করেন। হায়, তিনি যে চিরকালের ম্যাগপাই। দুই: এমনও অভিনেতা আছেন, অভিনয়ের সময় যাকে নিজের জীবনের কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আবেগ জাগাতে হয়। অবশ্যই জীবনের ঘটনাগুলি নাটকের ঘটনার চেয়ে বেশী সত্য। কাজেই নাটক যতো তার অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হবে, তত সত্য হয়ে উঠবে। তা যদি হয়, তবে সমগ্র নাটকটাই তাঁর অভিজ্ঞতার ওপর রচিত হলে দোষ কি।...সবিনয়ে বলি, এ ধরনের মতবাদ অনেকটা সেই উপন্যাসের কাহিনী সত্য নয় বলে জীবনী গ্রন্থপাঠের মতো। নাটক বা উপন্যাস ...যেহেতু শিল্প...তাদের সত্য প্রতীকী—একজন অভিনেতা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ায় অভিনেয় চরিত্রটিকে নিজের বলে ভাবতে শিখতে পারেন, ইচ্ছে করলে সম-অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েও পড়তে পারেন, কিন্তু শিল্প তো অভিজ্ঞতার স্রেফ উদ্‌গীরণ নয়—বরং তার পরিপাক। তাছাড়া বাস্তব জীবনের হুবহু উপস্থাপনায়, জীবনের আচার ব্যবহার আদব কায়দার অপরিবর্তিত প্রদর্শনীতে দর্শক মঞ্চ সম্পর্কে সব কৌতূহল হারিয়ে বসবেন। সব কিছুই যদি পরিচিত মনে হয় তবে মঞ্চের রহস্যটুকু আর বজায় থাকে কি? দর্শক কিসে আর আকৃষ্ট হবে?

আমি স্বভাববাদী অভিনয়ের চিন্তা করছি না। একটি বলিষ্ঠ রচনা স্বাভাবিক অভিনয় রীতিতে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। স্বভাববাদ শেকস্‌পীয়রকে আহত করে নি। কথা হচ্ছে স্বভাববাদীরা মঞ্চের ওপরে উঠে শুধু সেইটুকু কথাই বলবেন, যেটুকু তাঁদের বলতে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যেন মনে রাখেন সব অভিনেতারই নাট্যকারের প্রতিভা বা সৃজনাশক্তি নেই।

'একসেপটিং দি ইলিউশন'
অনুসরণে

নাটক ও প্রকৃতি

মূল রচনা : পল গ্রীণ

অনুসরণে : অঞ্জলী লাহিড়ী

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তরদান প্রসঙ্গে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে আবহাওয়া তত্ত্বের একটা সহজ বিস্ময়ের কথা।

যদি কোনো নিদাঘ দিনে কখনও কোনো পল্লীপ্রান্তে গিয়ে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের বিবর্ণ নিষ্প্রাণ এক স্থিরচিত্রকে। দারুণ দাবদাহে বৃক্ষরাজির পত্রপল্লব ম্রিয়মান হ'য়ে ঝুলে আছে, ঘর-পোষা পশুপাখীরা অলস চৈতন্যে আচ্ছন্ন। যতেক গাভী আর মহিষের পাল বড় বড় বাড়ীর ছায়ায় শুয়ে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে দিয়েছে রুক্ষ প্রকৃতির বুকে। বিশুষ্ক ধরণী তার সন্তান কৃষককুলকে করে তুলেছে সব কিছুর প্রতিই অকারণে রূঢ় এবং নিস্পৃহ।

আর এ সমস্ত কিছুর প্রতিই উদাসীন আগুনের গোলার মত সূর্য ঋতু পরিক্রমণের স্বাভাবিক নিয়মে তখন নিঃসীম শূন্য তামাটে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে অবশেষে বাদামী রঙ-এর পাহাড়ের সারির পিছনে এক সময় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

গ্রীষ্মের এই জলন্ত মার্তণ্ডরূপ পশুপাখী, মানুষ, প্রকৃতি সব কিছুর কাছেই

প্রচণ্ড বিভীষিকার মতন। বিশ্বচরাচর তখন, আর কিছু নয়, শুধু এক বিন্দু বারি-বর্ষণের প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে অস্থির। কিন্তু দিনের পর দিন তবু কেটে যায় ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।

তারপর একদা প্রভাতে আকাশে বাতাসে ভিন্নতর আর এক অনুভূতি সচকিত করে দিয়ে থাকে আপনার মনকে। প্রাতরাশের পর পথে পথে পরিভ্রমণের কালে চারপাশের সর্বত্রই কি যেন একটা আসন্ন পরিবর্তনের আভাস অনুভব করতে পারবেন আপনি। হঠাৎই যেন মনে হবে, গাছে গাছে পত্রপুষ্পের দল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দেখতে পাবেন পিঞ্জরাশ্রিত হাঁস-মুরগীগুলি নতুন জীবনের উল্লাস নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কোটরে কোটরে পাখীরা অর্থহীন কলরব বন্ধ করে ডানা মেলে দিয়েছে আকাশের বুকে। গোচারণভূমিগুলিতে গবাদি পশুর দল চঞ্চল চরণে সবুজ ঘাসের সন্ধানে যেতেছে। চাষীরা তাদের সন্তান ও সাথীদের নিয়ে নবোৎসাহে নেমেছে ভূমি কর্ষণের কাজে। পথ দিয়ে যেতে যেতে আরও শুনবেন, এখানে সেখানে গ্রামীণ মানুষের দল জটলা বেঁধে একটি কথাই যেন বলাবলি করছে "বাতাসে আজ কিসের আভাস? বৃষ্টির বিন্দুর?"

আপনি তো সেখানে এক গ্রীষ্মাবকাশের আগন্তুক। তাই নেই প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততা। প্রচুর অবসর হাতে। সময় কাটবে প্রভাতী সংবাদপত্রগুলো পড়ে অথবা দু একটা সাময়িকীর পৃষ্ঠায় নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার ওপর চোখ বুলিয়ে। দুপুরের আহারাদির পর ঘরের সামনের ঝুল বারান্দায় বসে বিশ্রাম নেবেন কিছুক্ষণ। তখন রৌদ্রদগ্ধ শস্যক্ষেত্র পেরিয়ে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করবেন—কাব্য-কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের চোখে ধরা চিরকালের এক টুকরো কালো মেঘ। ছোট্ট আর অস্পষ্ট। ক্রমশঃ লক্ষ্য করবেন সেই এক টুকরো ছোট্ট মেঘই দেখতে দেখতে বিপুলায়তন হয়ে উঠবে। এক এক করে আরো অনেক খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ পাশাপাশি জমতে জমতে আকাশের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটিকেই আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তুঁতজাতের গাছগুলোর শিরশিরানির মধ্য থেকে একটা বিচিত্র রিণরিণ

শব্দ শুনতে পাবেন। অনুভব করতে পারবেন মাটির নীচের কোন এক অজানা কেন্দ্র থেকে অদ্ভুত একটা গুমগুম শব্দ মাঝে মাঝে প্রবল হ'য়ে উঠে জানলা দরজার পাল্লাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে আরও ঘন হয়ে উঠতে থাকে অন্ধকার। সেই হঠাৎ জাগা কালো মেঘের পুঞ্জ যোজন বিস্তৃত আকার ধারণ করে দিনের আলো গ্রাস করতে করতে ক্রমশঃ মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষী সূর্যকে সম্পূর্ণ আবৃত করে ফেলে। এল্‌ম্‌ গাছের পাতায় পাতায় ততক্ষণে থরথর কাঁপুনি জেগেছে। হাঁস মুরগীরা দ্রুত ফিরতে থাকে আস্তানায়। গলায় ঘণ্টা বাঁধা গরুর পাল ছুটে যায় গোয়ালের দিকে। সচকিত হয় পথচারী পথিক আর ঘরবাসী গৃহস্থ। গুরুগুরু গর্জন ঘন হয়ে ওঠে মেঘে মেঘে। পথ থেকে ছোট ছোট ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সরু গলিটার সামনে এসে পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যায়। আকাশে কালো মেঘের দলও অতি দ্রুত নেমে আসতে থাকে যেন ঠিক আপনার বাড়ীর ছাদের ওপর। বাতাস ক্ষেপে ওঠে। আপনিও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কতক্ষণে বৃষ্টি নামবে তারই প্রতীক্ষায়। তারপর এক সময় হঠাৎ বাতাস পড়ে যায়। স্তব্ধ হয় মেঘের গর্জন। ঘন ঘন বিদ্যুত ঝিলিক কোথায় যায় হারিয়ে। বিশ্ব চরাচর বুঝি রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুণতে থাকে সেই প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করার অসীম আগ্রহে।

তারপর বৃষ্টি নামে। ছাদের ওপর অজস্র পাথর কুচি ছড়ানোর মত বৃষ্টি পড়ার ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে মুখরিত হ'য়ে ওঠে চারদিক। অঙ্গন-প্রাঙ্গন, পথ ও প্রান্তরের বুক থেকে শীতের ভোরের পাতলা কুয়াশার মত ধোঁয়ার একটা অস্পষ্ট আস্তরণ ভেসে উঠতে দেখবেন। বৃষ্টি ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ধোঁয়ার আস্তরণটিও সরে যাবে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি এসে স্পর্শ করবে আপনার শরীর। আপনার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে আশ্চর্য একটা ভিজে অনুভূতি। আরাম কেদারাটি ভাঁজ করে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ঘরে এসে বসবেন আপনি। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখবেন নগ্ন প্রকৃতির ধারাস্নানের আনন্দ উচ্ছ্বাস। বৃষ্টির জল পথের ধুলোয় মিশে ধূসর-হলুদ বর্ণের সাপের মত এঁকেবেঁকে গড়িয়ে নেমে যাবে পথের পাশের নীচু

খাদগুলি দিয়ে। অনাবৃষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে সমস্ত জীব জগৎ যেন নতুন জীবনের স্পন্দনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

নাটকের সঙ্গে, শুধু নাটকই বা বলি কেন, সকল প্রকার শিল্পকর্মের সঙ্গেই আবহাওয়া তত্ত্বের এই সহজ বিষয়ের একটা সংযোগ রয়েছে। নাট্যসৃষ্টিও বিশেষ কোনো মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তাই 'নাটক কেন লিখি' এই প্রশ্নের একান্ত ব্যক্তিগত উত্তর যদি শুনতে চান তাহ'লে বলবো 'এর কোনও উত্তর আমার জানা নেই।' বৃষ্টি আসা, না-আসার মতই নাট্যসৃষ্টির জোয়ার আসবা'র সময় হ'লেই আসবে, না হ'লে সহস্র চেষ্টাতেও আসবে না। এর পেছনের কার্যকারণের সম্পর্কটি খুঁজতে যাওয়া বৃথা, এর নিহিতার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা নিরর্থক। তবে একান্তই যদি জোর করেন, তবে আরো বলতে পারি—নাটক লিখি, কারণ নাটক না লিখে পারি না তাই। যদি নিশ্চিত করে জানতাম যে, নাটকই হচ্ছে অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি তথা মানসিক শান্তি অর্জনের একমাত্র মাধ্যম, তাহ'লেও না হয় মঞ্চের অভিনেতাদের বলার জন্য কথার পর কথা সাজানোর এই নেশার স্বপক্ষে একটা যুক্তি খাড়া করা যেত।' কিন্তু না তাও সত্য নয়। আমার তো মনে হয়, নাটকের বিনিময়ে যদি কোনও কিছুই না পাওয়া যেত' তাহ'লেও আমি নাটকই লিখতাম। তবে এটা ঠিক নাটকের বিনিময়ে পাওয়ার প্রত্যাশাও আমার অপরিসীম।

কিন্তু এহ বাহ্য। যে প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন, তার তাৎপর্য অনেক গভীর। আবহাওয়া তত্ত্বের উপমা দিয়ে তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও আকস্মিক প্রবণতার ওপর। আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষই অল্পবিস্তর শিল্পী-চেতনা সমন্বিত।

আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন, সকল মানুষের মধ্যেই যদি শৈল্পিক চেতনা বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে কিছু মানুষ সুনিপুণ শিল্পী আর কিছু মানুষ ঘোরতর বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী হন কেমন করে। প্রশ্নটা যথার্থ বটে কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের জীবন গঠন ও কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের পেছনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেই জন্যেই

দেখা যায়, একই সঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হয়ে কোনো কোনো শিশু হ'য়ে ওঠে খ্যাতিমান কথাশিল্পী আর অপর জন হ'য়ে ওঠে গান রচয়িতা বা কারিগর বা অন্য কিছু। এখানে পরিবেশ ছাড়াও দ্বিতীয় শিশুটির দৈহিক ও মানসিক সংগঠন তার কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে, এটাই নিয়ম। এটাই স্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যেকের নেশা ও পেশার পেছনের কার্যকারণ সম্পর্কটিকে বিচার করলে এই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌছনো যাবে। এমন কি, আপনাকে নিজেকে দিয়েও এ সত্যের বিচার করে দেখতে পারেন। আজ আপনি একটি বিশিষ্ট নাট্য-পত্রিকার সম্পাদক হতে পারেন। কিন্তু একদিনেই নিশ্চয়ই আপনি এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। বহু ঘটনা সংঘাত ও বহুতর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে তবে আপনি শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে এসে পৌছতে পারবেন। তাই নয় কি?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন: এক বিশেষ ধরনের নাট্য রচনার প্রতি আমার আগ্রহ কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। ঐ বিশেষ ধরনের নাটক আমি লিখি। কারণ এ শ্রেণীর নাটকই আমি লিখতে পারি। আমার অধিকাংশ নাটককেই বলা চলে লোক-নাটক। জানি এর দ্বারা নাট্যের পরিধিকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করে ফেলছি। কিন্তু যেহেতু "লোক-সাধারণ"ই আমার কাছে সর্বাধিক আদরের এবং আমার একান্ত পরিচিতের পরিধির মধ্যে রয়েছে সেইহেতু এই 'লোক-সাধারণ'ই আমার কাছে একান্ত জীবন্ত ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আর এর বাইরের যারা, তারা আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়—কারণ তারা কেউই স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। অবশ্য একথা বলছি না, যে আদর্শ থেকে আমি আমার নাট্য রচনার প্রেরণা গ্রহণ করেছি সেই আদর্শের প্রতি আমি সম্পূর্ণ সুবিচার করতে পেরেছি। কিন্তু সেই আদর্শের আহ্বান একটা মূর্তিমান প্রতিপক্ষের মত আমার সামনে দাঁড়িয়েই রয়েছে। সেই আহ্বান দিন থেকে দিনে আরও সুস্পষ্ট, দুর্নিবার ও আবশ্যিক জীবন প্রত্যয়ের রূপ নিয়ে মূর্ত হ'য়ে উঠছে আমার চোখের সামনে। কারণ সেই আদর্শের প্রতিরূপ যে মানুষগুলিকে আমার রচনায় আমি সুস্পষ্ট

প্রকাশিত করে তুলতে প্রয়াস পাই তারা প্রকৃতির একান্ত আপনজন। কখনও বিক্ষুব্ধ কখনও শান্ত। কখনও ভয়ংকর কখনও বরাভয় প্রদায়িনী প্রকৃতির ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে তাদের যাবৎজীবন, সকল কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' এই সব অগণিত লোক সাধারণ মার্জিত জীবনচর্চায় অভ্যস্ত শহুরে মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব, সত্য ও জীবন্ত নয় কি?

শহুরে মানুষদের, তাদের যাবতীয় জ্ঞান চর্চা ও বিকাশের জন্য নির্ভর করতে হয় নিজস্ব রুচির বিশেষভাবে মার্জিত বিশিষ্ট কতকগুলি রীতি নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। স্বভাবতই সেখানে সীমাবদ্ধতা থাকে প্রচুর। অপর দিকে, আমার রচনায় যে প্রকৃত জনের কথা বলে থাকি তারা প্রকৃতিরাণীর একেবারে কোলের মানুষ। তাদের জীবনাচরণের প্রতিটি পর্যায়ের, তাদের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনদর্শন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই বহিঃপ্রকৃতির সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নিরন্তর পরিগ্রহণ করে থাকে তারা। প্রকৃতিই তাদের সকল জ্ঞানের উৎস, তাদের করদাত্রী স্নেহময়ী জননী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আবার এই প্রকৃতিই ভয়ংকরী হয়ে তাদের জীবনে যাবতীয় দুর্যোগ আর দুর্বিপাকও টেনে আনে।

লোকনাটক ও শহুরে নাটকের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যের সীমা টানা সহজ নয়। কারণ দুইয়েরই কারবার মানুষ নিয়ে। তবে এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্যটি বোঝাতে হলে বলতে হয়, এই দুটি জীবনের দুই প্রান্তরেখাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে।

এমন কথা আমি বলতে চাই না যে শহুরে নাটকের নিজস্ব জীবন-ভিত্তির মূলে মহত্ব কিছুই নেই। কিন্তু এও সত্য, লোকনাটকগুলি যেমন করে গভীরভাবে আমার চেতনার জগৎকে আলোকিত করতে পারে, উদ্দীপ্ত করতে পারে আমার সকল কর্ম প্রয়াসকে, অতি মার্জিত শৌখীন শহুরে নাটকগুলি তেমনটি কদাচ পারে না। অবশ্য লোকনাটক বলতে আমি সেই সব রচনাগুলির কথাই বলছি যার নিদর্শন রয়েছে গ্রীসিয় সাহিত্যে। যে ধরনের নাটক লিখেছেন শেক্সপীয়র, টলস্টয়, হাউপ্টম্যান প্রমুখেরা।

"লীয়র" নাটকটির কথাই ধরুন। স্মরণ করুন সেই নির্জন জঙ্গলের দৃশ্যটির কথা—যেখানে বৃদ্ধ রাজা লীয়র আর তাঁর চারপাশের রহস্যময়ী প্রকৃতি এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছেন। বৃদ্ধ রাজা আর তাঁর চারপাশের দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক শক্তির এই একাত্ম সংযোগের মধ্যে এমন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও সার্বজনীন সত্তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি আমি যা এক অভাবনীয় আনন্দের শিহরনে আমার অন্তর মনকে ভরিয়ে তোলে।

তাই বলছিলাম, যে মানুষগুলি রয়েছে মাটির কাছাকাছি, উন্মুক্ত প্রকৃতির রুদ্ররোষকে তুচ্ছ করে শির যাদের রয়েছে সদা উন্নত, কুন্ঠিত বসুন্ধরার গোপন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে সংগ্রাম বিক্ষত হাতে যারা সংগ্রহ করে জীবনধারণের সামগ্রী তাদের জীবনধারা বেঁচে থাকবে। যথার্থ অর্থে বেঁচে থাকার তাৎপর্যটিকে যত পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে আমার সামনে, শহুরে মানুষদের জীবন—যে জীবন গড়ে ওঠে কেবল আপোষ আর পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের স্বার্থের ভিত্তিতে—বেঁচে থাকার তাৎপর্যটিকে তেমন গভীর ও অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করতে পারেন কখনও। আর এই জীবনবোধই, যে জীবনবোধের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত রয়েছে এক অপ্রকাশ্য অথচ সতত বিরাজমান অস্তিত্বের চেতনা সেই অস্তিত্ব ভাল, মন্দ বা মাঝামাঝি যেমনই হোক না কেন প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষগুলির সমগ্র জীবনধারা, তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড তথা তাদের সার্বজনীন সত্তাকে সতত নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

যেসব নাট্যকার কেবলমাত্র সমাজের মাথাদের নিয়ে, রাজারাণী, মন্ত্রী সেনাপতিদের নিয়ে অথবা প্রাণহীন পুতুল শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে নাট্য-রচনায় অভ্যস্ত, তাঁরা যদি তাদের চিন্তাধারাকে মনুষ্যজীবনের বাহ্যিক আড়ম্বরের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রবেশ করতে পারেন মানুষের অন্তর্লোকে, আশা নিরাশা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দোলায় সতত দোলায়মান মানুষের সত্য অস্তিত্বটিকে উপলব্ধি করার আগ্রহ নিয়ে, তবেই তাঁরা যথার্থ অর্থে জীবন-শিল্পীর সংজ্ঞাটিকে সার্থক করতে পারবেন। তখনই তাঁদের প্রতিটি বাণী একটা মহৎ ভাবনার মত সকলের অন্তরের অন্তস্তলকে স্পর্শ করতে পারবে,

উদ্দীপ্ত করতে পারবে। তাঁদের রচনার মানুষগুলিকে তখন তাদের পরিবেশ-ভিত্তিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত শাশ্বত মানুষী সত্তায় স্ব প্রকাশিত দেখা যাবে। জানি এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ। দুরূহ, কারণ শেক্সপীয়র দুর্লভ। ঈশ্বরের চেয়েও দুর্লভ। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ যখন সম্ভব হবে তখন দেখা যাবে স্রষ্টা মানুষ আর সৃষ্ট মানুষ, বাইরের প্রকৃতি আর অন্তর প্রকৃতি সব মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। তাদের মধ্যেকার সকল কৃত্রিম বিভেদ বিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে আপন অস্তিত্বের সত্যে মানুষ মহীয়ান হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক জীবনের অভিশাপ, জীবন সংগ্রামের তাড়নায় নিরন্তর ত্রস্ত বিক্ষুব্ধ বিদ্বিষ্ট মানুষের হাহাকার— আমাদের চেতনার গভীরে অবস্থিত ঐ ঐশী সত্তাকে উপলব্ধির পথে কঠিন বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। আপনার হয়তো মনে হবে ঈশ্বর আর ঐশী সত্তার কথা নিয়ে আমি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছি। হয়তো কেন সত্যিই তাই। কিন্তু সকলেই কি মনেপ্রাণে এই একই আকাঙ্ক্ষার বশীভূত নয়? তা যদি না হবে, তবে সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে মানুষের দল শহুরে পরিবেশের দম বন্ধ করা আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একটু আলো, একটু হাওয়া, একটু খোলা মেলার মধ্যে যেখানে গাছে গাছে পাখীরা গান গায়, শান্ত স্তব্ধ বনানীর শীতল ছায়ার একটু স্পর্শে দেহ মন শান্তিতে তৃপ্তিতে ভরে যায়— পাগলের মত ছুটে যেতে চায় কেন সেখানেই?

এতক্ষণে সম্ভবত আপনি বুঝতে পারছেন আমার চিন্তাধারা কোন জীবন দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার এই চিন্তা এই সৌন্দর্যবিলাসী জীবন তত্ত্বকে যদি সমগ্রের জীবনধারার সঙ্গে মেলাতে পারতাম, তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম এই শাশ্বতিক জীবনপ্রবাহকে উপলব্ধি করার জন্যে প্রত্যেকের জীবনেই চাই প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বিশ্বসীমার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরবার মতন অবকাশ। কারণ, বাইরে জীবনের মধ্যে নিজেকে চিন্তায় ও কর্মে সম্পৃক্ত করতে পারলে তবেই আমরা বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে সমগ্র অন্তর মন দিয়ে অনুভব করতে পারবো, উপলব্ধি করতে পারবো সেই অনির্বচনীয় ঐশী সত্তাকে—যা আমাদের তমসো মা জ্যোতির্গময়ের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

আপনি হয়তো মনে করছেন যে, শহুরে জীবনভিত্তিক নাটকের চেয়ে 'লোকজীবনের নাটক' যে শ্রেয়তর সেই কথাটি প্রমাণ করার জন্যেই এত সব কথা বলে চলেছি। একথা মনে করলে কিন্তু ভুল করবেন। আমি আবার বলছি, কোন শ্রেণীর নাটক শ্রেয়তর সে বিষয়ে আলোচনার গণ্ডীকে আমি পেরিয়ে এসেছি। এখন আমার সামনে মানুষ আর তার পরিবেশগত অস্তিত্বের তত্ত্বটিই সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আজ হোক বা কালই হোক মানুষকে তার বদ্ধজীবনের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে বাইরের জীবনের মধ্যে মুক্তির সন্ধানে ছুটে আসতেই হবে। ঘিঞ্জি শহর, প্রাসাদঘেরা শহর, কৃত্রিম জীবনচর্চার যাবতীয় উপকরণে ভরপুর শহর—মানুষের জীবনে যত কিছু ক্ষুদ্ধতা, সংকীর্ণতা সীমাবদ্ধতার জন্ম দিচ্ছে। এই শহুরে জীবনের বীভৎস জীবনচর্চা মানুষকে মানুষ সম্বন্ধেই বীতস্পৃহ অনুদার নির্মম করে তুলছে। এই সর্বগ্রাসী আত্মিকবিনাশের হাত থেকে মানুষকে যে শক্তি রক্ষা করতে পারে তা তার মধ্যেকার সেই ঐশী চেতনা। আর এই চেতনাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে মানুষকে বেরিয়ে আসতেই হবে বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল জীবনের পটভূমিতে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার ভিত্তিতে নবতর পন্থায় গড়ে তুলতে হবে তার জীবনকে মানুষের ভবিষ্যত আর তার সভ্যতার গর্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনেই।

এবার আপনার তৃতীয় প্রশ্নে আসি। আপনি জানতে চেয়েছেন—আমার নাটক ও নাট্যের চরিত্রগুলিকে যখন পরিচালক, মঞ্চশিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রীরা ইচ্ছেমত ভাঙতে গড়তে থাকেন—তখন আমার কি মনে হয়? এর উত্তর খুবই সাধারণ—কখনও খুশী হই তাদের কাজ দেখে, কখনও বিরক্ত। কারণ এটা তো ঠিক, আমার কল্পনায় দেখা চরিত্রগুলি একান্তভাবে আমারই কল্পনার সৃষ্টি—অন্যের পক্ষে আমার কল্পনার হুবহু প্রতিফলন ঘটানো কখনই সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যখন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে মঞ্চের ওপর চলে ফিরে বেড়ায়, হাসে কাঁদে বা গান গায় তখন তাদের দেখে কখনও কখনও খুশী হই, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের কাণ্ড কারখানা দেখে ক্ষুব্ধ হই।

আপনার সর্বশেষ প্রশ্ন—রঙ্গমঞ্চ ও তার বাইরের সুখদুঃখ মেশানো সামাজিক জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত। মালীর সঙ্গে মালঞ্চের, যন্ত্রশিল্পীর সঙ্গে তার উপকরণের যে সম্বন্ধ নাট্যকারের সঙ্গেও রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধও অনেকটা সেই মত। আর রঙ্গমঞ্চের বাইরের যে জগতের সঙ্গে নাট্যকারের প্রত্যহের জীবন সংযুক্ত, সেই জগতের মানুষদের দুঃখসুখ, দুর্মতি-সুমতি, সংগ্রাম সাফল্যের বৃত্তান্তকে নাট্যের বৃত্তে সুচারুরূপে বিধৃত করাই নাট্যকারের প্রধান কাজ। নাট্যকার এখানে স্রষ্টা ও শিল্পী। চারপাশের স্থূল বস্তুজগতকে নিজস্ব শৈল্পিক অনুভূতিতে সঞ্জীবিত করে একটা সুসম শিল্প-সম্ভারে পরিণত করার ব্রতেই তাঁর সকল চিন্তা ও কর্ম নিয়োজিত থাকা উচিত। বস্তুজগত ও শৈল্পিক চেতনা এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাযুজ্য ঘটানোটাই একটা সত্যিকার সমস্যা। তবে এ সমস্যা যতই গভীর হোক না কেন, যতই রহস্যপূর্ণ ও জটিল হোক না কেন—ব্যবহার্য উপাদান সমূহের চরিত্র ও আচরণ, সমস্যাতেই সকল সমস্যার অবসান হ'তে পারে না। এর একটা সুষ্ঠু সমাধান কোথাও না কোথাও থাকেই। বিশ্বচরাচরেও এমনি কত জটিল সমস্যা, কত আপাতবিরোধিতা রয়েছে কিন্তু প্রকৃতি তো সেইখানেই থেমে নেই। ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে প্রকৃতিরাজ্যে নিত্যনিয়তই সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা একাত্ম সংযোগ, সকল বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে একটা ঐকান্তিক সামঞ্জস্য সাধনের ধারা সতত প্রবহমান। প্রকৃতিরাজ্যের এই নিয়ম শৃংখলাকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও কাজে লাগিয়ে আমরা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার, জ্ঞানের সঙ্গে অভীপ্সার শ্রেষ্ঠতম সাযুজ্য ঘটাতে পারি।

আর একটা কথা। আমার রচনাসমূহের মধ্যে কমেডির [প্রহসন ও অতিনাটকীয় শ্রেণীর রচনাগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত] কোনও স্থান নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে হবে, যেমন অদ্ভুত রসের নাটকগুলিকে বিচার করার জন্যে প্রয়োজন একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর। আমার বিবেচনায় কমেডি নাট্যের জগত একান্তভাবেই মানুষের নিজের জন্য তার নিজের হাতে গড়া জগৎ। প্রকৃতির রাজ্যে এমনতর খেয়াল খুশির

খেলায় মাতবার কোনও অবকাশ নেই। মানুষ যখনই ভুলে থাকতে চায় যে সে এক অমিত পরাক্রমশালী বিশ্ব নিয়মের অধীন, যখন সে তার নিজের আর তার একান্ত পরিচিত সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যকে স্থির লক্ষ্য করে নাট্যসৃষ্টির আগ্রহে মেতে ওঠে, তখনই জন্ম নেয় হাল্কা হাসির খোস খেয়ালের নাটক—যাকে বলে কমেডি। বস্তুতঃ কমেডি নাট্যের মূল কথাই হ'লো—কারো চিত্তবৃত্তিকে আহত না ক'রে মানুষের নিজের সৃষ্ট অর্থ সংগতি ও সামঞ্জস্যহীন যত বিচিত্র নীতি নিয়ম আচার আচরণগুলিকে নাট্যের সম্ভারে প্রতিফলিত করে জনমন রঞ্জন করা। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্যের কোন স্থান নেই। সময় সময় প্রকৃতি যতই লাস্যময়ী হোক না কেন, কারো মনোরঞ্জন করার নিছক দাসত্ব সে কখনই করবে না। তাই নয় কি ?

অদ্ভুত রসকে [যা কিনা খ্যাপামিরই নামান্তর] কোনও বিশেষ সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। শুধু এইটুকুই বলা যায়, হাস্যরসের সঙ্গে ভয়ানক রসের, অকিঞ্চিৎকর সামান্যের সঙ্গে নির্বিশেষ অসামান্যের সংমিশ্রণ ঘটানো যখন সম্ভব হয়, তখন তাকেই বলি অদ্ভুত রসাত্মক সৃষ্টি।

দেখলেন তো, আপনার কয়েকটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেমন সব বিরাট বিরাট জটিল তত্ত্বের জল ঘুলিয়ে তুললাম। আর যেহেতু আলোচনা করতে করতে ক্রমশঃ জড় দর্শনের জলাভূমিতে বেশী করে সেঁধিয়ে যাচ্ছি, সেইহেতু এইখানেই ক্ষান্ত দেওয়া উচিত বলে মনে হয়। সুতরাং এই বলেই শেষ করি—হ্যাঁ, সব কিছুর ঊর্ধ্বে নাটককে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নাটকই হ'তে হবে—তা সে বহির্জগতের বা অন্তপ্রকৃতির—যা-ই হোক না কেন।

'ড্রামা এ্যাণ্ড দি ওয়েদার'
অনুসরণে

ভিন্ন দৃষ্টিঃ অন্য বোধ

মূল রচনাঃ জন অসবোর্ণ

অনুসরণেঃ সুবন্ধু

গত পাঁচ বছর ধরে রঙ্গমঞ্চ ইংরেজদের জীবনযাত্রার উপর অস্বাভাবিক ভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে—যা চলচ্চিত্র বা উপন্যাসের পক্ষে সম্ভব হয় নি। টেলিভিশনে এর অবদান বিস্ময়কর। এবং এই রঙ্গমঞ্চ আরও অনেক কিছুর মধ্যে পুনর্জীবন সঞ্চার করেছে। সংবাদপত্র কিয়ংপরিমাণে এর কাছে ঋণী। এমন কি ভাষাও যত নগণ্য পরিমাণেই হোক না কেন, এর দ্বারা প্রভাবিত। আমরা এখন আর আগের মতন মার্কিনী প্রভাবে প্রভাবিত নই অথবা লণ্ডনের নির্দেশেও চালিত হই না এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চেরও বিশেষ কৃতিত্ব আছে। এই রঙ্গমঞ্চ ইংরেজদের জীবনযাত্রার একটি নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। এখন সেই ধরনের ছোটখাটো বিপ্লব চলচ্চিত্রেও ঘটছে।

উনিশ শ' ষাট সালে একটি বড় বিপদ হচ্ছে, একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। এই রঙ্গমঞ্চ জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গড়ে উঠবে এবং সেখানে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিভাবানেরা কোনো বিশেষ ভয়ঙ্কর যাদুঘর নির্মাণে সচেষ্ট হবেন। এটা আমার একটি নতুন Royal Acadamy প্রতিষ্ঠা করা

হচ্ছে বলে মনে হয়। ইংরেজ-জীবন সম্বন্ধে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে তিনিই অনুমান করতে পারবেন যে. অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই এর দায়িত্বে থাকবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এরকমই সব জায়গায় ঘটে থাকে। হয়তো আমি নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ছি কিন্তু আমার ধারণা আমি ঠিক কথাই বলছি। একটি মোমের যাদুঘর নির্মাণ করতে গিয়ে কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষমতা অপচয়িত হোক—এ দেখতে আমি ঘৃণা বোধ করি। হয়তো এই রঙ্গমঞ্চ কিছু কিছু অভিনেতাকে অভিনয় করবার সুযোগ এনে দেবে, হয়তো তাদের চাকরির নিরাপত্তা এনে দেবে, কিন্তু এই যৎসামান্য প্রাপ্তির সম্ভাবনায় আর একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কোনো সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি স্বীকার করছি যে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ আমার এবং অন্যান্য নাট্যকারদের কাছে উৎসাহের আধার বলে মনে হ'ত যদি একটি প্রকৃত স্বাধীন এবং অভিনব মঞ্চ সেখানে নির্মিত হ'ত। অবশ্য কাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে কে কে এতে অংশ গ্রহণ করতে চাইবেন, না-চাইবেন সে বিষয়টি কারোরই জানা নেই। উদাহরণ-স্বরূপ লণ্ডনে যে রঙ্গমঞ্চে যেতে আমি সব চেয়ে পছন্দ করি তা হচ্ছে Mermaid। কারণ একটি রঙ্গমঞ্চে যে যে বৈশিষ্ট্য আশা করা যায়, তা সবই এই মঞ্চটির আছে। এই মঞ্চটি আরামদায়ক। এর এমনই একটি আকর্ষণ আছে যে, যে কেউ অনুভব করতে পারবেন যে, তিনি এমন একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে এসেছেন; বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে যার যোগ খুব নিবিড়। কিন্তু আমি যে Mermaid-এ যাওয়া পছন্দ করি এবং সেখানে অভিনয় দেখা পছন্দ করি তার মানে এই নয় যে আমি সেই মঞ্চের জন্য নাটক লিখতে চাই।

উনিশ শ' ষাট সালে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চগুলির কাছে আমি কি প্রত্যাশা করি? প্রথমতঃ শিল্পীদের অভিনয় করার সুন্দর ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞ স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত নয়নাভিরাম রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু সব চেয়ে আমি খুশী হব যদি শিল্পীদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অবশ্য এটা এমনই ব্যাপার যা আইন করে করা চলে না। এমনই একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যেখানে শিল্পীরা আত্মোন্নতির একটা চাপ অনুভব করবে,

তারা প্রত্যেকবারই তাদের অভিনয়ের উৎকর্ষের দিকে নজর রাখবে এবং এই ভাবেই সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে। জীবন থেকে নাটকীয় উপাদান চলে গেছে মনে হয়। কিন্তু শিল্পীদেরও বিশ্রাম করার, উচ্ছল হবার, নিজেদের কাজে ডুবে যাবার অধিকার থাকা উচিত। একমাত্র চিত্রশিল্পীরাই সে অধিকার ভোগ করে থাকেন। আমার মনে হয় যে, আমাদের সকলের সেই ধরনের শিল্পীর স্বাধীনতা থাকা দরকার—অসবোর্ণ তাঁর নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রবন্ধে নিজস্ব কিছু. বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে গ্রন্থিত করতে এ-সব কথা বলেন। আপাতঃ পাঠে একে অস্থির মনে হ'লেও, প্রবন্ধে তাঁর ভিন্নতর শিল্পসত্তাটি মূর্ত হতে পেরেছে। অসবোর্ণ তাঁর চিন্তাকে সুদূর প্রসারিত করে রাখেন। নাট্য-ক্ষেত্রের সকল দিকে তাঁর লক্ষ্য, বলা বাহুল্য অভিজ্ঞতাও প্রচুর। নিজের সম্বন্ধে তিনি যেমন ভাবেন তেমনি আজকের নাটক ও তার গতি—এবং এর ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করে অভিনেতা এবং নাট্যশালা সম্পর্কিত সামগ্রিক চিন্তার প্রতিফলন তাঁর মনে রয়েছে। আর রয়েছে বলেই তিনি নির্দ্বিধায় বলেন: শিল্পীদের এমন কিছুটা সময় থাকা উচিত যখন তাদের দর্শক বা সমালোচক কিংবা অন্য কাউকে খুশী করবার জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে না। নিজের জন্য ছাড়াও আরও কিছু লোকের জন্য লেখা সম্ভব - আবার নিজের জন্য ছাড়াও প্রত্যেকের জন্য সম্ভব। কিন্তু একজন নাট্যকার হিসেবে এটা দেখা আমার কর্তব্য নয় যে, আমি সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে পৌছুতে পারছি কিনা —আবার মুষ্টিমেয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের দ্বার উন্মুক্ত রাখাও আমার কর্তব্য নয়। রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা নানা কারণের উপর নির্ভর করে। রঙ্গমঞ্চের নতুন অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে কিনা, সেখানে ভালো রেস্তোরাঁ আছে কিনা, জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখা হয় কিনা ইত্যাদি। যদি অন্য লোকের চিন্তা বা কথা অনুযায়ী কাজ করতে হয়, তাহ'লে তা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত একজন শিল্পী তার কর্তব্য পালনের পর যে তৃপ্তি পায় তা হচ্ছে এই যে, সে নিজেকে কতখানি তৃপ্তি দিতে পারছে।

নবপ্রতিষ্ঠিত মঞ্চের আকৃতি নিয়ে অসবোর্ণ খুব বেশি উৎসাহিত নন।

কোনো কোনো নাটকের অভিনয় areha-মঞ্চে উৎকৃষ্ট হয়, কোনো কোনোটির হয় না। এ-প্রসঙ্গে অসবোর্ণ বলেছেন: areha-মঞ্চে The Iceman cometh নাটকের সুন্দর অভিনয় দেখেছিলাম। কিন্তু Les negres নাটকের অভিনয় তেমন জমে নি। আমি নিজে এ ধরনের মঞ্চোপযোগী নাটক লিখতে কখনও উৎসাহিত হই নি। যে কোনো কারণেই হোক, আমি এ ধরনের মঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হই না—আবার মুক্ত অঙ্গন সম্বন্ধেও আমার খুব উৎসাহ নেই। আমার নাটকগুলিতে আমি দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে একটা দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই—অবশ্য এই দূরত্ব আমি কোনো কোনো সময় ঘুরিয়েও দিতে চাই এবং ছকে বাঁধা রঙ্গমঞ্চেই আমি তা করতে পারি। যদিও একথা সত্য যে The entertainer নাটকে এর সুযোগ কম ছিল। কিন্তু একজন নাট্যকার বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ ব্যবহার না করেই দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে এই দূরত্বের বাধাকে ভাঙতে পারবেন। যদিও Look Back in Anger একটি পুরনো ধরনের নাটক কিন্তু আমার মনে হয়, আমি এ নাটকে ভাষা ব্যবহারের এই বাধা ভাঙতে পেরেছি—হ্যারল্ড পিণ্টারও এখন তাই করছেন। Royal court-এর ভবনটি সংকীর্ণ এবং অনুপযোগী। এই রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটকের অভিনয় অসার্থক হতে বাধ্য। বিশেষ করে যে নাটকগুলি বৃহৎ পটভূমিকায় রচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে The Entertainer নাটকটি Palace মঞ্চে অনেক বেশি সার্থকতা অর্জন করেছিল এবং Palace রঙ্গমঞ্চটি আয়তনেও বৃহৎ। যখনই কোনো নাট্যকার কোনো বিশেষ রঙ্গমঞ্চের জন্য লেখেন তখনই তিনি অন্ততঃ প্রাথমিক ভাবে একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু কোনো নাট্যকারের কোনো বিশেষ রঙ্গমঞ্চের দিকে নজর রেখে নাটক লেখা উচিত নয়। 'অমুক থিয়েটারে এ নাটক করা চলবে না'—এ ধরনের চিন্তা কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আসলে নাট্যকারের নিজের ইচ্ছামত নাটক লিখে যাওয়া উচিত। যাঁরা সেই পুরনো ডোবার জলেই অবগাহনের আনন্দে বিভোর—অর্থাৎ নাটক লিখবার সময় কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠিত মঞ্চ বা কল্পিত মঞ্চের কল্পনা করে নাট্যকাহিনী সাজাতে অভ্যস্ত অসবোর্ণ সম্ভবতঃ সহজে তাঁদের ক্ষমা

করতে পারেন না। তাঁর মতে নাটক সাহিত্য। এবং আগে নাটক রচিত হবার পর, তা কি ধরনের মঞ্চে অভিনীত হবে সে চিন্তা নাট্যকারের বদলে প্রযোজক পারচালকই করুক। অতএব আপন বোধে বিশ্বাসী অসবোর্ন বলেছেন: আমি যখন নাটক লিখি তখন কোনো বিশেষ রঙ্গমঞ্চ আমার চোখের সামনে রাখি না। যদি আমি কিছু ভাবিই তাহ'লে এমন কোনো রঙ্গমঞ্চের কথা কল্পনা করি বাস্তবে যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই—যে রঙ্গমঞ্চে Royal court-এর অন্তরঙ্গতা এবং সার্কাসের জাঁক-জমক উভয়ই আছে। আমি সার্কাসের জন্য কিছু লিখতে পারলে খুশী হতাম। তাহ'লে বেশ বিশাল পটভূমিকায় নাটক লেখা যেত—যেখানে জীবন এবং মানুষের বিরাটত্বকেও দেখানো সম্ভব হ'ত। টেলিভিশনের সব চেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, এখানে জীবনের স্বাভাবিকতাকে খর্ব করা হয়। একমাত্র রঙ্গমঞ্চই জীবনকে বিশাল পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখাতে পারে।

টেলিভিশনের জন্য আমি যে কারণে লিখতে উৎসাহিত হই নি, এটি তার একটি কারণ। আর্থিক দিক দিয়েও এতে বিশেষ লাভ হয় না—অন্ততঃ যে পরিশ্রম করতে হয় তার অনুপাতে কিছুই নয়। এবং যাঁরা এর উপরওয়ালা বা কর্তাব্যক্তি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিরুত্তাপ, প্রতিভাহীন এবং গোঁড়া। তাঁরা টেলিভিশনের যান্ত্রিক কলা-কৌশলকে ঘিরে এক অকারণ রহস্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন—কিন্তু আসলে তা অত্যন্ত সহজবোধ্য। কে কোন সৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন বা কল্পনাশক্তির অধিকারী লোকেই তা চিনে নিতে পারেন এবং প্রয়োজনমতো উপেক্ষাও করতে পারেন। কিন্তু চলচ্চিত্র দেখে আমি আনন্দ পাই। যে কোনো ধরনের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ আমাকে সর্বদাই টানে এবং সেই কারণেই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আমার মনে এক মোহ সৃষ্টি হয়। ভাবি যে, আমিও হয়তো এতে সার্থকতা অর্জন করতে পারি। এবং আমার এ মোহ প্রেরণাদায়ক বলেই মনে হয়। কিন্তু একথাও সত্যি যে, নাট্যকার হিসেবে রঙ্গমঞ্চই আমার কাছে প্রথম স্থান পায়। আর অভিনেতা হিসেবে? আমি চিরকালই অভিনয় করতে ভালোবাসি এবং যদি আমাকে একটি ভালো পার্ট দেওয়া হয় তাহ'লে হয়তো আমি অভিনয়

করতেও উৎসাহিত হব। কিন্তু সত্যি সত্যিই আমি কোনোদিন অভিনেতা হব—এ-কথা ক্ষণিকের জন্যেও ভাবি নি। এখন আমার পক্ষে তা করার অর্থ হবে নিজের খেয়ালকে প্রশ্রয় দেওয়া। অবশ্য যখনই আমি কোনো নাটক লিখি তখনই এর প্রত্যেকটি চরিত্রের ভূমিকায় আমি নিখুঁত ভাবে অভিনয় করে যেতে পারি।

আমি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং আরও নানা বিষয় অবলম্বনে নাটক লিখতে চাই। কারণ নাটকই এই সব বিষয়ের বাহন হ'তে পারে। ঐতিহাসিক কাহিনী আমার নিকট অতীতের বস্তু বলে মনে হয়। আমার মনে হয়, কেউ যদি লুথার সম্বন্ধে কিছু নাও জানে, তাহ'লেও তার কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ আমার ধারণা অনেকেই তা জানে না। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ঘটনাবহুল। ঐতিহাসিক নাটক লিখতে হ'লে শেক্সপীয়র অথবা অন্য যে কোনো নাট্যকারের পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখতে পারা যায়। আমি আমার পরবর্তী নাটক লিখতে শুরু করেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে এখনই কিছু বলতে রাজী না। আমি পুর্বে কি করেছি এবং এখন কি করছি সে সম্বন্ধেও আমি নাইবা বললাম। বিশেষ করে, যা এখনও সুদূর পরাহত তার সম্বন্ধে ত নয়ই। আমি এখন Look back in Anger-এর একটি কপিও হাতে নিতে সাহস পাই না। এ নাটকটি আমাকে খুব বিব্রত করে।

কথাগুলো দুঃসাহসী এবং স্বতন্ত্র ভাবনার দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল। অসবোর্ণের নিজের যে বোধের জগৎ, সে জগতে আমাদের কেউ কেউ পা দিক— নিজের ভাবনা, তা যতই রূঢ় হোক, সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলার মতন মনের জোর আমাদের নাট্যকারদের মধ্যে আসুক এটা আমরা দেখতে চাই, চাইবও।

'দ্যাট অ-কুল মিউজিয়াম'

অনুসরণে

অভিনয় এবং অভিনেতা

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

অভিনয়ের প্রথম পাঠ, সত্যের সন্ধানে অভিনেতা, একই মুখে নানা রূপ, অভিনয়ের প্রকৃতি বিচার, অভিনয়ে বর্ণীয় সুষমা, অভিনয় ও অনুভব, অভিনয় ও অভিজ্ঞতা, চরিত্রসৃষ্টির শর্তাবলী ও মূকাভিনয় কলা।

ওপরে : 'ওথেলো' রূপী পল রোবসন।

ডানপাশে : 'ফগ' নাটকের একটি চরম মুহূর্তে দু'জন পূর্ব জার্মান শিল্পী।

ওপরে : মায়ারহোল্ড তাঁর 'দি ফাইনাল
ফ্লিক্ট' নাটকের মহড়া দিচ্ছেন।

ডানপাশে : স্ট্রীনবার্গের 'দি ক্রেডিটরস'
র একটি মুহূর্তে মাইকেল গগ্

অভিনয়ের প্রথম পাঠ

মূল রচনা : ডায়ো বোসিকা

অনুসরণে : ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়

অনেকে মনে করেন অভিনয়বিদ্যা স্বভাবজ প্রতিভা, তাই কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই প্রতিভার অধিকারী হওয়া অসম্ভব। ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এমন কথা বলা যায় না। কেননা সৃষ্টি ক্ষমতার উৎস বিশ্লেষণের অতীত। হাজারো শিক্ষা এবং অনুশীলন সত্ত্বেও যেমন সহজাত প্রতিভার অধিকারী না হ'লে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তেমনি সার্থক অভিনেতা হওয়াও সম্ভব নয়। অভিনয়কলাও বলাবাহুল্য একটি বিশেষ ধরনের শিল্প।

শিক্ষা-প্রসঙ্গ

তবু অভিনয়কলা-বিদ্যা আয়ত্ত করতে গেলে যে শিক্ষা এবং অনুশীলন একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এমন কথা যদি ভেবে নেওয়া যায়, তাহ'লে ভুল

হবে। প্রত্যেক শিল্পেরই একটা নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতি আছে, একটি অনুশীলন বিধি আছে, যার অনুসৃতি শিল্পসৃষ্টির শক্তিকে পরিমার্জিত করে। জগতে যাঁরাই প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই শিল্পসাধনার ব্যক্তিগত ইতিহাস হ'ল সুকঠোর সাধনা এবং অনুশীলনের ইতিহাস।

অভিনয়কলাও এর ব্যতিক্রম নয়। আর নয় বলেই স্বনামধন্য সার্থক অভিনেতা, প্রযোজক এবং নাট্যকার'রা তাঁদের ছাত্র, অথবা সহ অভিনেতাদের অভিনয়বিদ্যা শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যে সব দেশ অভিনয় কলার প্রাগ্রসরতাকে জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে মেনে নিয়েছে, সেখানেই হয় ব্যক্তিগত অথবা সরকারী উদ্যোগে অভিনয় শিক্ষার আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে বছরের পর বছর ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয় প্রযোজনা এবং পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রীতি পদ্ধতির অনুশীলন করে অভিনয়কলা সম্পর্কে নিজেদের পারদর্শী করে তোলার সুযোগ পায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, অভিনয়-প্রতিভা সহজাত শক্তি হলেও উপযুক্ত শিক্ষা এবং অনুশীলনের দ্বারা তার পরিশীলনের প্রয়োজন আছে। কেননা, অভিনয় করা মানে কেবলমাত্র নাটকের সংলাপ মুখস্থ বলে যাওয়া নয়। তার মধ্যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আছে। সমস্ত দেহ মন দিয়ে অভিনেয়-চরিত্রটির সঙ্গে অভিনেতার একাত্মবোধ সৃষ্টি করা, এবং সেই উপলব্ধ বোধকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিব্যক্ত করার শক্তি অর্জন করাই হ'ল সেই ধ্যানের লক্ষ্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অভিনয় শিক্ষা কেমন করে সম্ভব? অর্থাৎ একজন অভিনেতা কোন কোন বিষয়ে এবং কি কি ভাবে অনুশীলন করলে তাঁর সহজাত অভিনয় ক্ষমতাকে সার্থকভাবে অভিব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন। এর উত্তরে আসে উপাদানের কথা। প্রত্যেক শিল্পেরই কতকগুলো উপাদান আছে। যেমন কাব্যের আছে—ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ। চিত্রের আছে রঙ, তুলি। এবং সার্থক কবি অথবা চিত্রকরকে প্রথমেই এই সব উপাদানগুলির স্বরূপ

সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। ঠিক তেমনি অভিনয়ের উপাদান হল অভিনেতার দেহ। নাটকের চরিত্র একজন অভিনেতাকে নিজের দেহের সাহায্যেই ফুটিয়ে তুলতে হয়; তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তিই তাঁর একমাত্র সম্পদ।

সুতরাং আমরা এককথায় বলতে পারি স্বর-সাধনা, স্বর-নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু উচ্চারণ ও অঙ্গ সঞ্চালনবিধি এবং ভাবের অভিব্যক্তি, হ'ল অভিনয় শিক্ষার উপাদান। যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই উপাদানগুলি একজন অভিনেতাকে আয়ত্ব করতে হয়। এটাই অভিনয় শিক্ষা। এইগুলি যথাযথ ভাবে আয়ত্ব করার ওপরেই অভিনেতার সহজাত অভিনয়-প্রতিভা সার্থকভাবে বিকশিত হওয়া অথবা না হওয়া নির্ভর করে।

এবার উল্লিখিত উপাদানগুলির অনুশীলন-প্রণালীর কথায় আসা যাক। এই প্রণালীগুলিই হ'ল অভিনয়কলা-বিদ্যা আয়ত্ব করার নিয়ম কানুন। এই-গুলিই একজন নবীন অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষণীয়।

১। কণ্ঠস্বর

এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রথমেই আসে কণ্ঠস্বরের কথা। নাটকের সংলাপ হ'ল নাটকের প্রাণ। সুতরাং সমবেত সহৃদয় সামাজিকবর্গকে সেই সংলাপ যথাযথভাবে শোনানোই হ'ল অভিনেতার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং নবীন অভিনেতার পক্ষে অভিনয়-শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বর-সাধনার খুঁটিনাটি তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই স্বর-সাধনাকে, মোটামুটি ভাবে সুষ্ঠু উচ্চারণ এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, এই দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক.

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে সংলাপ আবৃত্তি করলেই যে দর্শকের শ্রুতিগোচর হবে তা নয়। বরং এতে বিপরীত ফলই

ফলতে পারে। অর্থাৎ জোরে কথা বলতে গিয়ে সংলাপের অন্তর্নিহিত রস ব্যঞ্জনা সহৃদয় সামাজিকের হৃদয় সংবেদ্য না হয়ে সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটা একটা হৈ হট্টগোলে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। রসাস্বাদের পরিবর্তে রসাভাসই তখন চরমে উঠবে।

নাট্য সংলাপকে সমবেত দর্শকজনের শ্রুতিগোচর করে তোলার গোপন তত্ত্বটা হ'ল সংলাপের সুষ্ঠু উচ্চারণবিধি। শব্দের মধ্যে প্রতিটি স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ শব্দটিকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত শব্দের অর্থ দর্শকের শ্রুতিসীমার মধ্যে পৌঁছায়; উচ্চৈস্বরে উচ্চারিত শব্দ নয়। সেইজন্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকৃতি সম্পর্কে অভিনেতার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। স্বরবর্ণগুলি ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অর্থদ্যোতনায় সাহায্যকারী। জোরের সঙ্গে যখন কিছু বলার প্রয়োজন হয় তখন আমরা ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর উচ্চারণে জোর দিই; কিন্তু যখন আমরা expressive হতে চাই, তখন স্বরবর্ণগুলিই আমাদের সাহায্য করে।

খ.

এরপর আসে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কথা। নতুন অভিনেতা মঞ্চে উঠে স্বভাবতই ভয় পেয়ে যান। আর তার ফলে তাঁর অভিনীতব্য চরিত্রের সংলাপগুলো কোনোরকমে তাড়াহুড়ো করে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে মঞ্চ থেকে পালিয়ে আসতে পারলেই যেন তিনি বাঁচেন। বলা বাহুল্য অভিনয় করতে গিয়ে এই তাড়াহুড়ো করাটা কোনো কাজের কথা নয়। এর ফলে সংলাপের ঈপ্সিত অর্থ তালগোল পাকিয়ে এক জগাখিচুড়ীর অবস্থার সৃষ্টি করে, এবং অভিনেতাও দম ফুরিয়ে হাঁপিয়ে উঠে কেলেঙ্কারীর একশেষ করেন। এই দম ফুরিয়ে যাওয়ার সমস্যাটা নবীন অভিনেতাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা সংলাপের যথার্থ উচ্চারণ-কৌশল তাঁদের অজ্ঞাত; আর তার ফলে তাড়াহুড়ো করে সব কথা বলতে গিয়ে তাঁরা শব্দের ভুল জায়গায় ভুল শ্বাসাঘাত দিয়ে ফেলেন। যার পরিণতি হিসেবে সংলাপের প্রথম অংশটা বেশ জোরের সঙ্গে আরম্ভ করলেও শেষ দিকটার খেই হারিয়ে ফেলেন; এবং সেই কারণে বড় সংলাপের শেষ অংশটা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থেকে যায়।

সংলাপ উচ্চারণের এই দোষত্রুটিগুলো কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হ'ল শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা। দম ধরে রেখে সংলাপ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠিকমত ছাড়তে পারলে সংলাপ তাড়াহুড়ো করে তালগোল পাকিয়ে ফেলার যেমন কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি তা সহজেই দর্শক সমাজের শ্রুতি-গোচরও হয়ে ওঠে। মঞ্চে উঠে দম ধরে রেখে ধীরে সুস্থে, শব্দের যথাস্থানে যথাযথ শ্বাসাঘাত দিয়ে, সংলাপ উচ্চারণের শিক্ষাটাই তাই নবীন অভিনেতার প্রাথমিক কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি বর্ণের যেমন র, রেফ, র-ফলা, ইত্যাদি উচ্চারণ সম্পর্কে অভিনেতার বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার। চলতি জীবনে এই র, রেফ, র-ফলা ইত্যাদির উচ্চারণে আমাদের একটা অসতর্ক অবহেলা আছে। 'প্রেম' কে 'পেম', 'ঘর'কে 'ঘড়' 'সতর্ক'কে 'সতক্ক' আমরা হামেশাই উচ্চারণ করে থাকি। এবং সেই আমরাই যখন যথেষ্ট অনুশীলন না করেই মঞ্চে অভিনয় করতে উঠি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উচ্চারণের এই দোষগুলি থেকে যায়। উপযুক্ত শিক্ষাছাড়া এই দোষ কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। সুতরাং স্বর সাধনা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নবীন অভিনেতাকে বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কেও যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন শিক্ষা করতে হবে।

গ.

উচ্চারণের ত্রুটি এবং স্বরযন্ত্রের দুর্বলতা অভিনেতা হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। চলতি জীবনে শব্দের উচ্চারণের ত্রুটিবিচ্যুতি যেমন আমাদের অনেকের আছে, তেমনি স্বরযন্ত্রের দুর্বলতাও আমাদের অনেকের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। আমরা অনেকেই জোরে কথা বলতে পারি না, চেঁচিয়ে কথা বলতে গেলে হয় আমাদের গলা চিরে যায়, অথবা গলা দিয়ে নানান রকমের আওয়াজ বেরিয়ে স্বর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অনেক সময়ে জোরে কথা বলতে চাইলেও আমরা জোরে কথা বলতে পারি না। আমাদের কণ্ঠস্বর স্বরগ্রামের বিভিন্ন পর্দায় ওঠা নামা না করে একটা একটানা একঘেয়েমীর সৃষ্টি করে। চলতি জীবনে এই ব্যাপারটা মানা গেলেও অভিনয়কালীন এই ত্রুটি কখনই মেনে নেওয়া যায় না। তবে সুখের কথা এই যে এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি অসংশোধনীয়

নয়। তাই এই ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি যে অভিনেতার আছে—তাঁর নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। দৈনন্দিন জীবনের এই সব অসতর্ক অবহেলাকে একটু সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেই এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি নজরে পড়বে, এবং তখন সেগুলি শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করার রীতিটি এবং স্বর সাধনার প্রক্রিয়াটি নিষ্ঠা সহকারে পালন করলেই এই বাধা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া যাবে।

২। অঙ্গ-সঞ্চালন

এরপর হ'ল অঙ্গ-সঞ্চালনবিধি আয়ত্বের কৌশল শিক্ষার কথা। মঞ্চে অভিনয় করতে উঠলে নবীন অভিনেতার হাঁটা চলা, ইত্যাদিতে কেমন যেন একটা আড়ষ্টতার ভাব এসে যায়। যাঁরা নতুন অভিনেতা তাঁরা মঞ্চে কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেন না। এই মনস্তাত্বিক অস্বাচ্ছন্দ্যতার ফলে চরিত্রচিত্রণ নির্জীব, নিষ্প্রাণ বলে অনুভূত হয়। দর্শকমনে সেই অভিনয় কিছুতেই স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না। মঞ্চাভিনয়ে এই অঙ্গ-সঞ্চালন নবীন অভিনেতার কাছে যেমন দায়িত্বের, তেমনি সমস্যার ব্যাপারও বটে। সুতরাং যথার্থ অঙ্গ-সঞ্চালন রীতিও অভিনয় শিক্ষার একটি অন্যতম অঙ্গ।

ক.

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে অভিনয়ের সময়ে অভিনেতার কোন হাভ-ভাব অর্থাৎ gesture অস্পষ্ট কিম্বা আড়ষ্ট হ'লে চলবে না। সংলাপ বলার সময় তিনি যে ভাবেই হাত-পা নাড়ুন না কেন, তা যেন স্পষ্ট এবং অর্থদ্যোতক হয়। অর্থাৎ অভিনয়কালে অভিনেতার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর যেন একটি যৌক্তিকতা অর্থাৎ justification থাকে। এই justification না থাকলে অভিনেতার হাত-পা নাড়া দর্শকজনের কাছে অনর্থক বলে মনে হবে। তাই অভিনয়কালে একজন অভিনেতার অঙ্গসঞ্চালন অর্থাৎ gesture খুব স্পষ্ট

এবং প্রত্যয়শীল হওয়া প্রয়োজনীয়। মনে করা যাক, যখন পার্শ্ববর্তী কোন সহ-অভিনেতার সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে তখন যদি কোনো অভিনেতা নিজের আড়ষ্টতা বশতঃ (যেটা সাধারণতঃ মঞ্চভীতি থেকেই অভিনেতার মনে সঞ্চারিত হয়) তার দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র চোখ ঘুরিয়ে কথা বলেন, তাহ'লে দূরবর্তী দর্শকের পক্ষে অভিনেতা কার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন, তা বোঝা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে অভিনেতার ওই বিশেষ অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়াবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয়। তাই যখন পার্শ্ববর্তী অভিনেতার সঙ্গে কথা বলতে হবে তখন তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে পরিপুর্ণভাবেই তাকাতে হবে। ঠিক তেমনি যদি কাউকে অর্থাৎ অন্য কোনো সহ অভিনেতাকে আঙুল দিয়ে কিছু ইশারা করতে হয় তাহ'লে তার দিকে পরিপুর্ণভাবে আঙুল তুলেই ইশারা করতে হবে। তা না করে যদি কোন অভিনেতা তার দিকে একটুখানি আঙুলের ইশারা করেই আঙুল নামিয়ে নেন অর্থাৎ তাঁর অঙ্গুলিসঞ্চালনের স্থায়িত্ব যদি নিতান্ত অল্প হয় অথবা অস্পষ্ট হয়, তাহ'লে তিনি ইশারার দ্বারা যে ভাব ব্যঞ্জিত করতে চাইছিলেন তা যথাযথভাবে পরিস্ফুট হবে না।

অবশ্য একথা সত্যি যে. একজন অভিনেতার gesture ঠিক কেমন হবে, তার কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। সার্থক অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীরা বাঁধা-ধরা নিয়মকে ডিঙিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমত gesture-এরই ব্যবহার করেন। তবু সাধারণ নিয়ম হ'ল এই যে সংলাপকে অর্থমণ্ডিত করে তাকে দর্শক-সাধারণের হৃদয় সংবেদ্য করে তোলাই যখন gesture এর কাজ, তখন সংলাপের একটু আগে থেকেই gesture-এর ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ আমরা যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে যাই তখন আগে আকাশের দিকে হাত তুলি, তারপর বক্তব্যটি উচ্চারণ করি। আগে সংলাপ বলে তারপর আকাশের দিকে হাত তুলি না। ঠিক তেমনি কোনো কিছু ভাবনার অভিব্যক্তি হিসাবে আগে চিবুকে অথবা কপালে হাত রেখে তার পরেই সংলাপ শুরু করি। তা না করে যদি আগে ভাবনার কথাটা বলে তারপর চিবুকে কিম্বা কপালে হাত রাখি, তাহ'লে আমাদের মনের ভাবনা দর্শকের-মনে হারিয়ে গিয়ে হাস্যরোল ওঠবারই প্রভূত সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এরপর আসে যৌক্তিকতার কথা। আমরা আগেই বলেছি যে মঞ্চ অভিনয়ের সময়ে অভিনেতার প্রতিটি gesture-এর যৌক্তিকতা অর্থাৎ justification থাকা প্রয়োজন। অনুনয়ের সময়ে স্বভাবতই যুক্তহস্ত করার রীতি; তেমনি ইশারার সময় হাতছানি দেওয়া। এগুলি যুক্তিসঙ্গত তাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি অভিনয়কালে আমরা ঠিক এর উল্টোটি করে বসি, তাহ'লে দেখা যাবে ঈপ্সিত ফল লাভের পরিবর্তে আমরা দর্শকজনের কাছে প্রহসনের বিষয়বস্তু হ' উঠেছি। কেননা ওই বিপরীত অভিব্যক্তি অযৌক্তিক, তাই অস্বাভাবিকও বটে। gesture-এর ব্যাপারে আর একটি কথা জানবার বিষয় এই যে, কোনো কারণেই মাথার তালুতে হাত রাখাটা যুক্তিসংগত নয়। ওটা ভুল gesture। গভীর হতাশা অথবা নিদারুণ সমস্যা-পীড়িত চরিত্রের অভিব্যক্তি হিসাবে মাথার তালুতে হাত রাখা চলতে পারলেও, ওই ধরনের অভিব্যক্তি সাধারণতঃ দর্শকমনে রেখাপাত করতে পারে না। অবশ্য বড় বড় অভিনেতাদের কথা আলাদা। হতাশার অভিব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত অভিনেতা কীন ওই ধরনের gesture ব্যবহার করতেন। অবশ্য বড় বড় অভিনেতার পক্ষে অস্বাভাবিক gesture-ও অনেক সময় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাই বলে নবীন অভিনেতা যদি সেই অভিনয় অনুকরণ করেন তাহ'লে তা মারাত্মক ত্রুটি বলেই গণ্য হবে। তাই সাধারণ অভিনেতা এবং নবীন শিক্ষার্থীদের এ জাতীয় ভুল অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

ফলকথা অভিনেতার অঙ্গ-সঞ্চালন অর্থাৎ gesture প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যয়শীল হতে হবে। তা যেমন ক্ষণস্থায়ী হ'লে চলবে না, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে যে তা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রসাভাস না ঘটায়। প্রতিটি gesture-এর মধ্যে যৌক্তিকতা অর্থাৎ justification থাকা প্রয়োজন। সংলাপের অর্থকে ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তিই, দর্শকসাধারণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং অতি সতর্ক অনুশীলনের সঙ্গে এই gesture বা ইন্দ্রিয় অভিব্যক্তি আয়ত্ব করা প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে খুব সহজ বলে মনে হ'লেও অভিনয়কালে স্বাভাবিক মঞ্চভীতি বশতঃ এইগুলির যথাযথ প্রয়োগ মুহূর্তটি

আমরা বিস্মিত হই। তাই দিনের পর দিন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এইগুলি আয়ত্ব করা উচিত।

খ.

তারপর মঞ্চে হাঁটা-চলার কথাও স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। সত্যিকথা বলতে কি যথাযথভাবে হাঁটা-চলা করতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমরা কেউ লাফাই, কেউ দৌড়াই, কেউবা এমন হেলেদুলে দুলকি চালে চলি যে, একটু নজর করে দেখলে হাস্যরসেরই উদ্রেক করে। ইংরেজীতে figure বলতে যা বোঝায়, আমাদের এই অসংযত হাঁটা চলার জন্যে তা কিছুতেই বজায় থাকে না। ফলে যথার্থ একটা pose-এর সৃষ্টি হয় না। অথচ অভিনয়কালে এই pose হ'ল অভিনেতার একটি মূল্যবান সম্পদ। এই pose-এর ওপরেই দর্শক-মনে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার অনেকখানি নির্ভরশীল। অকারণে কুঁজো হয়ে দাঁড়ান, কিম্বা এলোমেলো অসতর্ক চলাফেরা অভিনেতার পক্ষে তাই ক্ষতি-কারক। চরিত্র-চিত্রণের প্রয়োজনে দেহভঙ্গীমার বিকৃতি অবশ্যই আনতে হয়, কিন্তু আমরা অনবধানবশতঃ অনেক সময়ে অপ্রয়োজনেও দেহ ভঙ্গীমার নানা ধরনের বিকৃতি নিয়ে আসি। কেননা চলতি জীবনেও আমাদের অনেকের মধ্যেই যথার্থ smartness-এর অভাব দেখা যায়। হাঁটা চলাটাকে art বলে আমরা মনে করি না। তাই এ বিপত্তি। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে এই ভুল-ত্রুটি পার পেয়ে গেলেও অভিনয়কালে তা কখনই ক্ষমার্হ হয় না। সুতরাং কলা বিদ্যাশিক্ষার নিষ্ঠা নিয়েই অভিনেতাকে মঞ্চে হাঁটা-চলার বিধি নিয়ম শিক্ষা করতে হবে। কেন না অভিনয় শিক্ষার প্রথম কথাই হ'ল এই হাঁটা-চলা শিক্ষা করা।

মেরুদণ্ডের সঙ্গে কাঁধ, ঘাড়, এবং মাথা ঋজুরেখায় রাখার অভ্যাস হ'ল মঞ্চে সুষ্ঠুভাবে হাঁটা-চলা শিক্ষার প্রথম ধাপ। মাথার ওপরে একটি প্যাড বেঁধে তার ওপর যদি তিরিশ কি চল্লিশ পাউণ্ড ওজন চাপান যায়, (অবশ্য এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কেননা আমরা যাট পাউণ্ড পর্যন্ত বিনা কষ্টে মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি। অর্থাৎ ঐ পর্যন্ত ওজন বইবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।) তাহ'লে ঘাড় এবং মাথা ঋজুরেখায় স্থাপিত হবে।

তারপর যদি ওই ওজন মাথায় নিয়ে আমরা চলার অভ্যাস করি, তাহ'লে প্রথম প্রথম আড়ষ্ট লাগলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর, আমাদের হাঁটা চলার যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আসবে তেমনি সুঠাম দেহভঙ্গীও আমাদের চলার ছন্দকে সুষমা-মণ্ডিত করে তুলবে। কেননা মাথায় ভার চাপিয়ে চলার ফলে আমাদের কাঁধ ঘাড় এবং মাথা মেরুদণ্ডের সঙ্গে ঋজুরেখায় স্থাপিত হবে, আর তার ফলে আমাদের পদক্ষেপণ হবে সতর্ক ও ছন্দময়। মাথায় বোঝা নিয়ে যারা হাঁটা চলা করতে অভ্যস্ত তাদের চলাফেরায় যে একটা অতিরিক্ত সুষমা আছে তা দৈনন্দিন জীবনে একটু নজর করলেই আমরা দেখতে পাবো। নবীন অভিনয় শিক্ষার্থীর পক্ষে এই হাঁটা-চলা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভালো অভিনেতা হওয়ার পক্ষে এইসব শিক্ষা করাই শেষ কথা নয়। এইগুলি সম্পূর্ণভাবে অধিগত হওয়ার পর, তাকে মঞ্চে অভিনয় করার সময় যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারাটাই হ'ল অভিনয় শিক্ষার পরিপুর্ণ পরিণতি। নতুন অভিনেতাদের সবচেয়ে বড দোষ হ'ল এই যে, অভিনয়ের প্রাক্কালে এই বিষয়গুলির কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলে তাঁরা মনে করেন যে, এ-সবই তাঁদের জানা আছে ; বস্তুতঃ পক্ষে তা থাকেও। কেননা হাঁটা চলা বা ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের রীতিনীতি যা এ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, এবং আমাদের সকলেরই এগুলো কোনো না কোনো ভাবে জানা আছে। তবু সমস্যাটা এই যে, মনে মনে জানা থাকলেও প্রয়োজনে এই জানিত বিদ্যার প্রয়োগে আমরা অপারগ হই। মঞ্চে উঠে অভিনয় করতে গেলে, সব কিছু জানা থাকার পরও সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। তাই অভ্যাস কখনই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অভিনয় লাবণ্য বিস্তার করতে পারে না।

কথা বলার আগে, অর্থাৎ নাটকের সংলাপ আবৃত্তি কৌশল শিক্ষার আগেই তাই নবীন অভিনেতাদের মঞ্চে হাঁটা-চলার রীতি নিয়মগুলো যথেষ্ট ধৈর্য এবং পরিশ্রমের সঙ্গে শিক্ষা করা উচিত। আপাতদৃষ্টিতে মঞ্চে হাঁটা-চলা কিম্বা চুপ করে দাঁড়িয়ে সহ অভিনেতার কথা শোনা সহজ সাধ্য মনে হলেও, সেই গুণ আয়ত্ব করা অনায়াস লভ্য নয়। কেননা অভিনয়ের সব ব্যাপারটা দর্শক মনে জারিয়ে তোলার প্রশ্ন আছে। তাই ভাল শ্রোতা হওয়া অভিনেতার পক্ষে

একটা গুণের কথা। আর বলতে দ্বিধা নেই যে, এই বিশিষ্ট গুণটি থেকে অনেক বড় বড় অভিনেতাও বঞ্চিত।

৭। চরিত্র উপলব্ধি

বড় পার্টের দিকে ঝোঁক সকলের। বিশেষ করে নতুন যাঁরা অভিনয় করতে শুরু করেছেন, তাঁদের অধিকাংশের ঝোঁক কি করে বড় পার্ট পাওয়া যায়। তার ফলে ছোট ছোট চরিত্রগুলি হয় অবহেলিত। এই ছোট পার্ট করার জন্য উৎসুক না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো, এই সব চরিত্রে সংলাপ কম থাকে। সুতরাং মঞ্চে উঠে এই সব স্বল্প দৈর্ঘের চরিত্রের অভিনেতারা করবার কিছু না পেয়ে খৈ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু যদি সহ অভিনেতার সংলাপ শোনা এবং সেই সব সংলাপের প্রতিক্রিয়া নিজের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করবার প্রক্রিয়া তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ব করতে পারেন, তাহ'লে এই সব ছোট পার্টের অভিনেতারা যে, অভিনয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবেন, তা হাজারো বড় চরিত্রে অভিনয় করলেও আয়ত্ব করা যাবে না। শুধু তাই নয়, সহ-অভিনেতার কথা মনযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস করলে অভিনেতার মন ধীরে ধীরে অভিনীত চরিত্রের প্রতি কেন্দ্রবদ্ধ হবে, আর তা হ'লেই তিনি মঞ্চে অভিনয়-কালে যে যে প্রাথমিক ভীতির সম্মুখীন হন, তা স্বাভাবিকভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। তখন আর অঙ্গসঞ্চালনজনিত সমস্যা, বিশেষ করে হাত দু'টোর ব্যবহারের সমস্যা থাকবে না।

নতুন অভিনেতার পক্ষে মঞ্চে উঠে হাত দু'টো নিয়ে কী যে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় তা বলার নয়। মনে হয়, যেন এই হাত দু'টো বিধাতার অবান্তর সৃষ্টি। বিশেষ করে অভিনয় করার সময় এই অনাবশ্যক হাত দু'টো না থাকলেই ছিল ভালো! আর এই কথা যতই মনে হতে থাকে ততই অভিনেতার চরিত্রের কথা ভুলে, নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। এটা একটা

মারাত্মক বাধা। এর ফলে সংলাপ ভুল হয়ে যায়, অভিনেতার চলাফেরার আড়ষ্টতা আসে, অভিনীত চরিত্রের যথাযথ রূপদান ব্যাহত হয়ে সমস্ত নাটক-টাকেই একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ করে তোলে।

অভিনয়কালে নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ার এই জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হ'ল, বিশেষ মনযোগের সঙ্গে সহ অভিনেতার সংলাপ শোনা, এবং সেই শোনার ফলে নিজের ওপর যে যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, সেইগুলি যথাযথভাবে অভিব্যক্ত করে, দর্শক-মনে জারিয়ে দেবার ক্ষমতা নিষ্ঠা সহকারে অর্জন করা। সুতরাং চরিত্রাভিনয়ের কলা-কৌশল শেখার আগে নবীন অভিনয় শিক্ষার্থীদের সহ অভিনেতার সংলাপ বিশেষ মনযোগ সহকারে শোনার অভ্যাস করা উচিত। এটাই হ'ল অভিনয় শিক্ষার্থীর প্রাথমিক কর্তব্য।

চরিত্রায়ণের কথা আসে তার পর। সেখানেও নতুন যাঁরা অভিনয় করছেন, তাঁদের মনে নানা ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সব প্রথম যে সমস্যাটির তাঁরা সম্মুখীন হন, তা হ'ল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। বলা বাহুল্য, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়। চরিত্রের ধ্যানে তন্ময় হয়ে যাওয়ার অভ্যাসটাই আসলে বড় কথা। নবীন অভিনয় শিক্ষার্থীদের এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় ক্ষেত্রেই এই সাধারণ সত্যি কথাটা অভিনেতাদের স্মরণ থাকে না। চরিত্রের ধ্যান ছেড়ে নিজেকে নিয়ে তাঁরা অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। যে কোনো নাট্যপরিচালকই জানেন যে, অভিনেতারা চরিত্রের-উপযুক্ত করে নিজেদের প্রস্তুত করার পরিবর্তে, তাঁদের উপযুক্ত চরিত্রের সন্ধানেই ব্যতিব্যস্ত। বলা বাহুল্য এই ধরনের আত্মচিন্তা চরিত্র বিশ্লেষণের প্রধান অন্তরায়।

নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মেলে কোনো নতুন নাটকের মহলা শুরু হওয়ার আগে। সাধারণত কোনো নতুন নাটক অভিনয় শুরু করার আগে, সেটি সমবেত অভিনেতৃমণ্ডলীর সামনে পড়া হয়। এটাই চিরাচরিত রীতি। রীতিটি মারাত্মক এবং অবৈজ্ঞানিক। কেননা এর ফলে অভিনেতারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। কথাটা রূঢ়

হলেও সত্য। ধরা যাক অমুক নাট্যসংস্থা কোনো একটি নতুন নাটকের অভিনয় করবেন মনস্থ করলেন। নাটকটি অভিনেতাদের সামনে পড়া হ'ল, এবং পরিচালক সমবেত অভিনেতাদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রগুলি বণ্টনও করে দিলেন। সাধারণভাবে নাটকের চরিত্র অভিনেতাদের মধ্যে বণ্টনের পর, সেগুলিকে কি ভাবে যথাযথ রূপ দেওয়া যায়, এই চিন্তাতেই তাঁদের তন্ময় থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটে ঠিক তার উল্টোটা। জিজ্ঞাসা করে দেখুন, প্রত্যেক অভিনেতাই বলেন, "আমার চরিত্রটি ভালো, কিন্তু অমুকের পার্টটা আরও ভালো। আমি যদি ওটা পেতাম, তাহ'লে আরো ভালো অভিনয় করতে পারতাম।" এই ধরনের মনোভাব যে যথাযথ চরিত্রায়ণের অন্যতম অন্তরায় একথা নিশ্চয় বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারপর যদিও বা কোনোরকমে পরিচালকের দেওয়া চরিত্রটি তাঁরা মেনে নিলেন, তাতেও রেহাই নেই। কেননা এর পরেই তাঁরা নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং রূপসজ্জা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ নাটকের কোন দৃশ্যে কতবার পোষাক বদল করবো, কি পোষাক পরবো, কি ধরনের রূপসজ্জা বা মেকআপ হবে, এই সব চিন্তাই তখন অভিনেতাদের প্রধান ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে উপযুক্ত পোষাক এবং রূপসজ্জাই নাটকীয় চরিত্রটিকে সজীব করে তুলবে। কিন্তু ধারণাটি ভুল। পোষাক এবং রূপসজ্জা অভিনীত চরিত্রটি সম্পর্কে দর্শক মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করলেও সেটি সজীব হয়ে দর্শকমনে চিরস্থায়ী রেখাপাত করতে পারে, অভিনয়ের একমাত্র গুণেই। আর সেই গুণ নির্ভর করে অভিনেতা তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে কতখানি তিনি বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন তার ওপর।

৪। চরিত্র ও বিশ্লেষণ

নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ অভিনেতার ব্যক্তিগত দর্শন এবং মনন ক্ষমতার

ওপরেই নির্ভরশীল। নাট্যকার যে সব চরিত্রের সৃষ্টি করেন, তা জীবন-বহির্ভূত নয়। প্রত্যেকটি চরিত্রই কোনো না কোনোভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আওতার মধ্যেই থাকে। সাধারণভাবে আমরা হয় তো তাদের লক্ষ্য করি না। একজন অভিনেতার সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য আমরা এড়িয়ে গেলেও, অভিনেতা তাদের এড়িয়ে যান না। চলতি জীবনের পথে যে সব বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যটি তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গেই লক্ষ্য করেন। কে জানে আজকে এই মুহূর্তে তিনি যে বিচিত্র লোকটির সঙ্গে বসে খোশ গল্প করছেন, কালই হয় তো সেই ধরনের একটি চরিত্রে তাঁকে রূপ দিতে হবে। তাই আজকের মানুষটির কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, এবং তার মানসিক চিন্তার স্বরূপটি তিনি যত সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে পারবেন, কালকের চরিত্রটি রূপদানের সমস্যা ততই তাঁর কাছে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত হওয়া বিচিত্র মানুষের হাবভাব, এবং ভাবনা-চিন্তার প্রকাশভঙ্গী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দর্শনের মধ্যেই তাই নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণের সোনার কাঠি-লুকানো আছে -- পোষাক পরিচ্ছদ কিম্বা রূপসজ্জার মধ্যে নয়।

চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পর্কে আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে মানুষের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়া। প্রত্যেক মানুষের অন্তর সত্তা ত্রিধা বিভক্ত। ব্যক্তিগত মানুষ, পরিবারিক মানুষ এবং সামাজিক মানুষ। ব্যক্তিগত আমি এবং পারিবারিক আমি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। যখন আমি একলা আমার নিজস্ব ভাবনা চিন্তা নিয়ে তন্ময়, তখন সেই আমির মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি থাকে না। কেননা নিজের সঙ্গে নিজেকে ছলনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ আমি যখন পারিবারিক আমি হয়ে দাঁড়ায় তখন নানা কারণে আমার দুই আমিত্বের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে আসল আমিটা কিছু অংশে চাপা পড়ে যায়। তার ফলে উদয় হয় আর একটা নকল আমিত্বের। সুতরাং পরিবারিক আমির মধ্যে কিছুটা ছদ্মবেশ আছে। আবার এই পারিবারিক আমি যখন দৈনন্দিন কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সামাজিক মানুষের

সঙ্গে চলা ফেরা করি, তখন সেই পরিবারিক আমিরও পরিবর্তন আসে। বাইরের বৃহত্তর জীবনে আমার আচরণ, এবং পরিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আমার আচরণ সম্পূর্ণ এক নয়। একই আমির মধ্যে এই যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ, এটি মননশীল অভিনেতা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সুতরাং অভিনীতব্য চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে মানব চরিত্রের এই জটিল রহস্য সম্পর্কে অভিনেতাকে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ থাকতে হবে। এগুলি যদি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, অথবা এই বৈচিত্র্যকে যদি তিনি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ হন, তাহ'লে তাঁর দ্বারা নাটকের চরিত্রের যথাযথ রূপদান কখনই সম্ভব হবে না।

চরিত্রায়ণের ব্যাপারে আর একটি কথাও অভিনেতার মনে রাখা বিশেষ দরকার। তা হ'ল তাঁর নিজের সম্বন্ধে ধারণা। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্ক অতিরিক্ত গুণাবলীর আরোপ করি। অর্থাৎ নিজের শক্তির সীমা ঠিকমত অবহিত থাকা সত্ত্বেও মানতে চাই না। তাই বহুক্ষেত্রেই আমরা যা পারি না তার দিকেই ঝুঁকি। আর তার ফলে যেটা পারি সেটাও আমাদের অনায়ত্ত থেকে যায়। একথা একশোবার সত্যি যে, সব মানুষকে দিয়ে সব কিছু হয় না। কেননা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্নতর। এই রূঢ় সত্যটি প্রত্যেক অভিনেতারই স্মরণে রাখা দরকার। তাঁর নিজের চেহারা, কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিগত রুচি, এবং বিশেষ করে তাঁর শক্তির সীমায়তি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন না থাকলে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিপদে হোঁচট খেতে হবে। এবং তিনি কিছুতেই অভিনয়-বিদ্যায় নিজেকে পারদর্শী করে তুলতে পারবেন না। প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি স্বাভাবিক গুণাবলী আছে। অভিনেতার কাজ হ'ল নিজের সেই স্বভাব সম্পর্কে অবহিত হয়ে, তাকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগানো। যদি কেউ খর্বকায় হন, এবং মুখচোখ যদি খুব ধারাল হয় এবং কণ্ঠস্বর খুব ভরাট হয়, তাহ'লে অন্য চরিত্রের চেয়ে তাঁকে অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, ইত্যাদি Intellectual চরিত্রে মানাবে বেশী। আবার যদি কেউ সরু অথচ সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী হন, দেহের আকৃতি যদি ললিত লাবণ্যময় হয় এবং মন যদি প্রকৃতিগত ভাবেই আবেগপ্রবণ হয়, তাহ'লে তাঁকে প্রেমিক ইত্যাদি

জাতীয় চরিত্রেই মানাবে বেশী। এর বিপরীতটা করতে গেলেই হোঁচট খাবার সম্ভাবনা। কেননা সেখানে নিজের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হবে। নিজের সঙ্গে এই নিজের সংঘাত উপস্থিত হ'লে একজন অভিনেতা কখনই তাঁর অভিনয় ক্ষমতা যথার্থভাবে বিকশিত করতে পারবেন না। কেননা অভিনয়ের সময় তখন প্রতিমুহূর্তেই তিনি নিজেকে নানাভাবে resist করতে শুরু করবেন। আর তার ফলে তিনি নিজেকে প্রকাশ করার পরিবর্তে বারে বারে নিজেকে অন্তমুখী করে তুলতে চাইবেন। তাই চরিত্রায়ণের ব্যাপারে নিজের শক্তির সীমা সম্পর্কে অভিনেতার স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

মনে রাখতে হবে ওথেলো আর রোমিও একজাতের চরিত্র নয়। সুতরাং যে অভিনেতা খুব ভালো ওথেলো করতে পারেন, তাঁকে যে সেই পরিমাণে রোমিও চরিত্রেও ভালো অভিনয় করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আর তা করতে না পারাটাও একজন অভিনেতার পক্ষে লজ্জার বিষয় নয়। কিম্বেল এবং কীন দু'জনেই ছিলেন খুব বড় অভিনেতা। হ্যামলেটের ভূমিকায় কিম্বেল ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু ওথেলোর ভূমিকায় তিনি তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। আবার ওথেলোর ভূমিকায় কীন ছিলেন একযুগের সেরা অভিনেতা, কিন্তু হ্যামলেটের ভূমিকায় তিনি আশানুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাই বলে কিম্বেল বা কীন কেউ যে কারো তুলনায় স্বল্পশক্তিমান অভিনেতা ছিলেন এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলে না।

তাই নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত থেকে সেই অনুযায়ী চরিত্র বেছে নিয়ে অভিনয় করলে, তা অভিনেতার পক্ষে লজ্জার বিষয় হবে না।

মোটামুটিভাবে অভিনয় কলা তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম। নবীন অভিনেতারা যদি এই আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হন, এবং এগুলি বিশেষ যত্ন এবং সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলন করেন, তাহ'লে তাঁরা হয়ত কিছু পরিমাণে উপকৃত হতে পারেন।

অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, আলোচিত বিষয়গুলির সতর্ক

অনুশীলন করলেই যে সু-অভিনেতা হওয়া যাবে তা নয়, কেননা অভিনয়-প্রতিভা মূলতঃ সহজাত। তবে আলোচিত বিষয়গুলি অনুশীলনের মাধ্যমে সহজাত অভিনয় প্রতিভাকে ক্রমবিকশিত করা যায়। আর এটাই হ'ল অভিনয় শিক্ষার একটা বিশেষ দিক— এই চর্চা করাটা।

'আর্ট অব্ অ্যাকটিং'
অনুসরণে

সত্যের সন্ধানে অভিনেতা

মূল রচনা: রবার্ট লুইস

অনুসরণে: অতনু সর্বাধিকারী

সত্য কী? এ-প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। বলতে চাই অভিনয়ের সত্য কী। বাস্তব জীবনকে যেমনটি দেখছি মঞ্চেও কি তেমনি দেখাবো? বোধ হয় কারুর ভাল লাগবে না তা। ঘটা ঘটনা আর নির্ভেজাল বাস্তবের পীঠস্থান যে রঙ্গমঞ্চ নয়— এ কথা স্তানিস্লাভস্কির। তিনি বলেছেন 'বাস্তব আর্ট নয়। আর্টে শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তির লীলা। যা বলতে প্রথমেই বুঝবো কোনো স্রষ্টার কর্ম। অভিনেতার বাহাদুরি হল যা কল্পনা তাকে চোখের সামনে শিল্পসিদ্ধ সত্য করে তোলা।'

এ কথা স্বীকার্য যে, স্তানিস্লাভস্কি প্রবর্তিত অভিনয় রীতির লক্ষ্য ছিল, কী করে অভিনয় সত্য-সদৃশ হবে। চারদিকে দৃকপাত করে তিনি দেখেছিলেন, অভিনয়ের নামে অঙ্গভঙ্গী আর নকলনবীশী। তাঁর নাট্যচিন্তার উন্মেষ এখানেই। গোড়াতেই তাঁর বিশ্বাস ছিল, এর ভেতর পথ আছেই একটা, যে পথে অভিনেতা তার সত্যচেতনাকে ব্যক্ত করবে অভিনয়কলার মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন, এই সত্যের স্বরূপ নিয়ে। এই সত্য কি অভিনেতার সুবিধে মাফিক সত্য? নাকি যেটা তাঁর সহজে আসে সেইটেই সত্য? অভিনেতার ব্যক্তিগত

মানসিক কাঠামোর নিকটতম সত্যই যদি সত্য আখ্যা পায় তবে সবিনয়ে বলবো এ সত্য আংশিক।

তাহ'লে সত্যের সংজ্ঞা কী, আগে সেইটি ঠিক করে নেওয়া দরকার।

বিপদ হচ্ছে আর্টের ক্ষেত্রে এই কথাটি এক একজন বোঝেন এক এক অর্থে। একজন অভিনেত্রীর গল্প বলি। ইনি সুদর্শনা, সুরসিকা, বুদ্ধিমতী। এবং সেই সঙ্গে একটি মিষ্টি দরদী মনেরও অধিকারিনী তিনি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করুন, মুগ্ধ হবেন। কিন্তু খবর্দার ভুলেও তাঁর অভিনয় দেখবেন না। আচ্ছা, জীবনে যিনি এত প্রাণোচ্ছল আন্তরিক, মঞ্চে উঠলেই তাঁর ভোল সম্পূর্ণ বদলে যায় কি করে বলুন তো ?

একদিন সুযোগ মিলে গেল। এ-টা ও-টা নিয়ে গল্প করছি। টের পেতে না দিয়ে আসল কথাটা শুধোলাম। রহস্যময়ী রহস্য ভাঙলেন। বললেন, 'জীবন হ'ল আলাদা জিনিস। এই যে আপনার সঙ্গে এতো আবোল তাবোল বকছি, কিংবা ধরুন ছেলেপুলে মানুষ করছি, এর সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করার কি সম্পর্ক ? কিন্তু যখন আমি স্টেজে উঠি'—এইখানে সম্ভ্রমে তাঁর গলার স্বর অন্যরকম শোনালো—'তখন আমাকে কতো অন্তর থেকে সব কিছু করতে হবে বুঝে দেখুন !'

তা হ'লে দেখুন আন্তরিকতা হ'ল তাঁর কাছে সেই বস্তু-বিশেষটি যা তিনি সযত্নে তাঁর আর্টে যোগ করেন। এই 'আন্তরিকতা' শিল্পী হিসেবে তাঁকে পথে বসাচ্ছে। কে শ্রীমতীর কানে কানে বলবে, 'আপনি জীবনে যেমন কৃত্রিম, দয়া করে মঞ্চেও কি তেমনি হতে পারেন না ?'

আন্তরিকতার প্রসঙ্গেই বলি, 'রিহার্সাল-রুমে গেলেই আপনি শুনবেন, 'আমি এটা ফিল করছি না'। আমার মুখে আসে, বলি—'তাতে কিছু ধরণী রসাতলে যাবে না। ও-টা আপনার নয়, দর্শকদের অনুভবের জন্যে'। আমার মনে হয় এ-টা আসলে অজুহাত। অভিনেতা নাটক অনুযায়ী নিজের যা করণীয় তা করছে না। তা যদি ঠিকমতো করতো, তবে যথাযথ অনুভবও করতো। তা না হ'লে বুঝতে হবে, সে যা করছে তাতে গলদ আছে। আর যতক্ষণ অনুভব না করছি, অভিনয় করবো না, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো—এ-

ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া বা মত প্রকাশ করা ভুল। আগে চরিত্রানুগ কাজ করে যাও [ভূমিকায় যেমন আছে তেমনি কথা বলো, শোনো ইত্যাদি] তারপরে আসবে অনুভব।

জানেন, অভিনয় দেখতে দেখতে আমি যে দিন সবচেয়ে অভিভূত হই, আমার সে বিমুগ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে, এই পদ্ধতি, এই যে হৃদয়জাত আবেগ অনুভব দিয়ে য়্যাক্টিং করার কথা বলছি, তার সঙ্গে সে অভিনয়ের কোনো সংস্রবই নেই। দিকপাল চীনা অভিনেতা মিঃ লাং-ফ্যাং-এর অভিনয় দেখেছি অভিনয়ে আবেগ অনুভবের ধার দিয়েও যেতেন না তিনি। যখন কাঁদবেন একটা হাত-পাখা তুলে নিয়ে এমনভাবে মুখটা ঢাকলেন যে, পাখার ওপর দিয়ে চোখ দু'টি দেখা গেল—তারপর 'মিউ' করে শব্দ করলেন—ছোট্ট সুষম ছন্দিত একটি শব্দ। আমরা সবাই বুঝলুম, তিনি এখন কাঁদছেন।

তাঁর অভিনয়-রীতি অনুসরণ করলে দেখি তিনি আবেগ অনুভব প্রকাশ করতেন আঙ্গিকের সাহায্যে। অঙ্গসঞ্চালন, শব্দ, নৃত্য, সঙ্গীত এগুলি তাঁর শিল্পীসত্তার বাহন। আমাদের কি অনুভব করতে হবে, তা তিনি আগেভাগেই জানিয়ে দিতেন। তারপর কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে এমন রমণীয়ভাবে সেটি করতেন যে, আমাদের অতি সুকুমার অনুভূতিগুলিতেও দোলা লাগতো। শুধু আমাদের সৌন্দর্য-চেতনাই যে ধন্য ধন্য করতো, তা নয়, যেমন খুশি তিনি আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারতেন। মঞ্চে আত্মহত্যা করলেন একবার। একটা বড় বাঁকা তরোয়াল নিয়ে ধরলেন গলায়। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘোরাতে লাগলেন মাথার ওপর। এই বুঝি মাথাটা উড়ে গেল। তরোয়ালটা ঘুরছে তো ঘুরছেই—তারপর হঠাৎ পাথরের মতন সব কিছু স্তব্ধ নিশ্চল। মাথাটা অল্প একটু হেলে আছে একদিকে। তিনি সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে; যবনিকা নামলো। আমাদের মনে হ'ল সত্যিই মাথাটা দেহচ্যুত হয়েছে। মাথাটা তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। 'অনুভব' দিয়ে অভিনয় করে প্রেক্ষাগৃহকে কেউ আরও ভীতিবিহ্বল করতে পারে কিনা জানি না। আমাদের সমস্ত উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, নিজেদের আসনে আমরা প্রাণ হয়ে বসেছিলুম—ভূতগ্রস্ত কতকগুলি মানুষ।

এখন, এই যে অভিনয়ে ব্যক্তিগত আবেগ অনুভবের ওপর, অর্থাৎ বলতে পারি অভিনেতার আত্মপ্রেমের ওপর এতো গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, এর মূল কোথায়? এর মূল কি এই তথাকথিত মানসিক সত্য (psychological truth) নিয়ে নাচানাচি করার মধ্যে নিহিত নেই? যে মানসিক সত্য মানে অভিনেতার নিজের মানসিকতা, আর্টের সত্য কদাচ না। এ অভিনয়ে অভিনেতা চায় সব কিছুকে নিজের স্তরে নামিয়ে আনতে—নাট্যকারের বা নাটকের কুশীলবের ভাবনা চিন্তা না, এখানে মুখ্য হ'ল অভিনেতাটি কি ভাবছেন। আধুনিক কালের বাস্তববাদী নাট্যকার যাঁরা, তাঁদের ভাগ্যেই বেশি করে এ দুর্ঘটনা ঘটছে, ঘটেছে। তাঁদের ধ্যানধারণা সংশ্লিষ্ট অভিনেতার সীমিত চিন্তাশক্তির কবলে পড়ে মার খাচ্ছে।

অভিনেতাদের এই আত্মপ্রেমের আর একটা নমুনা দি। ধরুন, কোনো অভিনেতা ভুলভাবে নাটকের একটি লাইন পড়ছেন। আচ্ছা, সে-টা ঠিক করে দিতে যাওয়া কি দোষের? প্রায়ই শুনি, 'কি ভাবে পার্ট পড়তে হবে আমায় দেখিয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ওতে অভিনয় কৃত্রিম হবে'। স্তানিস্লাভস্কির বাইবেলের নামে এবং তথাকথিত সত্যের মহিমা রক্ষার ব্যাকুলতায় অভিনেতার মুখে যেন খই ফোটে, 'আমি ব্যাপারটা হৃদয় দিয়ে ঠিক মতন অনুভব করতে চাই। আপনি যদি কেমন করে বলবো আমায় দেখিয়ে দেন, তবে সমস্ত ব্যাপারটাই হবে নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক।'

মজা হচ্ছে পরিচালনা করতে গিয়ে বারবারই দেখেছি, শুধু ভুলভাবে ভূমিকা পড়ার জন্যেই একটা নাটকীয় মুহূর্ত জমতে পারছে না। অগত্যা আমি স্তানিস্লাভস্কি ওলটাই। 'বিল্ডিং এ ক্যারেক্টার'-এর এক জায়গায় ঠিকমতন রিডিং পড়ার গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। সে-টা খুঁজে বার করি। উনি সেখানে বলেছেন 'একটা মানুষের ভাগ্য, তার জীবন পর্যন্ত নির্ভর করতে পারে অভিনেতার ঠিক জায়গাটিতে একটু থামার ওপর। এই শব্দগুলি নিন 'ক্ষমা, 'অসম্ভব', 'নির্বাসন' : শব্দগুলি এখন একটু এদিক ওদিক করুন, দেখবেন কি বিপর্যয় ঘটছে। যদি বলেন 'ক্ষমা—অসম্ভব নির্বাসন' তবে লোকটি আপনার হাতে পার পেয়ে গেল। যদি বলেন 'ক্ষমা অসম্ভব—নির্বাসন' তবে হতভাগ্যকে মারলেন।

কিছু সংখ্যক বাতিকগ্রস্ত অভিনেতা মনে করেন, যদি কোন্ শব্দের ওপর জোর দেবো না দেবো এই নিয়ে মাথা ঘামাই, তবে অভিনয় করবো কি করে। অভিনয় নাকি ভেতর থেকে আসে। সে বাইরের শাসনের তোয়াক্কা করে না। হাসি পায় এর উল্টোটা দেখে। বেশ নামডাকঅলা এক অভিনেতাকে একবার আমি বলি, 'এ কথাটা বলার সময় আপনি মনে মনে এই জিনিসটা ভাববেন'। তিনি বলে উঠলেন, 'অসম্ভব। আপনি আমাকে কথাটা কেমন করে বলতে হবে, বলে দেখিয়ে দিন না—আমি করে দিচ্ছি। অভিনয় করার সময় আমাকে কিছু ভাবতে হ'লে তো সে, একসঙ্গে দু'টো রোল করার মতো হবে। তা আমি পারবো না।'

এ ক্ষেত্রে হোমরা-চোমরা অভিনেতাটি পার্ট মুখস্থ করাতে আর কোথায় কোথায় জোর দিতে হবে না-হবে মনে রাখতেই সর্বশক্তি ব্যয় করে ফেলেছিলেন। আগের ক্ষেত্রে সব নির্ভরতাটুকু অন্ধ অনুভবের ওপর গিয়ে পড়েছে। তাই অভিনেতা আর সব বিষয়ে হয়ে পড়েছেন পঙ্গু। হয়তো নির্ভুলভাবে অনুভব তিনি করছেন ঠিকই। কিন্তু, প্রতিবারই ভুল কথার ওপর জোর পড়ায় বক্তব্যই যাচ্ছে পালটে।

আচ্ছা, এর কি কোনো যুক্তি আছে—কেন তুমি ভূমিকা পাঠের সময় অভিনেতা হিসেবে তোমার যে সত্যবোধ তা হারিয়ে ফেলবে? কত সময় এমন হয়, ভূমিকা পড়ানো ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না, বিশেষ চরিত্রের জন্যে অভিনেতা বাছাই করার। অনেক সময় এই পাঠের ভেতর দিয়ে অভিনেতার ক্ষমতার এমন অনেক কিছু জানা যায়, যা দেখে বা আলাপ করে হয়তো কিছুই বোঝা সম্ভব নয়।

অভিনয়ের সঙ্গে সত্য অনুভবের সম্পর্কটা কি? এ সমস্যা হালফিলের না। তবে হাল আমলে এ-প্রসঙ্গ অদ্ভুত এক মোড় নিয়েছে। এ বিষয়ে কবে কোথায় কে কি লিখলো বা লিখেছিল আমি মনে রাখি। এ রাখাটা অকারণে নয়। এ কালের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা আধুনিক জীবন-যাত্রার মতন আধুনিক অভিনয় ধারাকেও কুক্ষিগত করেছে। রিফ্লেক্স ইত্যাদি নানা

রকমের মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় ব্যুৎপত্তির ফলে নতুন নতুন জমকালো সমস্যায় আমাদের পর্যুদস্ত হ'তে হ'চ্ছে।

কলা-জগতে সত্য বনাম নকল অনুভব নিয়ে এ-তর্ক সাবেকী হ'লেও 'সাইকোলজি' শিখে আমাদের মুখের বুলিগুলো বেশ বদলেছে। তা ঘড়ির কাঁটাকে যখন পেছনে ঘুরোতে পারি না, এই সব নয়া বৈজ্ঞানিক মালমশলা নিয়েই আমাদের ঘর করতে হবে। এগুলোকেও আমাদের বোধবুদ্ধি আর কাজের সঙ্গে মেলাতে হবে।

এ নিয়ে আরও দু'এক কথা বলা দরকার, বলছি। মসিঁয়ে লুই জুভে একবার এক নিবন্ধে বলেছেন, অভিনেতার উচিৎ সে যা অনুভব করছে সেটি রেখে, গোপন রেখে যা সে অনুভব করছে না তাই দেখানো। এ এক জটিল কথা মাথায় ঢুকলো না কিছু। নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করলুম কথাটা। অভিনেতা যা অনুভব করছে, তা সে গোপন রাখবে, যা অনুভব করছে না তাই দেখাবে। কিন্তু কেন মশাই আপনি যা অনুভব করছেন, তার সদ্ব্যবহার না করে লুকিয়ে রাখতে যাবেন? আর যা অনুভব করছেন না, তা দেখানোও তো ভণ্ডামি। তারপর একদিন দেখি জুভে অন্যত্র লিখছেন: যে চরিত্রটির রূপ দেবে, তার সঙ্গে মনেপ্রাণে এক হও, তার অনুভবকে নিজের করে নাও।

এবার জুভের প্রথম উক্তির রহস্যটি একটু যেন পরিষ্কার হ'ল। জুভে বলতে চান, অভিনেতার কর্তব্য নিজের ব্যক্তিগত অনুভবগুলিকে গোপন করা, লেখক বা চরিত্রটি যে অনুভব দাবী করছে তার সৃষ্টি করা।

অভিনয়ের সত্য সম্বন্ধে স্তানিস্লাভস্কির যে বিশ্বাস, খুঁজলে তার শেকড় মিলবে পুশকিনে। পুশকিন স্তানিস্লাভস্কির প্রিয় লেখক। তাঁর এক চিঠি থেকে এক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন স্তানিস্লাভস্কি। লেখা সম্বন্ধে এক প্রশ্নের জবাবে পুশকিন বলছেন, 'লেখক বা নাট্যকারের কাছ থেকে আমাদের বিচার-বুদ্ধির দাবীটা কি? একটা বিশেষ অবস্থায় ভাবাবেগের সত্য-সাদৃশ্য, সমানুভূতি।' অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রয়োগ করলেন স্তানিস্লাভস্কি। 'বিশেষ অবস্থা' বলতে বুঝলেন, এই নয় যে, বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, অতএব মঞ্চ থেকে

বেরিয়ে আসার সময় তাড়াহুড়ো করো। সেটা বিশেষ অবস্থা ঠিকই, তবে একার্থে। এখানে 'বিশেষ অবস্থা' মানে, সমস্ত নাটকটি কি অবস্থার ভেতর রয়েছে—যেমন চরিত্রগুলি কোন্ সময়কার কোথাকার মানুষ, নাট্যকার কোন্ রীতিতে লিখেছেন নাটকটি—অভিনয়ের ভেতর দিয়ে এই সব কিছু তুলে ধরতে হবে।

অভিনয়ের সত্যকে আমরা কি ভাবে প্রকাশ করতে পারি? ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর সম্ভব। যেমন,

ক

প্রথমতঃ, যাকে বলতে পারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সত্য। এ অভিনয় অনুভবের নকল, চটকদার হলেও অন্তঃসারশূন্য। স্রেফ স্নায়ুর জোর থাকলেই এ অভিনয় করে বাহবা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। [প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, এ ধরনের অভিনয় আমার রুচিকর মনে হয় না] কিছু লোকের মন ভোলালেও রসিক চিত্তের গভীর পিপাসা মেটানোর পুঁজি এ অভিনয়ের নেই।

খ

দ্বিতীয়তঃ, [এও আমার কাছে তেমন মুখরোচক মনে হয় না] যাকে বলতে পারি অনুভূতির স্বীকরণ। এখানে অভিনেতার ব্যক্তিগত অনুভূতি অকৃত্রিম হ'তে পারে। অভিনেতা অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু আসলে সে-গুলি মূলের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। এ অভিনয় নাটকের সব কিছুকে অভিনেতার সমস্তরে নামিয়ে আনে। অভিনেতার এই স্তরটি নাতিউচ্চ হ'লেও এখানে বলে রাখি বাস্তববাদীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দ্যুজের ক্ষেত্রে হ'ত ঠিক উল্টো। দ্যুজে সাধারণ স্তরের নাটককে নিয়ে যেতেন উর্দ্ধে—সার্থক রসলোকের দিকে। নিয়ে যেতেন তাঁর অভিনয়ের যাদুতে। সত্যিকারের সৎ নাটকে

তাঁকে দেখা গেছে কচিৎ, কিন্তু নিজের শিল্পবোধে সেই নাটকগুলিকে আশ্চর্য ভাবে রসোত্তীর্ণ করতেন, দর্শক মনে সৃষ্টি করতেন এমন সব ভাব ও বোধ যা অবিনাশী। সে সব নাটক মূলতঃ ধোপে টিকবে না, কিন্তু নাটকের অতীত সেই মুহূর্তগুলির অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির বালুকালুপ্ত কোনোদিন হবে না।

গ.

এ দু'টি ছাড়াও তৃতীয় একটি পথ আছে। [এটিই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়।] এখানে সত্যকে অভিনেতা পেয়েছে তার অভিজ্ঞতায়। কিন্তু এ-সংযত সত্য শিল্পের শাসনে শান্ত। বিশেষ চরিত্র-চিত্রণ, সমগ্র নাটকের প্রয়োজনের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে মেলানো।

আমার মনে হয় প্রথম দু'দলই বাহ্য। যাঁরা নাটকীয়তার নামে শূণ্যগর্ভ 'সুন্দর' অভিনয় করেন, আবার যাঁরা সত্যের নামে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একঘেয়ে অভিনয় করেন। সত্যকে যে অনাটকীয় হতে হবে, নাটকীয়তাকে হতেই হবে মিথ্যে—এমন কথায় আমার মন সায় দেয় না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে অন্তরের চেয়ে বাইরের নির্দেশই মানবো বেশি, এ পরামর্শ গ্রাহ্য নয়। কেননা সে আত্মপ্রকাশ আত্মহননেরই নামান্তর মনে করি।

তবে, যে কথা আগেই বলেছি, অভিনেতার আত্মপোষণ মূলক মনোবৃত্তি, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য প্রীতি পরিহার করতে হবে। এই জন্যেই তো সে, যে অনুভূতিগুলো তার নাগালের ভেতর—তার ওপর ঝুঁকে পড়ে। শিল্পীর কাজ নিজের উপাদানকে বিশ্লেষণ করা, তারপর নিজের ভেতর থেকে কোন্‌টা দিয়ে সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলবে তা ভাবা।

বলতে চাই শিল্পীর কর্মপথ ক্ষুরধার, মোটেই আরামের নয়। এই যে সবাই বলে, আবেগকে অভিনেতার সহজ স্বাভাবিক দৈনন্দিনের ভাবাভিব্যক্তির ভেতর আবদ্ধ রাখতে হবে—এ ধারণা আমাদের কল্পনাশক্তিকে ধিক্কৃত করে। 'দি ডিল্যুজ' নাটকে মাইকেল শেখভের অভিনয় স্মরণ

করুন। যখন তিনি পার্টনারকে জানাবেন, তার বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আসলে তিনি তাকে ভালবাসেন, তিনি তার বুক নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। যেন চাইছেন, ওইভাবে তার অন্তরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে একাত্ম হতে—একেই আমি নিঃসংশয়ে বলি স্রষ্টার কল্পনাশক্তি। 'গোস্টস্' নাটকে দ্যুজের অভিনয় কেউ কখনও ভুলতে পারবেন না। দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের ছেলেকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। বুঝলেন—সন্তানের ভেতর দিয়ে তার পিতারই পুনরাবির্ভাব হয়েছে—এবার তাঁকে 'ভূত' বলে চেঁচিয়ে উঠতে হবে। শব্দটা উচ্চারণের সময় তিনি উৎক্ষিপ্ত মুষ্টি দিয়ে আঘাত করে যেন অদৃশ্যচারী প্রেতগুলোকে তাঁর সামনে থেকে তাড়িয়ে দিতে গেলেন —কল্পনাশক্তি।

সিসিলির অভিনেতা গ্রাসো কোনো নাটকে চিত্রকরের ভূমিকায় নেমেছেন। এক তরুণ শিক্ষার্থীকে তিনি অঙ্কনবিদ্যা শেখান। বাড়ি ফিরে একদিন গ্রাসো দেখলেন যে, তার একান্ত স্নেহভাজন ওই ছেলেটি, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে। তখন বিরাট চেহারা নিয়ে গ্রাসো এগিয়ে এলেন ছেলেটিকে খুন করতে। আতঙ্কে অভিভূত বালক নড়তে পর্যন্ত পারলো না। ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিলেন গ্রাসো। ছেলেটির কাছে এসে কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে শিশুর মতো আঁকড়ে ধরলেন। গ্রাসো ক্ষয়ে পড়েন নি, কিন্তু নিজের রসবুদ্ধিতে বুঝেছিলেন ছেলেটিকে যে তিনি খুন করতে চান তা তাঁর স্ত্রীর জন্যে নয়, তার কারণ, ছেলেটির ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা সম্পূর্ণভাবে এখানে ধূলায় লুণ্ঠিত হ'ল।—এখানেও দেখি কল্পনাশক্তি।

এঁরা সবাই এই মুহূর্তগুলোকে পরিপূর্ণ ভাবাবেগের সাহায্যে যথাযথ সত্যতার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তাতে অভিনয়ের যে শিখরে তাঁরা পৌঁছেছিলেন তার নাগাল পেতেন না। প্রথম ক্ষেত্রে শেখভ নখ আঁচড়ানোর ওই অভিব্যক্তি ব্যতিরেকেই ওই দৃশ্যে প্রাণবন্ত অভিনয় করতে পারতেন; ...ভয়ে নিশ্চল হয়ে—দ্যুজে শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন—স্বামীর পাপ পুনরায় ফিরে আসছে, অতীতের গহ্বর থেকে উঠে এসে প্রেতরা তাঁকে আক্রমণ

করছে—এই আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে। কি দরকার ছিল মুষ্টিতাড়নার ওই অভি-ব্যক্তির? ওর আশ্রয় না নিয়েও তো এক আবেগ-টলটল মুহূর্তেরই সৃষ্টি হতে পারতো। আর বিপুল আবেগের আতিশয্যে গ্রাম্য সোজা ছেলেটির কাছে এসে ঝাঁকুনিতে ঝাঁকুনিতে তাকে অন্ধ করে দিতে পারতেন। দিতে পারলে তা সম্পূর্ণ সত্যও হ'ত। কিন্তু ওই অভিনেতারা যদি শুধু যথাযথ অনুভবটুকুকেই যথেষ্ট মনে করতেন, তবে আমরা আজ তাঁদের কথা বলতুম কি?

বলতুম না। কেন না শিল্পীর সত্য হ'ল কল্পনা। সত্য অনড়, নিশ্চল একটা পদার্থ নয়। আর্টে অবিরত সত্যকে খোঁজাই তো আসল সত্য।

'ট্রুথ ইন এ্যাকটিং'

অনুসরণে

মৃতকল্প অভিনয়কলা

মূল রচনা : সিড্রিক হার্ডউইক

অনুসরণে : অরুণ রায়

বিশেষভাবে এই যুগেরই সাম্প্রতিককালে রবার্ট মরলী'র ওয়াইল্ড, মরিস ইভান্স-এর হ্যামলেট, রেমণ্ড ম্যাসীর লিঙ্কন এবং ওয়াল্টার হাস্টন-এর স্টুইভেসান্ত প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় নজীর হিসাবে দেখার পর, এ-কথা বলা অত্যন্ত অদূরদর্শিতা যে, অভিনয়, শিল্প হিসাবে মরণোন্মুখ। কিন্তু আমার বক্তব্য নিতান্তই নবীন অভিনেতা সম্পর্কিত।

প্রখ্যাত অভিনেতাদের অনবদ্য অভিনয় অনুষ্ঠানের পরেও এটা আদৌ বিস্ময়কর মনে হবে না যদি কারও প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে : অভিনয়শিল্পের সুধীরে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে। কারণ তার স্বপক্ষের যুক্তি সুস্পষ্ট। মহান শিল্প, মহোত্তর অভিনয় প্রাথমিক পর্যায়ে সপ্রমাণ হয় না—বরং বিকশিত হয় এক বিশিষ্টকালে।

হয়তো বা সম্ভাব্য নবীন অভিনেতারা দুর্জয় বাধা বিপত্তির পথ অতিক্রম করে অন্যান্য কালের অনেক অভিনেতার মতনই অমরত্ব অর্জন করবেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, সে-পথ অত্যন্ত দুস্তর, দুর্গম ; বন্ধুরও অনেক বেশী, যা সত্যিই তাদের কাছে অচিন্তনীয়। কারণ সমাজের গঠন হয়েছে পরিবর্তিত ; দৃষ্টিকোণ

আজ স্থানান্তরিত, মানুষও কথঞ্চিত বিভ্রান্ত। তাই আজকের দিনে সুঅভিনয় এবং তার শ্বাসরোধের কারণ আহরণ আপেক্ষিকভাবে আদৌ ভ্রমাত্মক বিবেচিত হবে না।

বর্তমানের বক্তব্য :

নাট্যাভিনয়ের এক বিরাট যন্ত্রে অভিনেতা কেবল অন্যতম অংশমাত্র। যেমন শিল্পনির্দেশক, পরিচালক বা নাট্যশালার অন্য বিভাগীয় কর্মীবৃন্দ রয়েছেন। কিছুকাল আগে মস্কো আর্ট থিয়েটারের বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিচালক-বৃন্দের সঙ্গে অন্য বিভাগীয় মহিলাকর্মীরাও সমভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। যে কোনও নাট্যশালার সমবায় প্রভাবিত কর্মপন্থা অবশ্যই অনস্বীকার্য, তবুও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এ-চিন্তাও অনতিক্রম্য যে, অভিনেতার গুরুত্বও যথোপযুক্ত আরোপিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু আজ আমাদের আশ্চর্য বিস্মরণ ঘটেছে যে, অভিনেতা, একমাত্র অভিনেতাই নাটকের প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। অতএব যতক্ষণ না সেই অভিনেতার কণ্ঠে হচ্ছে শব্দের স্ফুরণ, সঞ্চালিত হচ্ছে অঙ্গ— ততক্ষণ নাটক মলাটের নিষ্পেষণে পঙ্গু, মুদ্রাকর কেবল লাঞ্ছিত শব্দ সমষ্টিমাত্র।

নাট্যকারদের বহু বালসুলভ উক্তি কর্ণগোচর হওয়ায় আমার কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্রেক হয়েছে। কারণ তাঁরা বলছেন, "ভাল নাটকমাত্রই হওয়া উচিৎ অভিনেতা প্রতিরোধক"।

অথচ আমি কখনও কোনও সঙ্গীত স্রষ্টাকে বলতে শুনি নি যে, তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত পিয়ানোবাদক প্রতিরোধক। আমাদের নাট্যকাররা যদি মনে করেন একমাত্র অভিনেতারাই তাঁদের মননশীলতার, শিল্পবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশের অন্যতম অন্তরায়, দুর্ভোগের কারণ—তাহ'লে আমার বিনীত পরামর্শ, তাঁদের উচিৎ নাট্যসৃষ্টির পথ পরিত্যাগ করে সমধিক মনোযোগে উপন্যাস রচনা রপ্ত করা। একমাত্র উপন্যাসই প্রকৃত অভিনেতা প্রতিরোধক। নাটক নয়।

উপন্যাস রচনায় আছে সুলভ সুযোগ, যা পাওয়া অসম্ভব নাটক তথা মঞ্চের মাধ্যমে। উপন্যাস অনেক বেশী স্বাধীন, লেখককে অনায়াসে দান করে চিন্তা বিকাশের বিস্তৃতি। রচয়িতার মনন ও মতাদর্শের প্রকট প্রচারের

প্রকৃষ্ট মাধ্যমও উপন্যাস। পক্ষান্তরে, শিল্পের সুব্যক্ত মাধ্যম হ'ল মঞ্চাস্থ নাটক, এবং তাতে মতাদর্শ ও সত্যানুসন্ধান উপস্থাপিত হয় অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে—যেমন কাব্যিক-সত্য অলঙ্কারাবৃত।

ইবসেন থেকে শুরু করে বহু নাট্যকার আমাদের দান করেছেন দীপ্তি অশেষ আনন্দ; ক্ষণপ্রভার অসহ অন্ধত্ব নয়। আমরা লাভ করেছি বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌবনজাত পাপ প্রবৃত্তি, উদ্বাহ-বন্ধন এবং আরও প্রচুর প্রসঙ্গে বহু সুসমাচার। মনে হয় নাট্যশালা স্বীয় কারণেই কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত এবং বিদগ্ধ ব্যক্তি আকর্ষণে অসমর্থ। অবশ্য অপ্রাপ্ত-অভিজ্ঞ নাট্যকারের প্রক্ষিপ্ত প্রচার-নাটিকাও মঞ্চে উপস্থাপিত হয়ে প্রভূত প্রখ্যাতি প্রাপ্ত হ'তে পারে, তবে ইবসেন এবং বার্নার্ড-শ মহান নাট্যকার বলেই প্রখ্যাত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই বিশেষণ আদৌ প্রযোজ্য নয় এঁদের অনুসরণকারী অন্যদের সম্বন্ধে।

২.

আধুনিক নাট্যশালা বাস্তবানুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরিত্যাগ করেছে স প্রচলিত পুরাতন শৈলী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, "নাটকীয়" শব্দ বর্তমানে এক ধরনের উপহাস। বর্তমানে নাটকের অভিপ্রেত বক্তব্য হওয় চাই স্পষ্টোচ্চার এবং প্রতিটি চরিত্রায়ণ মোটা দাগে আঁকা। শেক্সপীয় নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রাজ্ঞ-প্রখ্যাত তাই তাঁর নাটক প্রসঙ্গেই বলি, লীয়ার আমা অন্যতম প্রিয় চরিত্র, কিন্তু আমার সারাজীবন ধরে এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাই নি, কেন এই বৃদ্ধ লোকটি কোন কন্যা তাঁকে বেশী ভালবাসে এই নির্বো প্রশ্নের তাড়নায় অস্থির। এটাই বোধ হয় অভিনেতার দায়িত্ব, একটা আপাত অসম্ভব অবস্থাকে প্রত্যয়যোগ্য করে তোলা। আদপেই আশ্চর্যজনক নয় একজন সুঅভিনেতা অভিনয় মাধ্যমে যা বোধগম্য করাতে সক্ষম, আমর অনেক অধ্যয়নেও তাতে অসমর্থ। এবং নাটকীয়ত্ব প্রসঙ্গে বলা যেতে পা যে, নাটকের শেষ দৃশ্যে লীয়ার চরিত্রায়ণে আরও কত বেশী অসঙ্গতি, ক

অদম্যতার আধিক্য ঘটতে পারে? কোন সমসাময়িক আলেখ্য ও অব্যক্ত উপায়ে ওই বৃদ্ধের হতাশ্বাসে ভগ্নহৃদয় ও শোকোন্মাদনা প্রকাশিত হ'তে পারে?

শেক্‌স্‌পীয়র সর্বদা, সর্বতোভাবে সুযোগ দিতেন অভিনেতার অভিনয়ের, চরিত্রায়ণে রাখতেন গুপ্ত সুপ্ত অর্থবোধ—সুঅভিনেতার সপ্রকাশের সদিচ্ছায়। অবশ্যই হ্যামলেট এই বক্তব্যের যথার্থ ধ্রুপদী উদাহরণ। বর্তমানেও বিদগ্ধজনেরা বিস্তর বিদিশায় বিধৃত করে চলেছেন হ্যামলেট চরিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ।

আমি প্রায় এক বৎসরেরও অধিক "স্যাডো এণ্ড সাবস্টেন্স" নাটকে ক্যামন স্কিরিটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। অথচ আজ আমি অনস্বীকার করি, নাট্যশালার বাইরে ক্যামনের অনেক পরস্পর-বিরোধী কর্মপদ্ধতি ও বক্তব্য-পরিমাপে অসমর্থতার কথা। যেমন ব্রিজিটের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত অভিযোগ উত্থাপনে তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, পরে আবার তার তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া। যাই হোক, এই বোধহয় নব্য নাট্যকারদের ঔচিত্যবোধ। মঞ্চালোকের বাইরে আছে অন্য জগতের অবস্থিতি, যা সত্যিকারের জগৎ নয়, এবং এর আছে নিজস্ব নিয়ম, অর্জিত অর্থবোধ, দৈশিক ও ঐহিক সীমাবদ্ধতা। অভিনেতার অভিনয়ে অর্থবোধ অনুপ্রকাশের অত্যন্ত আগ্রহশীল অভিলাষ শ্রীভিনসেন্ট ক্যারলের ছিল। অসীম সাহসী হ'য়ে আজ আমার বলতে বাধা নেই, তাঁর সমসাময়িকদের এই সদিচ্ছার ছিল একান্ত অভাব।

একমাত্র নাট্যকারদের কাছেই যে অভিনেতারা অনাস্থাভাজন এ-কথা বলা অত্যন্ত অবাচীন বক্তব্য। ইংলণ্ডে আমিও নাটক পরিচালনা করেছি সুতরাং যখন আমি অন্যায় আচরণের জন্য পরিচালকদের ভর্ৎসনা করি তখন সেই অন্যায়ের অংশীদার হ'তে আমিও ব্যক্তি হিসাবে বাধ্য। যার পরিচালনায় নাটক মঞ্চস্থ হয়, তাঁর কাছে অভিনেতা আনতি ও অঙ্গভঙ্গী অনুকরণে আগ্রহশীল অনেকটা পোষা তোতাপাখীর মত। একটা সময় ছিল যখন অভিনেতা এই বিশেষ দর্শনবোধে দংশিত হ'ত। অবশ্য আজকের দিনে এই প্রতীতি প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। একবার আমার পরিচালিত একটা নাটকের প্রথম মহলার বেশ কয়েকদিন আগেই অভিনেতাদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন

সমাধা হয়েছিল। প্রথম মহলার দিন, তাঁদের উপস্থিতিতে সবিস্ময়ে লক্ষিত হ'ল, প্রত্যেকেই প্রদত্ত পাঠক্রমের প্রতিটি পদ ঠোঁটস্থ করেছেন মাত্র। কিন্তু এতটুকুও অন্তর্নিহিত অর্থ অবহিত হওয়ার চেষ্টা করেন নি। জড় যন্ত্রের মত শুধু শব্দ মুখস্থ করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত—আর অন্য সব বিষয়ে নির্দেশকের নির্দেশনায় নির্বিকল্প।

নাট্যকারের নির্ঘোষও নিঃসঙ্কোচে তাই যেন কানে এসে বাজে—"ঠিক এই কারণেই প্রতিটি চরিত্র হওয়া উচিৎ অভিনেতা প্রতিরোধক। সেই কারণেই চরিত্রের অব্যক্ত অন্তরার্থে অনুপ্রকাশে অপারগ অভিনেতায় আমাদের অনাস্থা, তাই আমাদের এই মিলিত ও নিশ্চিত নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক। যদি চরিত্র-চিত্রণের দায় অভিনেতাকে দান করা হয় তবে শ্রুত হবে শুধু শব্দের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি।" কিন্তু আমি প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাই এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে। কারণ আমি দেখেছি, যে সব নাট্যকার বা নির্দেশক এই রূপকার মারণযজ্ঞের হোতা তাঁরাই আজ উন্নতির শিখরে উড্ডীন। তাঁদের চাহিদা অভিনেতা তার চরিত্রায়ণে প্রয়োগ করবে না নিজস্ব বুদ্ধি, থাকবে না কোন উপলব্ধি, সংযোজিত হবে না বিন্দুমাত্র সহানুভূতি, কারণ এ সবই নাকি বাহুল্য। সে শুধু নির্দেশিত নিরীখে নয়ন নীম্মিলিত রাখবে, বলবে বলানো বুলি এবং পরিচালকের পথানুসরণে পারঙ্গমতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে। বহু দীর্ঘ শোকার্ত অভিজ্ঞতার অগ্নিস্পর্শে আজ নবোদগত অভিনেতারা যথেষ্ট সচেতন। তারা জানে, চরিত্রের কথা, শব্দগুলি শুধু কণ্ঠস্থ করাই বুদ্ধিমানের একমাত্র কার্যক্রম অন্য আর কিছু নয়।

আমাদের কালে দেখেছি, প্রায় শতাধিক সূত্র ছিল অভিনেতার অভিনয় শুদ্ধির শিক্ষাক্রম হিসাবে। এবং এ সবেরই প্রবক্তা ছিলেন তৎকালীন পরিচালক তথা নির্দেশকবৃন্দ। সেই সূত্রাবলীর অনেকাংশ আজও অনবদ্য, অমূল্য। সেই সব সদিচ্ছাজাত সূত্রের সত্যতায় সন্দিহান না হয়েও বলছি, তাও যেন

অনেকটা উপন্যাসকারের মত নিজের উপলব্ধ উপায়ে সত্যানুসন্ধানে সচেতন করার প্রচেষ্টা; যে বিষয়ে সব মানুষ সহজেই স্বভাবসিদ্ধ সাধারণবুদ্ধিতে সত্যজ্ঞানে সচেতন। অবশ্য এঁদের মধ্যে দু-একজন আছেন ব্যতিক্রম—যেমন স্তানিস্লাভস্কি। তিনি বহু সারগর্ভ সূত্রের সঙ্গে সংযোজিত করেছেন অভিনয়-দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচুর পথনির্দেশ। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেই পথিকৃৎ, প্রবক্তা এই প্ররোচনার প্রতি—এঁদের মানসিক গণ্ডীবদ্ধতা, গোঁয়ার্তুমির প্রতিও আছে আমার প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস। যদিও প্রতি অভিনেতার মানব জীবন সন্দর্শনে সচেতনতা সম্বন্ধে তাঁদের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, কারণ এই বিরাট বিশ্বে অগণ্য লোকের অসংখ্য বাচনভঙ্গী, অগণনীয় অঙ্গভঙ্গী অভিনেতার অবশ্য লক্ষ্যনীয়।

অভিনেতাকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে কোনও না কোনও বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। এবং তার উৎকর্ষ সাধনের সহজ ক্ষেত্র এই পৃথিবীর পরিবেশ—এই পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ। যেমন একজন চিত্রশিল্পীর পক্ষে শিক্ষা সমাপনান্তে অন্য শিল্পীর অনুকরণ না করে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা আহরণে আগ্রহশীল হওয়া উচিৎ। এর স্বপক্ষের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল, আজকে আপনাদের দ্বারা কখনই প্রত্যক্ষ হ'তনা গোঁয়ার স্পেনের রাজকীয় পরিবেশে প্রোজ্জ্বল আধুনিক চিত্রসম্ভার কিংবা গ্রীসের অভিজাত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞান স্বরূপ সুচিত্রলেখা। এই সবই কি তাঁদের স্বীয় কার্যালয়ের আবেষ্টনীতে দৃষ্ট সৃষ্ট? মানুষের পক্ষে কেমন করে সম্ভব, তার বান্ধবমাত্রেই অভিনেতা, যে বাস করে পান্থশালায় বা কোনও এক অট্টালিকার নিজস্ব প্রকোষ্ঠে যা শুধুই অভিনেতার আবাস; ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে অভিনেতাদের সাথে, পোষাক পরিহিত হয় অন্য অভিনেতার অনুকরণে, পাঠক্রম শুধুই মঞ্চবিষয়ক—এবং অভিনয় করে একমাত্র অভিনেতার চরিত্র?

আধুনিক নাট্যশালা আরেকটি বিশেষ বাধায় ব্যাহত করেছে অভিনেতার অন্তস্ফূর্তি তা হ'ল মঞ্চসজ্জাকারীর সাযুজ্য। বহু মঞ্চসজ্জাকর আছেন যাঁদের কাছে মঞ্চকে ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত করায় নির্দোষীকরণের অন্যতম উপকরণ হ'ল নাটক। বিশেষভাবে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, যেখানে দৃশ্যান্তরে দৃশ্যসজ্জার

অধিকতর অভিনন্দনের আশায় অভিনেতার অভিনয়াংশকে অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় পরিগণিত হয়। এখন চিন্তনীয়, কোনও কোনও ঐশ্বর্যশালী মঞ্চসজ্জা আমাদের সবার প্রশংসায় প্রখ্যাত হয়েও বিশেষ কোনো দোষে দুষ্ট? তারা হৃদয়াকর্ষণকারী, অমূল্য, তারা উদ্ভাবনপর, সবই সত্যি, তাদের শুধু একটি মাত্র দোষ, তারা নাটকের সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপনে অভিনেতাকে নগণ্যে পর্যবসিত করেছে। কারণ মঞ্চসজ্জার যান্ত্রিক উন্নয়নে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের অশ্রুত থাকে অভিনেতা বা নাট্যকারের বক্তব্য। এই কারণেই দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ের নাটকে সংযোজিত হয়েছে মহামূল্যবান মন মাতানো মঞ্চসজ্জা।

বর্তমানে আধুনিক মঞ্চের বৈশিষ্ট্য হ'ল অপ্রয়োজনেও দৃশ্যশিল্পায়নে অভিনেতার অতি পুরাতন কর্তব্য হ্রাস করা। যখন দর্শক রঞ্জনে প্রকৃষ্ট প্রাকার নির্মাণে পারঙ্গম মঞ্চসজ্জাকর বর্তমান, তখন কি প্রয়োজনে শেক্‌সপীয়র কৃত ম্যাকবেথ নাটকে মুখর বর্ণনা দেওয়ার যন্ত্রণাভোগ করবেন আমাদের সুললিত নাট্যকারবৃন্দ? শেক্‌স্‌পীয়রের তো ছিল না আধুনিক আলোক-সম্পাতের সহায়তা কিংবা প্রতিভাধর দৃশ্যস্থপতি? তাই তাঁকে বর্ণাঢ্য মায়াজগৎ বর্ণনে প্রসপারো চরিত্রে অংশগ্রহণকারী অভিনেতার জন্য সৃষ্টি করতে হয়েছিল অভূতপূর্ব কাব্য-মায়া। অতএব, এককথায় বলা যায়, যে, অভিনেতার অবাধ ক্ষতির জন্য দায়ী আধুনিক নাট্যশালার যান্ত্রিক উন্নয়ন, আর তারই উৎকট প্রয়োজনে অভিনেতার আজ এই হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর পরিণতি।

যেহেতু আমি পুরাতত্ত্ববিদ নই তাই আধুনিক নাট্যকারদের হাতে যুগোপযোগী যান্ত্রিকতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুরাতনী প্রথা প্রবর্তনের পরামর্শ দিতে আমি নারাজ, তবে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমাদের যুগের এক সার্থক নাট্যসৃষ্টির প্রতি, থর্নটন ওয়াইল্ড কৃত "আওয়ার টাউন" নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল এলিজাবেথীয় মঞ্চসজ্জা এবং তার মাধ্যমেই বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল তাঁর বাগ্মীতা। কারণ নাট্যশালা কর্তৃক গ্রন্থকারকে দত্ত হয়েছিল শুধু চার দেওয়ালের চৌহদ্দি আর কিছু আলোক-বর্তিকা, বাকী অংশে তিনি নির্ভরশীল ছিলেন নিজের প্রতিভার সক্ষমতায়।

অন্যপক্ষে, অপরের অবহেলা ব্যতিরেকে অভিনেতারও আপন অপরাধ অপরিসীম। যখন থেকে নাট্যশালা বাস্তবতার উৎস সন্ধানে উন্মুখ হ'ল তখন থেকে অভিনেতারাও বশংবদ হয়ে বাস্তবানুগ জীবনদর্পণ প্রতিফলনে ব্রতী হলেন। তাঁদের বাগাডম্বরের উচ্চগ্রাম পরিবর্তিত হ'ল মিষ্টতায়, কণ্ঠে এল নিম্নগ্রামে—একঘেয়ে ঘুমপাড়ানী গানের স্বর-মাধুর্য। চরিত্রানুগ আনতি ও দেহভঙ্গিমা সুচারুভাবে স্বল্পায়িত হ'ল সিগারেটের ছাই ঝাড়া বা কোটের নীচে সার্টের হাতা ঠিক করার মত অঙ্গসঞ্চালনে। এই সত্যের অকাট্যতা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, আজকে আগের মত অতি আনতি অপ্রয়োজনীয়। কারণ পূর্বে অপকৃষ্ট গঠনের জন্য নাট্যশালায় থাকতো অল্প আলো—অভিনেতার অভিনয় থাকতো অশ্রুত। কিন্তু এসব ব্যতিরেকেও বর্তমানে অভিনয় দক্ষতা বৃদ্ধির অন্তরালের অন্য কারণ আছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল—আজ যেহেতু দর্শকবৃন্দের নাটক উপলব্ধ হচ্ছে শ্রুতির মাধ্যমে তাই পক্ষান্তরে আনুপাতিক আনতিও অতিনাটকীয় বলে পরিগণিত এবং স্বভাবতঃই অভিনয়ও থাকছে অত্যন্ত অস্ফুট। এই সচেষ্ট অস্ফুট অভিনয়ের সর্বাধিক অভ্যুত্থান ঘটেছে চেকভের নাটকে এবং আধুনিক অভিনেতাদের অভিনয়ের অস্বাভাবিক অল্পতা বিশেষভাবে রুশীয় নাটকে পরিলক্ষিত হওয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময়কর পরিগণিত হবে না।

এ সবেরই পশ্চাতে আছে আধুনিক নাট্যশালার বাস্তবানুগ প্রয়োগপদ্ধতির সমসাময়িক সচেষ্টতা। নিশ্চয়ই কেউ আর ফিরে পেতে চায় না সেই সব দিন যখন প্রতিটি প্রকোষ্ঠের পরিমাপ হ'ত বাকিংহাম প্রাসাদের প্রকোষ্ঠের পর্যায়ে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক যে আজ এই গণতন্ত্রের যুগে আমাদের নাট্যশালায় উপস্থাপিত হবে প্রতিটি মানুষের পরিচিত পরিবেশ। কিন্তু অসীম আমাদের অগ্রগতির অভীপ্সা। আমরা সমতালে বাদ দিয়েছি বর্ণাঢ্যতা, নাটকীয়ত্ব, ব্যাপ্তি কারণ এ সবই নাকি অতিনাটকীয়। বাস্তবধর্মে ব্রতী আধুনিক নাট্যশালার ভ্রমাত্মক যুক্তির সম্বন্ধে আমার অভিমত: সর্বদা সর্বথাদৃষ্ট ঘটনাস্রোত, বারাঙ্গনা পরিবেষ্টিত সাধারণ স্থান নাট্যশালায় গিয়ে দেখার কোনও সমুচিত কারণ নেই। যখন বাইরের বিশ্ব অনেক উত্তেজনা, পারস্পরিক বিরোধ,

অনেক নাটকীয়ত্ব বহু সংগ্রামে পরিপূর্ণ, তখন আমাদের কিছু মধ্যবিত্তের গন্ধময় সমস্যার সম্বন্ধে সচেতনতা স্বাভাবিক। কারণ তারা নাট্যশালায় নিঃসারিত। আজকের জগৎটাই এক বিরাট নাট্যশালা। বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই এক বিরাট নাটকে বহু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আরোপ এবং তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদেরও তাতে ঘটে দর্শন ও সংযোজন। পরিণামদর্শীদের আছে প্রচুর প্রগলভতা। তারা ক্রন্দনশীল, তাদের বিক্ষোভের ঝঞ্ঝা সুদূর স্বর্গে পরিব্যাপ্ত, তারা ভীতিকর, তারা অসংখ্য অগন্তের সম্মুখে সপ্রকাশ। এখনও কেবলমাত্র বাস্তবধর্মী নাট্যশালাই ছেলেমানুষী সমস্যায় সমুদগ্রীব।

আমাদের সব নাট্যশালাই বাস্তবধর্মী একথা অবশ্য বলা যাবে না। প্রতিক্ষেত্রে অনেকেরই প্রামাণ্য উপলব্ধি ঘটে নাট্যকার কর্তৃক কাব্যিক সতর্কতা, দর্শনের উন্নয়ন, নূতনতর কর্মপন্থা, অনেক বীরত্বব্যাঞ্জক উপাদানে। ম্যাক্সওয়েল এ্যাণ্ডারসনের নাম মনে পড়ে, তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যরচনার জন্য এবং রবার্ট. ই, শেরউডের বার লিঙ্কনের বক্তব্য উপস্থাপনায়।

কিন্তু এত আশাপ্রদ লক্ষণ আদৌ শাশ্বত নয়। পক্ষান্তরে বাস্তবধর্মী নাট্যশালা মৃতকল্প অভিনয় দক্ষতার অন্যতম কারণ। এবং এদেশে এই সমস্যাবলীর এক বিশেষ তৎপর্য আছে। এই যুগের নবীন অভিনেতারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন সমস্তই আমি উল্লেখ করেছি, বিশেষ করে আমেরিকায় অবস্থা সমধিক সঙ্গীন এ প্রসঙ্গেও। আপনাদের এখানে যা আছে সত্যি তা অতুলনীয়. এরকম দর্শক, সঠিক শৈলীবোধ, সুঠাম স্বাস্থ্যের ক্ষমতা সম্পন্ন যুবকবৃন্দ প্রভৃতি এতদ সত্ত্বেও যদি কোনও ইংরেজ বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে আমেরিকার অভিনেতার অনুসন্ধান করে তবে নিশ্চয়ই আপনারা তাকে মার্জনা করবেন। আপনাদের অভিনেত্রীরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সর্বোত্তম, কিন্তু পুরুষদের পর্যায় কোথায়?

এ্যালফ্রেড লান্ট নিশ্চয়ই সানন্দে লক্ষণীয়, ওয়াল্টার হাস্টন একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা এবং এইরকম অনেক নামই হয়তো একটি তালিকায় সহজ সবিশ্বাসে সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু অক্টোবরের একটি দিনে মঞ্চ সংক্রান্ত একটি পত্রিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপে লক্ষিত হ'ল সমস্ত মুখ্য চরিত্রেই অবতীর্ণ হচ্ছেন সর্বশ্রী

ম্যাসী, ইভান্স, কিং, লর্সন, কীথ্, ব্রাইস, ভীভ্রেস, মরলী এবং ব্যাটম্যান। অথচ আমাদের অপেক্ষা সর্বশ্রী মেরিভেল, কর্টনার, সোকোলফ, হোমালকা. লুকাস, ওয়ারাম, অস্কার এবং ড্যানিয়েল প্রমুখের জন্য আলাদা সম্মানের নজির আছে। আশ্চর্য এ তালিকায় একজনও মার্কিন অভিনেতার নাম নেই। কি কারণে নিউইয়র্কের কার্য্যাধ্যক্ষবৃন্দ পরদেশী অভিনেতা অনুসন্ধানে লিপ্ত তা সহজেই অনুমেয়।

৪.

আমার মনে হয় খুব শিগগিরই আমেরিকাবাসীর মনে এই প্রশ্ন উদিত হবে যে, তাঁদের নাট্যশালার বিশেষ কাঠামো ভাববৃদ্ধির সাযুজ্য আদৌ অপ্রয়োজনীয় নয়, যার পাদমূলে অভিনয় অনাবশ্যক পণ্ডশ্রমে পরিগণিত হচ্ছে। নবা অভিনেতাদের আজ অবধি শিক্ষা ব্যবস্থা অবদানের অপারগতা সত্ত্বে মার্কিন নাট্যশালার পক্ষে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের গতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে কি?

ইংলণ্ডে আমাদের ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থা আছে। বহু বর্ষের পত্তন ও বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞতায় একজন নবীন অভিনেতার পক্ষে নিজের অভিনয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সহজ ও সম্ভব। আমাদের সারা দেশে পরিব্যাপ্ত আছে বহু ভ্রাম্যমাণ নাট্যশালা। বিবিধ দর্শকের সম্মুখীন হয়ে একজন অভিনেতা লাভ করতে পারে তার ভারসাম্য, শৈলীর প্রামাণ্য নিশ্চিন্ততা এবং অবিসংবাদিত অভিজ্ঞতা। যে সুযোগ আমাদের নাট্যশালা প্রায়শই নবাগত অভিনেতাকে দান করে. নবীন মার্কিন অভিনেতা অরসন্ ওয়েলস্‌ও সেই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। একজন অভিনেতার কখনই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে পারে না, কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে. ক্যামেরা কর্তৃক চিত্রায়িত হয়ে অথবা সঠিক পান্থশালায় পানভোজ ইত্যাদির মাধ্যমে।

তাহ'লে নতুন অভিনেতাদের কি সুযোগ দান আপনাদের দ্বারা সম্ভব

হয়েছে? আপনাদের এইসব নিকৃষ্ট নাট্যশালা, অবশ্য আপনাদের অভিমত অনুসারে, দিতে পারে কিছু কর্ম সংস্থান, কিন্তু তারও আছে বিশেষ ব্যতিক্রম যা সহজ স্বাভাবিক নয়। ক্যাথারিন কর্ণেল এবং লান্ট প্রমুখ কয়েকজন নিঃস্বার্থ নাট্যপ্রেমিক অবশ্য গড়ে তুলেছেন ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থা এবং সেখানে নতুন অভিনেতাদের দিচ্ছেন কিছু কিছু সুযোগ। মার্কারী থিয়েটারও একাজে এগিয়ে এসেছেন এবং গ্রুপ থিয়েটার সৃষ্টি করেছেন কয়েকজন নূতন অভিনেতা। আমাকে যতদূর বলা হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট এখানে অত্যন্ত অল্প সংস্থাই আছে যেখানে পেশাদার অভিনেতাদের নিয়োগ করা হয়।

কিন্তু এ সবই আদৌ যথেষ্ট নয়। একজন মহান অভিনেতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন শত শত অভিনেতার উন্নয়ন প্রচেষ্টা। বিশেষ প্রকৃতিতেই এই পন্থার অপরিসীম ঔদার্য অবশ্যম্ভাবী। এবং এই ব্যাপার একক প্রচেষ্টায় অসম্ভব। বর্তমানে মার্কিন অভিনেতার অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হ'ল, একটি নাটকে বিশেষ ধরনের চরিত্র প্রাপ্তি এবং সেই নাটকের মঞ্চ সাফল্য।

আমার সহজ সমীক্ষা এই, যে দেশে এখনও সীমান্তিক মনঃস্তত্ত্ব বিরাজিত, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরই আছে অতি সহজে অভিপ্রেত সাফল্যের অভিলাষ আর দায়বদ্ধ দৈনন্দিন কার্যক্রমে অপার ভীতি। প্রায়শঃই আমি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থার কর্মত্যাগের পূর্বাহ্নে খেদোক্তি শুনেছি, লুইসভীল বা নিউ অরলীয়ন্স্-এ একটা বছরের বৃথা অপব্যয়ের বিষয়ে। বিস্ময়াহত হয়ে আমি ভেবেছি, তবে কি আমিও ১৯১৩ সালে একটা বছর সময়ের অপব্যয় করেছি গীর্জায়, হোটেলে খাওয়ার আনন্দে বা দক্ষিণ আফ্রিকার বক্তৃতা ভবন-গুলিতে অভিনয় করে?

আপনারা হয়তো বলবেন, আমার নির্দেশিত সব তথ্যই যথেষ্ট সত্য নয়। কিন্তু এ সবই বোধ হয় প্রযোজ্য প্রতিভার ক্ষেত্রে, যে কোনও পরিবেশেই যাদের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আমি অবশ্যই একথা অনস্বীকার করি। কারণ প্রতিভার ব্যাপার অনেক অজানা, কিছুটা বা অতিপ্রাকৃত—তাঁদের মাঝে নিহিত থাকে স্ফুলিঙ্গ যার প্রভাবে আমরা হই উদ্দীপ্ত। প্রতিভার স্পর্শে

একজন অনভিজ্ঞ শিশুর পক্ষেও দক্ষ ও যোগ্য মানুষকে শীতল-সদৃশ বা নির্জীব করা সম্ভব। কিন্তু সত্যি আমার বক্তব্য আদৌ প্রতিভা সম্বন্ধে নয়, কারণ প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা একমাত্র প্রতিভাধরেরই সাজে, এবং আমি নিজে যে তা নই সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সচেতন। আমার বক্তব্য যথার্থই যোগ্য এবং সুন্দর সুদক্ষ মানুষ সম্বন্ধে—যাদের উন্নয়ন নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী। এবং এই পন্থার কার্যকারিতার শুভফল পরীক্ষা-সাপেক্ষে ক্ষুদ্রতর চরিত্রাভিনয় পরিলক্ষণে আমরা আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারি।

আপনাদের কাছে আমাদের নাট্যশালার হয়তো অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে, কিন্তু প্রায় প্রতিটি ইংরাজী নাটকে ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির অভিনয়ে উৎকর্ষ তথা পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। নাট্যকার সমারসেট মম্ যখন তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় ইচ্ছাপত্র রচনা করেন, তখন তার উপসংহারে মাত্র একজন শিল্পীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, প্রখ্যাত তারকা নয়, এমন কিছু সুলিখিত উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অবতীর্ণ নয়, একজন অভিনেতা যিনি শখের নাটকে একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন রাখেন, তিনি শ্রী সি ভি ফ্রা। ইংলণ্ডের নাট্যশালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিত্রাভিনয়ে পরিপূর্ণতা দেখা যায় কারণ প্রতিটি অভিনেতার নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং যথাযোগ্য শিক্ষাপ্রাপ্তি ঘটে এখানে।

যদি সত্যিই ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থাসমূহে থাকতো চরম বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা এবং ভ্রান্তপদ্ধতি তবে আমেরিকায় আজ থেকে দশ পনেরো বৎসর পূর্বে কেমন করে কোথা থেকে বর্তমানের এই সব প্রখ্যাত অভিনেতাদের আবির্ভাব ঘটতো?

বর্তমানে ভাল নাটকের স্বল্পতায় মানুষ চিন্তাগ্রস্ত। এটা অবশ্যই যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত আবশ্যকতা। কিন্তু আরো অনেক কঠিন সমস্যা শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিনেতা যোগ্যতাসম্পন্ন অভিনেতার অভাব। শ্রীজন, গোল্ডেন এবং নাট্যকার সংসদ প্রায় ত্রিশজন নাট্যকারের সমাজভুক্তি ঘটিয়েছেন। এখন আমেরিকা-বাসীর নিজেদের প্রশ্ন করা উচিৎ নবীন অভিনেতাদের ব্যাপারে তাঁরা কতখানি সচেতন বা সচেষ্ট, তাঁরা কত বেশী সুযোগদান করেছেন এদের দক্ষতাবৃদ্ধির

উদ্দেশ্যে? আমার দর্শনানুযায়ী আধুনিক নাট্যশালার বিশেষ প্রকৃতিই হ'ল অভিনয় শিল্পের বিরোধিতা। এখনও এইভাব আছে অবিচল এবং বাস্তবিক ভাবে এই কারণেই ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে প্রাচীন কর্তব্য কর্ম। কিন্তু নাট্যশালার এই গঠন, যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরী, কখনও সুশিল্পীর উন্নয়ন রোধ করার ছাড়পত্র প্রাপ্ত হবে না—হতেই পারে না।

'মরিবও ক্রাফ্ট অফ এ্যাকটিং'

অনুসরণে

একই মুখে নানা রূপ

মূল রচনা : স্যার মাইকেল রেডগ্রেভ্
অনুসরণে : বিমল রায়

অভিনয়কলার কোনো উন্নতি হয়েছে কি-না, এর বিচার কেবলমাত্র তুলনামূলক ভাবেই করা সম্ভব। কারণ কলাশিল্পে চরম উন্নতি বলে কিছু থাকতে পারে না। অভিনয় শিল্প মূলতঃ অভিনেতাদের স্বকীয় ভঙ্গীর উপর সতত নির্ভরশীল। অভিনয়রীতি ও নাটক ভবিষ্যতে কোন্ পথ ধরে চলবে, আগে থেকে সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়, বা উচিৎও না। এখানে ইটালী দেশের চিত্রের কথা ধরা যেতে পারে। যুদ্ধপরবর্তীকালে ইটালীয় চিত্রকলার যেরূপ উন্নতি হয়েছিল, সে-কথা আগে থেকে কেউ ভাবতে পেরেছিল কি? পারে নি। কাজেই এই কলারূপটির কতটা উন্নতি হতে পারে বা হওয়া সম্ভব কোনো বিজ্ঞের পক্ষেই তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব না।

অভিনয় জগতে পা দেবার পর অধিকাংশ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে আমরা বারবার একই ভুল করতে দেখি। ভুলটা অভিনয়ের না, শিল্পীর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। মোটামুটি একটু নাম হবার পর শিল্পীমাত্রেই অধিক যশ কামনা করে থাকেন। এবং তখন, তিনি চান যে, প্রত্যহ যদি তিনি তাঁর মুখটি দর্শকদের দেখাতে পারতেন তবে তাঁর যশের

পরিমাণ আরও বাড়ত। অতএব তিনি, যেখানে যেমন সুযোগ পান, ছোটবড় গুরুত্বশীল, সাধারণ—যে কোনো চরিত্রেই অভিনয় করতে চেষ্টা করেন, এবং তা সুদৃশ্য মঞ্চ থেকে প্যাণ্ডেল বাঁধা মঞ্চে—সর্বত্র। পরন্তু উৎকৃষ্ট অনুৎকৃষ্ট প্রভৃতি সকল নাটকের কোনো না কোনো একটি চরিত্রে লেগে থাকার প্রতি তীব্র প্রবণতা তার মধ্যে দেখা যায়। মাইকেল রেডগ্রেভ মনে করেন, এমন লোভ যে কোনো অভিনেতার পক্ষেই ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত জন-প্রিয়তা শিল্পীর আয়ুকে ক্ষণস্থায়ী করে, রেডগ্রেভ এমন বিশ্বাসও করেন।

ধরা যাক, চরিত্ররূপায়ন সকল শিল্পকলার মতনই একটি creation। একজন সাহিত্যিক কি কবি, চিত্রী কি নাট্যকার যেমন যা পান তাই রচনা করেন না—খ্যাতির জন্যে তাকে সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম করতে হয়। এবং একথা সত্য, গাদাগাদা সৃষ্টি করা কোনো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব না। তেমনি একজন নাট্য-শিল্পীর পক্ষেও সকল চরিত্রকে সৃষ্টির পর্যায়ে পৌছে দেওয়াও অসম্ভব কর্মই। একটি কি দু'টি উল্লেখ্য সৃষ্টিই যে কোনো শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখে এই সত্য কথাটা সাধারণত অধিকাংশ শিল্পীই উপেক্ষা করেন।

অভিনেতার পক্ষে অত্যধিক পরিচিতি লাভ কিছুতেই তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ বার বার একই মুখ দেখতে দেখতে দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েন; ফলে অভিনেতার কদর বা চাহিদা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। বিখ্যাত ছবি Bicycle thief' এর নায়ক এ ছবিতে নামবার আগে কখনও অভিনয় করেন নি। এই ছবির পরিচালক এঁর মুখ দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দেন। এবং তিনি নায়কের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রচুর অর্থও তিনি উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু ভাল অভিনয় করা সত্বেও পরবর্তী কোনো ছবিতে পরিচালক তাঁকে সুযোগ দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কারণ তাঁর মুখ দর্শকবৃন্দের কাছে এত পরিচিত হয়ে গিয়েছিল যে এবং দর্শকবৃন্দ তাঁকে Bicycle thief-এর নায়ক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে

পারবেন না একথা চিত্র-পরিচালক বিশ্বাস করতেন। যদিও ঐ একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত, তবু কোনো অভিনেতারই খুব বেশী পরিচিত হওয়া এবং বার বার পাদপ্রদীপের আলোয় উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাঁর অভিনয় করার বিশেষ ভঙ্গী দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে যায়। এবং যখন তিনি অন্য ভূমিকায় অভিনয় করেন তখন দর্শক তাঁকে সেই ভূমিকায় সহজে গ্রহণ করে নিতে চান না।

কিন্তু নতুন অভিনেতা যখন অভিনয় করেন তাঁর অভিনয়ের কলা-কৌশল দর্শকের কাছে সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে; যেহেতু তাঁর অভিনয়ভঙ্গীর সঙ্গে দর্শকবৃন্দের পূর্ব পরিচয় থাকে না। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিখ্যাত অভিনেতা Micheal Macliammoier-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর পরিবর্তে যে কোনোদিন অভিনয় করে নি এমন একজন শিল্পীকে অভিনয় করার সুযোগ দিলে ভাল হ'ত। এখানে উল্লেখ্য যে Micheal Macliammoier 'Importance of Being oscar' recital' এর সেই বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপদান করতে গিয়ে চরিত্রটির গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন নি। এটা একটা অদ্ভুত যুক্তি। নৃত্যে যার কোনো দক্ষতা নেই—তার নৃত্য দেখতে কে আর যেতে চায়। বা তাঁর নৃত্যে কেউ কখনও মুগ্ধ হতে পারে? ঠিক তেমনি অভিনেতা যদি স্বকীয় ভঙ্গী পরিত্যাগ করে চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে চরিত্রের আসল রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তবেই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করার পরও তাঁর মুখ কখনই দর্শকের মনে ক্লান্তি আনবে না। বার বার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেও দর্শক তাঁকে সেই ভূমিকায় মেনে নিতে বাধ্য হবেন।

যারা শক্তিমান অভিনেতা, তাঁদের পক্ষেই এটা সম্ভব, কিন্তু যারা সর্বপ্রথম অভিনয় করতে আসেন, তাঁদের প্রথম অভিনয় স্বাভাবিক লাগলেও পরবর্তী অভিনয়কালে তাঁদের অভিনয়ের কলা-কৌশলের অভাব জনিত এবং প্রকৃত স্বকীয় রীতির প্রাধান্য হেতু, বিভিন্ন চরিত্রে ও একই চরিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ যুক্তি অনেকে দেখাবেন, নজির তুলবেন এমনতর

অনেক বিজ্ঞজনের, যাঁরা মনে করেন শিল্পী যে, সে সকল রকমের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন।

বিজ্ঞেরা অনেক কিছু বলেন। কিন্তু বলাটাই সব নয়, শেষ কথাও হ'তে পারে না। একজন অভিনেতা তামাম দর্শকের মন জয় করে নেবার পর তার যে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়—মূলতঃ এই ব্যক্তিত্ব বা ব্যাপক পরিচিতি তার যশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবেই। নতুন একটি নাটকের নায়করূপে যখন তাকে দর্শক দেখে, তখন সে মূল চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না—অতএব সেই জনপ্রিয় অভিনেতার শুদ্ধ কি ভুল interpretationকেই সে সত্য বলে মেনে নেয়। সেটাই তখন তার মনে image-এর সৃষ্টি করে—আপনার কি মনে হয়, এটা ঠিক ?

সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই মান এবং পরিমাণ সম্পর্কে একটি প্রচলিত কথা আছে : তুমি যদি পরিমাণ বাড়াতে চাও তো মানের ব্যাপারে তোমাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হতে হবেই। শিল্পী ঈশ্বর নয় যে, তার সকল শিল্পকর্মই সার্থক হবে। যেহেতু নয়, অতএব আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হওয়া উচিত, অভিনেতা শুধুমাত্র অভিনেতাই হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্রষ্টা হ'তে পারছে — ততক্ষণ পর্যন্ত সে শিল্পীও নয়।

হাঁ, প্রকৃত অভিনেতা যিনি, তার কাছে মূল সত্য হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ এবং তা অবশ্যই। স্যার মাইকেল রেডগ্রেভ বলেন : যদিও চলচ্চিত্র শিল্প প্রকাশের একটি সুন্দর মাধ্যম, তবু নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলব, এই শিল্পরূপ কখনও সৃষ্টিশীল হবার মর্যাদা দাবি করতে পারে না। রঙ্গালয়ের সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, এ-কথা সকলকেই মানতে হবে যে, চরিত্র সৃষ্টি বা শিল্পকর্মকে creation করে তোলা একমাত্র এখানেই সম্ভব। কেবলমাত্র অ্যালেক গিনেস কি স্তেলর ভিন্ন আমি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কোনো চরিত্র সৃষ্টি করার নজিরের কথা উল্লেখ করতে পারি না, কারণ আর কোনো অভিনেতাই চরিত্রকে রূপালী পর্দায় সৃষ্টির পর্যায়ে বাস্তবিক উন্নীত করতে পারেন নি। চলচ্চিত্রে আমি বিভিন্ন সময়ে ইনডোর কি আউটডোর স্যুটিংয়ে এবং দৃশ্যবিশেষে খেয়ালখুশি মতন অভিনয় করে দেখেছি, দর্শকরা সমালোচকরা তার জন্য বাহবা দিতে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু কেন ? অতএব বলি :

প্রকৃত অভিনয়চর্চা, বা অভিনয় প্রদর্শনের একমাত্র উপযুক্ত স্থান হচ্ছে মঞ্চ। মঞ্চে অভিনয় করবার যে সুযোগ আছে, চলচ্চিত্রে সে সুযোগ নেই। টেলিভিসন বা সিনেমায় অভিনয়ের বদলে অভিনয়-স্বাভাবিকতার ওপর লক্ষ্য রাখা হয় বেশী, তাতে অভিনয়ে সংকীর্ণতা আসে। চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির সময় এবং সুযোগ এখানে কম থাকে।

চলচ্চিত্র এবং রঙ্গমঞ্চের পার্থক্যজনিত আমার এই মতের মতন কেবল রঙ্গশালা সম্বন্ধেও কত রকমেরই না মত-পার্থক্য রয়েছে, আশ্চর্য! অনেক বিদগ্ধজনের মতে প্যারিসের মঞ্চ নাকি লেখকদের জন্য, নিউ-ইয়র্কের মঞ্চ পরিচালকদের জন্য, এবং লণ্ডনের মঞ্চ অভিনেতাদের জন্য। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে এর কোনোটাই সত্যি নয়। কেননা, এই তিনটির কোনো একটিকে বাদ দিয়ে কোনো মঞ্চই চলতে পারে না। তা সে পেশাদার মঞ্চই হোক, অথবা অপেশাদার মঞ্চ। পেশাদার মঞ্চে নতুন অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের সুযোগ হওয়া এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার—এটা সর্বত্রই দেখা যায়। অনেকে বলেন, একটা বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে এ-সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পেশাদার মঞ্চে সুযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ নিয়ম বলতে এখানে অভিনেতৃদের দক্ষতার কথা ধরা যেতে পারে। যদি এটাই সাধারণ নিয়ম হয়, তবে এই দক্ষতা অর্জন করবার জন্য বিশেষ একটা বন্দোবস্ত থাকাও প্রয়োজন। এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সেখানে যাতে করে সকলেই বিনা অর্থব্যয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়।

শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিভাবান অভিনেতৃদের খুঁজে বের করতে হ'লে দরকার একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের বা ভিন্নধর্মী নাট্যশালার। এবং এ-ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি থাকলেই চলবে না, প্রতিটি বড় বড় শহরে, নগরে অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। অবশ্য প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে একই রকম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন থাকতে হবে. এ-জাতীয় নাট্যশালায় picture stage সহ একটি auditorium থাকা উচিত; যাতে করে পৃথিবীর সব দেশের সবরকম নাটকই অভিনীত হওয়া সম্ভব। প্রযোজনা ক্ষেত্রে ছোট-খাটো যে সমস্ত সমস্যা আমাদের সামনে ধরা পড়ে proscenium stage এর সাহায্যে সেগুলি যে কত সহজে সমাধান করা যায় তা পর্দা বা দৃশ্যপট ছাড়া

প্রযোজনা দেখলেই বোঝা যায়। সিনেমার ক্ষেত্রে close-up বা cross cutting যতখানি প্রয়োজন, থিয়েটারের ক্ষেত্রে picture-frame stage এর কৌশলটিও ঠিক ততখানিই প্রয়োজনীয়। অনেকের মতে open stage এ অভিনয়কালে দর্শক এবং অভিনেতৃদের মধ্যে যে আন্তরিকতা গড়ে উঠতে পারে, সেটা proscenium stage এ সম্ভব নয়। কিন্তু মাইকেল রেডগ্রেভ বলেন, picture-frame stage এ-ও দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতৃদের এ ধরনের সংযোগ স্থাপন অসম্ভব নয়। পরন্তু নেপথ্যে যে সব শিল্পী, কলা-কুশলীরা থাকেন, তাদের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন সম্ভব। Concrete fore-stage বাস্তবধর্মী নাটকের উপযুক্ত নয়। বৃহৎ মঞ্চ যে কাহিনীর মহিমাকে কতখানি সুন্দর করে তোলে, নাট্যকার Ibsen তা পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং সাধারণ দর্শকবৃন্দও থিয়েটারে এসে stage Illusion দেখতে পছন্দ করেন. এ-কথাটাও তিনি বুঝেছিলেন। বুঝেও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, নাটকের প্রাণ মূলত অভিনেতা তথা চরিত্র রূপকার।

আপনি যদি অভিনেতা হন, তবে একটা কথা সর্বদা আপনাকে স্মরণ রাখতেই হবে যে, যে চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন, তাকে কখনও নিজের মন মানসিকতার সঙ্গে মিশিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না। কারণ নাট্যাভিনয় কথাটার মূল অর্থ হ'ল যাহা সত্য নয়। আর আপনি সেই অসত্য ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত

'এক্সপ্যানডেবল কেসেস'

অনুসরণে

অভিনয় ও অভিজ্ঞতা

মূল রচনা : অ্যালেক গিনেস

অনুসরণে : প্রবোধবন্ধু অধিকারী

সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা এগোয়, আর তারই সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যাচ্ছে তামাম দুনিয়ার সব কিছু। সমাজ বদলাচ্ছে, মানুষ তার অতীতের বাসি জলে নিজের ছায়াটুকু দেখবার জন্য আর সময় দিতে নারাজ। কারণ, আগেই বলেছি, সময় এগোচ্ছে। অতএব মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, বোধবুদ্ধি, উপলব্ধি, ধারণা এবং বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন এসেছে। অতীত সত্যকে সে বলছে সংস্কার; কুসংস্কার ব'লে উপেক্ষা করা হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও হামেশাই দেখছি, শুনছি। যেহেতু মানুষ ও তার মানসিকতা এবং জীবনের মূল্যবোধজনিত বিষয়গুলো দিনে দিনে পরিবর্তিত, বেশির ভাগ বিজ্ঞদের মতে পরিশীলিত হচ্ছে, অতএব শিল্প সংস্কৃতি ও বিবিধ কলার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। যদি এখানে কেউ প্রশ্ন করেন, সেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী কেন? তা হ'লে আমি বলব, শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক যারা তারা নিশ্চয় মনুষ্যেতর জীব নয়। জীবজগতে যেহেতু মানুষ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব— তার বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভবের স্বাতন্ত্র্য, উপলব্ধি ও বোধ আছে অতএব তার চিন্তার জগতে নিত্যি নতুন রূপান্তর ঘটছে। এই রূপান্তরের মূল ক্ষেত্রটি হচ্ছে মন,

অর্থাৎ মানুষের মন। এখন সভ্যতার যতেক অগ্রগমন তাও মানবমন কেন্দ্রিক। কারণ মানুষ ভাবে, চিন্তা করে, এর মধ্য দিয়েই উদ্ভাবণী শক্তির উৎপত্তি হয়। মানুষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে, এবং নতুন কথা তার মনকে সতত পীড়ন করতে থাকে। সাহিত্য বিজ্ঞানে এবং নানাবিধ শিল্পকলা ও সংস্কৃতির অগ্রগমনও মানুষের মাধ্যমে। কারণ এ সবই উদ্ভাবণী শক্তি এবং চিন্তার বিকাশ থেকে আসে। অতএব আমাকে নিশ্চয় এখানে ব্যাপারটা খোলসা করে বলবার জন্য বিজ্ঞানের চরম উন্নতির প্রমাণ কি সাহিত্য সৃষ্টির নজির ও কলা বিষয়ক কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এরূপ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে না যে, সত্যিই এই জগতের সব কিছু নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। তবু যদি আমাকে কেউ শুধোন, তা হ'লে আমাকে বাধ্য হয়েই তাকে বলতে হবে: মশাই, আপনার কি শ্রবণ এবং দৃষ্টি, অনুভব ও উপলব্ধি শক্তি সত্যিই নেই ?

বাক্যের কায়দা না করে, আমি এখানে সোজা করে যে কথাটি বলতে চাই, তা এবার বলছি। আর এখানে আগে থেকেই বলে রাখছি, আমার যুক্তিকে প্রকৃত গ্রাহ্য করে তোলার জন্যে যেটুকু ভূমিকার প্রয়োজন ছিল, এখানে কেবল সেটুকুই বলা হয়েছে। এবার নিশ্চয় আপনি বলবেন, আসল কথাতে আসুন না মশাই। হাঁ আমি আসছি। আমি বলতে চাই, সব কিছুর মতন নাট্যের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরির্তন এসেছে। কী এবং কেমন সেই পরিবর্তন? তবে শুনুন। আপনি, এই বিশ শতকের মানুষ। আপনাকে যদি একটি নাটক রচনা করতে বলা হয়, আপনি নিশ্চয় সেক্সপীয়রের রীতিতে নাটক লিখতে বসবেন না। কারণ, আপনার বাস্তবতার জ্ঞান হয়েছে, আপনি শিল্পকলা সম্পর্কিত সেই পুরনো রীতি পদ্ধতিতে নিশ্চয় আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। বক্তব্য ও যুক্তি বিজ্ঞানের দিক থেকেও আপনার কিছু নতুন বোধ থাকাই স্বাভাবিক। এই যে পরিবর্তন, চিন্তার ভাবনার বলার লেখার —তার আগমন কিন্তু হঠাৎ নয়। ধীরে ধীরে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে, সভ্যতার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এটি ঘটেছে, ঘটবে। আমি নাট্যক্ষেত্রের তুলনা করেই বোঝাতে চাই। কারণ, এই কলারূপ আমার সর্বাধিক পছন্দ।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন, অভিনয়কলার ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এসেছে,

তেমনি মঞ্চস্থাপত্যে, নাট্যসঙ্গীতে, উপস্থাপনা, প্রযোজনায়—আর বেশি তালিকা না বাড়িয়ে বলি, নাট্যের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন প্রয়াস নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এলিজাবেথীয় যুগের যে অভিনয় রীতি, আজ বহু যুগ পরে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে তারই একাধিপত্য চলুক এ কেউ চাইবে না। আর চাইলেই দর্শক তা গ্রহণ করবেন এমন কথা অতি সত্যবাদীর পক্ষেও জোর গলায় বলা সম্ভব নয়। নাট্যের সঙ্গে যদি জীবনের যোগ থাকে, নাট্য যদি মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত হয়, এবং সবার ওপরে মানুষ সত্য এ-কথা যদি নাট্যকলা স্বীকার করে, তবে সমাজ, মানুষ আর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার অগ্রগমন ঘটবেই। ঘটাটাই স্বাভাবিক।

আদিকাল থেকে ধরলে, নাটকের অগ্রগতির ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। এ-পর্বগুলো প্রকৃতপক্ষে এক একটি অধ্যায়, নাট্য-চিন্তার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত। আমি খুব অতীত যুগে যেতে চাই না। মোটামুটি এ কালের কথাও যদি বলি, তবে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্ব-কালের নাট্যসত্তা, নাট্যরীতি থেকে শুরু করতে হয়। এটি এক অধ্যায়। যুদ্ধ পরবর্তীকাল আর একটি। শেষের, অর্থাৎ আধুনিক পর্বের সূত্রপাত ষাট সালের পর থেকে। আপনারা হয়তো বলবেন, তোমার কাছে আমরা অভিনয় সংক্রান্ত বিষয় জানতে চাই, শিখতে চাই। আমি আপনাদের কিছু শেখাতে পারব কিনা জানি না, তবে এ-ক্ষেত্রে আসার পর, দীর্ঘকাল এই শিল্প-কলা চর্চার অভিজ্ঞতা থেকে সবিনয়ে কিছু কথা বলতে চাই। এর তাত্ত্বিক দিকে আমি যাবো না, যা দেখেছি, দেখছি; যা বুঝেছি, বুঝছি সেটুকু যদি আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি, আমার বিশ্বাস, এই কথাগুলো স্মরণ রাখলে যে কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী এবং পরিচালক প্রযোজক উপকৃত হবেন।

কী করে অভিনয় শেখা যায়, কী করে অভিনেতা হওয়া যায়? এ প্রশ্ন যদি আমায় কেউ করে, তা হ'লে আমি বলব, এর আসল সত্য হ'ল উপলব্ধি। দ্বিতীয় সত্য অভিজ্ঞতা। এই উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ একটি সম্পর্ক আছে। এঁরা একে অন্যটির সাহায্য ভিন্ন অসম্পূর্ণ। ধরুন, আপনার

উপলব্ধি আছে, আপনি সব বুঝতে পারেন, ধরতে পারেন, কিন্তু ওটুকুই কিছু করা বা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। আপনি যখন সেই বোধকে, সেই অনুভব উপলব্ধিকে প্রকাশ করবেন, তখন অভিজ্ঞতাই হবে আপনার সহায়। ধরা যাক, এমন একটি মানুষ, যাকে জন্মের পর মানুষের এলাকা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাকে যদি মানুষের স্বাভাবিক আচরণ করতে বলা হয়, এ-কথা কেউ বলবেন না নিশ্চয়, তিনি হুবহু সে আচরণ করতে পারবেন। কেন পারবেন না? তার কারণ, অভিজ্ঞতার অভাব। আর একটি কথা আমি বলছি। ধরুন একজন লোক কৈশোরকাল থেকে এমন একটি এলাকায় বাস করছিল, যেখানে সে কোনো মানুষকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখে নি। অর্থাৎ তার জগতের কোনো মানুষ কখনও দেহত্যাগ করে নি। সেই লোকটির যদি পিতৃবিয়োগ ঘটে, কিংবা অত্যন্ত নিকটাত্মীয় ধরনের কেউ গত হন, তবে তার মনে শোকের সৃষ্টি হবে কি? দুঃখ বা বেদনা হয়তো বা হতে পারে, কিন্তু খুব সম্ভব তার যে প্রকাশ হবে, সেটি স্বাভাবিক সত্যকে কখনই মেনে চলতে পারে না। সেই লোকটির সে অপারগতা এখানে প্রমাণিত হবে, সেটিই অভিজ্ঞতার অভাব।

সাধারণভাবে জীবন যাপন করবার জন্যে হয়তো একটি মানুষের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সে যখন শিল্পী তখন তাকে সব জানতে হবে। মূর্খ বা নির্বোধের এ-বিষয়ক কোনো সমস্যা নেই। মোটামুটিভাবে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের তিনটি যুগের সঙ্গে জড়িত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমার কিছু বলার কথা আছে। সে কথা হাল আমলের, অর্থাৎ এ-যুগের অভিনয়কলা সম্বন্ধে। বলাবাহুল্য সেই কথাগুলো কোনোরকম আক্ষেপ থেকে বলা নয়, এ-গুলিকে আমি অভিযোগ বলব। অভিযোগগুলি সাজালে মোটামুটি এমন দাঁড়ায়:

(ক) আধুনিক অভিনয়রীতি সবক্ষেত্রে লজিক মেনে চলছে না।

(খ) আধুনিক অভিনয়রীতি উগ্র আধুনিকতার মোহে তীব্র মোহগ্রস্ত, বিভ্রান্ত। সে স্বীকার করে না, দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে পায়ের নীচে মাটির প্রয়োজন আছে।

(গ) এ-কালের অভিনয়ে অভিজ্ঞতা নামক কথাটাকে প্রতিনিয়ত মূল্যহীন, অর্থহীন করার এক ষড়যন্ত্র চলছে।

(ঘ) বর্তমানকালে অনেক অক্ষমকে সক্ষমের মিথ্যা সাজে সাজিয়ে চালানো হচ্ছে।

অর্ধ মুখোসে সজ্জিত সমকালীন অভিনেতা

(ঙ) যুদ্ধ পরবর্তীকালের অভিনয় কলার অগ্রগতির ক্ষেত্রে, 'অভিনয়' মূলতঃ নিগৃহীত ও অবহেলিত হচ্ছে। এবং যান্ত্রিক কুশলতার অনমনীয় হাত ক্রমশ মঞ্চের সকল অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বিভ্রান্ত করছে দর্শককে।

মোটামুটি এই পাঁচটি প্রশ্ন রাখা হ'ল। এবার কেন এই অভিযোগ তোলা হ'ল, বা এর সত্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব।

আমার প্রথম অভিযোগ বর্তমান অভিনয়-পদ্ধতির ক্ষেত্রে লজিকের অভাব। হ্যাঁ, অভাব আছে। নব্যরীতির অভিনয়-প্রয়াস ব্যাপকতা পাবার পর একেবারে হাল আমলের অনেকগুলি নাটক আমি দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো অভিনয়ই প্রায় আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নি। এই না পারার কারণ, স্বাভাবিকতা কথাটার চালুর মধ্যে লুকনো আছে। অভিনয় যে একটি বিশিষ্ট কলা, এবং এটি সৃষ্টি তাকে অস্বীকার করে, এখন যার যেমন খুশী অভিনয় করে যাও এটিই নাকি স্বাভাবিক পদ্ধতি, অর্থাৎ স্বভাবজ অভিনয়। যেমন খুশি শিল্পীরা মঞ্চে আসছেন, নাটকের সংলাপগুলি গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন—গলার কাজ নেই, তার ওঠা নামা নেই, অভিব্যক্তি চলাফেরা সব কিছু অবাস্তব অযৌক্তিক। আমি এখানে যে লজিকের কথা বলছি, সেটি জীবনের লজিকের চাইতেও বড়, একে বলব অভিনয়ের লজিক। কিছুদিন আগে আমি একটি নাটক দেখে বিস্মিত হই। ও নাটকের যিনি নায়ক, তিনি হাল আমলের জনপ্রিয় শিল্পী, আধুনিক অভিনয়-পদ্ধতি প্রচলনের অন্যতম নেতা স্বরূপ। এই অভিনেতা তার অভিনয়কালে যদৃচ্ছ ব্যাপার করে গেলেন। অর্থাৎ যা তার মনে হ'ল, তিনি তাই করে গেলেন। অভিনয় শেষে তার সঙ্গে আমার যে বাক্যালাপ হয়েছিল, তার অংশত আমি উল্লেখ করছি :

১.

আমি॥ আপনাদের অভিনয় দেখলাম।

নায়ক॥ কেমন হ'ল?

আমি॥ ভাল না।

নায়ক॥ কেন?

আমি॥ কারণ অনেক। তার মধ্যে প্রথমে আমার যে-কথাটা মনে হয়েছে, তা হ'ল আপনাদের অভিনয়, মূল নাট্যরীতিকে অনুসরণ করে চলে নি।

নায়ক॥ হ্যাঁ চলে নি। কারণ প্রথাগত রীতিতে আমরা অবিশ্বাসী।

আমি॥ অর্থাৎ……

নায়ক॥ যা কিছু প্রচলিত আমাদের জেহাদ তার বিরুদ্ধে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাজানো গোছানো ব্যাপারটাকে আমরা ঘৃণা করি।

আমি॥ আপনাদের বক্তব্য তা হ'লে কি?

নায়ক॥ বক্তব্য না, বলুন আমাদের লক্ষ্য। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যদি নাটকের প্রাণবস্তু, তবে বলাই বাহুল্য, তা কখনও সাজানো গোছানো সুন্দর হতে পারে না; স্বাভাবিকতা কোথাও আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতাই হ'ল জীবন।

আমি॥ নাটক জীবনের স্থিরচিত্র এটাই তা হ'লে আপনাদের বিশ্বাস?

নায়ক॥ ঠিক তাই।

আমি॥ তা হ'লে আমার কিছু বলার থাকে না। তবু একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। মঞ্চের তথা থিয়েটারের একটা নিয়ম আছে, তার আইন-কানুন, লজিক প্রভৃতি অনেক কিছু। আমি ভেবে পেলাম না, আপনাদের নাটকে যার ভেতর বাড়ি থেকে মঞ্চে ঢোকার কথা সে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকছে। এবং আপনিও কতবার বাইরে যাবেন, এ-রকম সংলাপ ব'লে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেতর বাড়ীতে যাবার দরজা দিয়ে ঢুকলেন।

নায়ক॥ ওটা খুবই স্বাভাবিক।

আমি॥ কোন অর্থে বুঝতে পারছি না!

নায়ক॥ সব কিছুর মধ্যে অর্থ খোঁজা মানুষের খারাপ অভ্যাস। জীবনটা মশাই একটা মানে বই নয়।…আপনার স্ত্রী কি জীবিত আছেন?

আমি॥ এ প্রশ্ন করছেন কেন হঠাৎ?

নায়ক॥ কারণ এটাই স্বাভাবিক। এরও কোনো মানে নেই।

আমি॥ হ্যাঁ, আছেন।

নায়ক॥ আপনার সন্তান-সন্ততিদের কেউ কি মারা যায় নি?

আমি॥ গিয়েছে। আমার দ্বিতীয় সন্তান। মেয়ে।

নায়ক॥ তার মারা যাওয়ার মানে কি?

আমি॥ এর মানে হয় না।

নায়ক॥ ঠিক তেমনি, জীবনের কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই। সেই কথাটাই আমাদের মূল বক্তব্য, বা বলতে পারেন, লক্ষ্য।

আমি॥ আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?

নায়ক॥ থিয়েটারে।

আমি॥ এই থিয়েটার কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

নায়ক॥ এই রাজ্যের ওপর।

আমি॥ রাজ্যটা কী দিয়ে গড়া?

নায়ক॥ বাড়ি ঘর ইট পাথর চুণ বালি গাছপালা নদনদী মানুষ পাখি জন্তু জানোয়ার বাতাস রোদ জ্যোৎস্না…

আমি॥ বলুন মাটি……

নায়ক॥ নিশ্চয়।

আমি॥ এ মাটি কার তৈরি?

নায়ক॥ প্রকৃতির।

আমি॥ মানলুম। কিন্তু মাটি আছে বলেই পৃথিবী আছে একটা সত্য?

নায়ক॥ মূর্খরাও অসত্য বলে না।

আমি॥ তা যদি হয়, তবে ঠিক মাটির মতন, নাটকের মাটি হ'ল এর

আদি তত্ত্ব রীতি সংজ্ঞা ও সত্য। এবং আজকে তারই ওপর আপনারা আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।

নায়ক ॥ মানতে পারি না।

আমি ॥ কেন?

নায়ক ॥ কারণ নীতি-ফীতি সবটাই সংস্কার। আদিকাল থেকে যদি নাটককে কবিতা, কবিতাকে নাটক, গল্পকে প্রবন্ধ, প্রবন্ধকে রম্যরচনা বলা হ'ত তবে আজকে আমরা তাই বলতাম। সেকালের লোকদের শিক্ষাদীক্ষা কম ছিল, অত তলিয়ে মশাই ওরা ভাবেন নি। ভাবেন নি বলেই আজ আমাদের প্রত্যেকটি ব্যাপরে খুঁটিয়ে প্রকৃত অর্থ করে বিচার করতে হচ্ছে।

আমি ॥ আপনার কথা শুনে শিক্ষার ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়। আমার কিন্তু মনে হয়, আগেকার মানুষরা আপনাদের চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত ছিলেন।

নায়ক ॥ অনেক রকমের উন্মাদেরা এ-কথা বলেন।

একথা শোনবার পর, কোনো মানুষই সম্ভবত এমন লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করার ব্যাপারে আর আগ্রহী হতে পারেন না। আমিও পারি নি।

আপনারা কিন্তু এ-কথা মনে করবেন না, শুধুমাত্র এই লোকটির ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে আমি অভিযোগ তুলছি। বরং আমি এখানে অকপটে স্বীকার করছি যে, আজকের থিয়েটারে সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁদেরই, যাঁরা গত কয়েক বছরের মধ্যে নতুন অভিনেতা ও পরিচালক অথবা প্রযোজক হিসেবে এ-পথে এসেছেন। আজ অস্বীকার করার উপায় নেই, আজকের মঞ্চ কতরকমেরই না যন্ত্রে সজ্জিত। মঞ্চস্থাপত্যের কাজে গত কয়েক বছরে এমন অনেক শিক্ষিত এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এসেছেন, যাঁদের সুচিন্তিত সৃষ্টিকর্মের জন্য আমরাও নিজেদের গর্বিত বোধ করি। নাট্যপ্রযোজনা ও উপস্থাপনার ব্যবস্থাও এখন অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত হতে পেরেছে, যে-কথা স্বীকার না করলে অপরাধ করা হবে। এখন দৃশ্যপট পরিবর্তনের কাজ, কিংবা বিশেষ কোনো দৃশ্যগঠনের কাজ আগের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হ'তে পারে।

কিন্তু এগুলিকে আমি একটি প্রবীণ অথচ বিশাল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বলে মনে করি।

আমি নিজে বিশ্বাস করি নাট্যাভিনয় এক বিশাল মহীরুহের মতন। তার মূল হ'চ্ছে নাটক, কাণ্ড অভিনয় বা টিমওয়ার্ক, শাখা প্রশাখা নাট্য-প্রযোজনার অন্যান্য অঙ্গ। অবশেষে সব কিছুর যোগ্য ও যথার্থ সংমিশ্রণে যে effectএর সৃষ্টি তাই হ'চ্ছে, সে গাছের ফল। অতএব আমার বিশ্বাস মতন চলতে গিয়ে প্রায় আমাকে হোঁচট খেতে হয়। এই দশকের অধিকাংশ অভিনয় দেখার পর প্রায়ই আমাকে হতাশ হতে হয়েছে। কারণ, যারা আজকের চরিত্র-শিল্পী তাঁদের মধ্যে অভিজ্ঞতার অভাব অত্যন্ত বেশি। ধরুন আপনি কোনো এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। আপনার জন্ম এমন জায়গায় ও এমন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে যে, জীবনে কখনও কোনো জমিদারের সঙ্গে কদাচ আপনার পরিচয় হয় নি। এবার আমার প্রশ্ন : কী করে সেই জমিদারের চরিত্রটিকে আপনি সত্য করে তুলতে পারেন? পারা কঠিন। কারণ, এ-বিষয়ে আপনার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তবু আপনাকে সেই বিশেষ ভূমিকা যদি অভিনয় করতে হয়, তবে আপনার দেখা কোনো নাটকে জমিদারের চরিত্র, কিংবা চলচ্চিত্রে দেখা এরকম কোনো ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে এগোতে হবে। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে, আপনার দেখা সেই সব ভূমিকাগুলি জমিদার হ'লেও, আপনি যে চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন, সেই জমিদারের চরিত্রসত্য সম্পূর্ণই আলাদা। তা হ'লে আপনার করণীয় কী? আপনি বলবেন, এখানে পরিচালকের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয়। তা হ'লে আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি আমি। আচ্ছা, মশাই, আপনি কি মনে করেন, প্রতিভাহীন মানুষ কেবল শিখে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন? আমার মনে হয়, সমস্ত ভাল অভিনেতারাই মোটামুটি একই পথে হেঁটে এসেছেন। আপাত চোখে এঁদের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও, অভিনয়ের অন্তর্লোকে এঁরা এক এবং অভিন্ন।

আজকের স্বভাবজ অভিনয় দেখতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি পূর্বপুরুষ থেকেই জমিদার ছিলেন, এমন পরিবারের একাধিক চরিত্রের অভিনয়ে হালের

অভিনেতারা কী পরিমান হাস্যাস্পদ হয়েছেন। প্রতি ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে আরব্য রজনীর সেই গল্পে একদিনের সুলতানের মতন অবস্থা এদের। কিংবা বলতে পারি, অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছে, রাস্তা থেকে কোনো ভিখিরিকে ধরে এনে যেন জমিদার সাজানো হয়েছে। হায়, অভিনয়ের একি করুণতম হাল!

অতএব, অতএব আমি বলব, নাটকে আপনার চরিত্রটি কী আগে তা বুঝে নিতে হবে আপনাকে। যদি কোনো জমিদারর চরিত্র হয়, তবে তার সম্ভ্রম-বোধ, থাকবেই। সেই সঙ্গে সবচেয়ে দামী যে অংশগুলো, যেমন ধরুন, সে শিকারে যাচ্ছে ব্রীচেস পরে, শুতে যাচ্ছে শোবার পোষাক পরে, খেতে যাচ্ছে ডিনার জ্যাকেট পরে ইত্যাদি। আপনাকে প্রথমে জানতে হবে কোন পোষাক যেমন করে সঠিকভাবে পরতে হয়। এখানে বলে রাখি, নাটকের একটি বিশিষ্ট সত্য হ'ল পোষাক অনুপাতে মানসিকতার পরির্বতন। যদি বুঝতে না পারেন তার জন্য সহজ করে বলছি, মুলত নাটকের চরিত্রগুলো অনেকটাই পোষাক নির্ভর। একটা উদাহরণ শুনুন, কোনো এক কপট ব্যক্তি জমিদার সেজে লোককে ভাঁওতা দিতে গিয়ে ধরা পড়ল, তার জেল হ'ল—সে কয়েদী হ'য়ে কিছুকাল থাকল। পরে, সে ছাড়া পেয়ে একটা কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিয়েছিল। ধীরে ধীরে দেখা গেল এই লোকটিই সেই কারখানার মালিক হ'য়ে গিয়েছে। এখন এই যে লোকটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ছে, নাটকে সেই পড়াটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। তা তুলতে হ'লে আপনি যদি সৎ লোকও হন, তবে আপনাকে কপট মানুষের মন মানসিকতা হাবভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে যেমন, তেমনি কয়েদি, শ্রমিক, মালিকের চলাফেরা আচরণ ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে যদি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তবে আপনার অভিনয় মাঠে মারা যাবে। ভেবে দেখুন, আপনি হুবহু টমেট্যোর মতন মুখাবয়ের অধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাসুবাবু। আপনি লোক একটাই। অথচ একই নাটকে, কেবল পোষাক বদলের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে আপনাকে পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। এ-পরিবর্তন কি অভিজ্ঞতা ছাড়া সফল হ'তে পরে? পারে না।

হাল আমলের এক নাটকে আমি একটি প্রেমদৃশ্য দেখেছিলাম। প্রেমিক-প্রেমিকা সঙ্গোপনে মিলেছে এক নির্জন জায়গায়। নায়ক এক কোটিপতি, নায়িকা অত্যন্ত দরিদ্র এক ব্যক্তির স্ত্রী যিনি অভাব থেকে মুক্তি চান। কিন্তু আগাগোড়া দৃশ্যটি দেখে মনে হ'ল, নায়ক এক সর্বহারা ব্যক্তি, মহিলা কোনো সম্রান্ত পরিবারের বধূ নয়, অবিবাহিতা কন্যা। নাট্যকার মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। তার কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম, এই নায়কটি বাল্যজীবন থেকেই কারখানার শ্রমিক। মহিলা, সত্যি সম্রান্ত ঘরের কন্যা। ব্যাপারটা তখন ধরা পড়ল। কোটিপতি মানুষ কি, লোকটি জানে না, দেখে নি। আর মহিলার অবস্থাও তথৈবচ। বড় লোকের ঘরের কুমারী মেয়ে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা তার একেবারেই নেই।

প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা সময়সাপেক্ষ। আমি যে কথাগুলো বলতে চাইছি, আশা করব, প্রত্যেকেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা। এ-জগতের সকল রকমের মনুষ্য, সহস্র রকমের পরিস্থিতি বা পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা নেই, সে কখনও সৃষ্টিশীল অভিনেতা হ'তে পারে না। আপনার পিতা যখন মারা গেছেন, তখনকার কান্না, নিশ্চয় আপনার স্ত্রীবিয়োগের কান্নার মতন, কিংবা সন্তানসন্ততি কি দূর সম্পর্কের আত্মীয় বিয়োগের মতন এক হ'তে পারে না। হাসি চলাফেরা, ভয়, আবেগ সব ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য। সুতরাং আমি বলব ভাল অভিনেতাকে আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

'ক্র্যাফ্ট মিস্‌ড আপ লট'

অনুসরণে

অভিনয় : প্রকৃতি বিচার

মূল রচনা : উইলিয়ম জিলেট
অনুসরণে : রমেন লাহিড়ী

নাট্য অন্তর্গত বিষয়ের একটি বিশেষ অধ্যায় প্রসঙ্গে আজ আমি কিছু বলতে চাই। নাটক ও তার অভিনয়—মোটামুটি এই সামগ্রিক ব্যাপারটিকেই আমি 'নাট্য'-এর অন্তর্গত বিষয় বলে ধরে নিচ্ছি। আর নাট্যাভিনয় বলতে আমি বোঝাতে চাই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকে যা সাধারণতঃ আমরা উপস্থাপিত হ'তে দেখি রঙ্গগৃহে ; রঙ্গগৃহের বাইরে দর্শক-পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে, এমন কি সময় সময় উন্মুক্ত অঙ্গনতলেও।

'বলতে চাই' বলা যত সহজ 'আসলে বলা' তত সহজ নয়। বিশেষ করে নাট্য বিষয়ে। এর চেয়ে কোনও বিশেষ ওষুধের কার্যকলাপ বোঝানো বা ভূমি সমস্যা সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করা অথবা কাব্যরোগের জীবাণু কেমন করে চিরতরে দূর করা যায়, অবশ্যই কবি মানুষটিকে হত্যা না করে, সেই বিষয়ে কোনও নবতম আবিষ্কার সম্বন্ধে বলতে হ'লেও আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম। কারণ তাতে করে আমার মনে অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা থাকত যে, আমি আমার কাজের দ্বারা প্রকারান্তরে জগতের কিছু হিতসাধনই করছি। কিন্তু নাট্যের জগতের কোনও কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা যে আমার নেই—এ

বিষয়ে আমি খুবই সচেতন। সম্ভবতঃ এ ক্ষমতা কারো নেই। থাকেও না এবং থাকার কথাও নয়। কারণ নাট্য বিষয়ে আজ অবধি কম কথা বলা বা লেখা তো হয় নি। তবু আলোচনার দ্বারা নাট্যের মূলগত প্রকৃতি ও চরিত্রের বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটানো সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি না। অন্ততঃ সমগ্র পৃথিবীর নাট্যের ঐতিহ্য এই কথাই বলে।

নাট্যের ঐতিহ্য বলতে আমি বোঝাতে চাই, নাট্যের আদি থেকে অদ্যতক ভাবিত, লিখিত, ভাষিত, চর্চিত এবং বিশ্লেষিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্তকে, যে ইতিবৃত্ত প্রকারান্তরে নাট্যীয় তথা নাট্যানুসারী আমাদের সকল অতীত ঐতিহ্য ও কাযকলাপের একটি ধারাবাহিক রেখাচিত্র।

এই ইতিবৃত্ত বা অভিব্যক্তি তথা সংযোজন ও অভিযোজন ধারাতেই নিবদ্ধ রয়েছে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্যের তথ্য-সম্ভার। তাই বলি, যত কিছু আমাদের নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা, বা অভিনব গবেষণা এর সবই আসলে অতীতের মধ্যে। অতীতে বর্তমান অথচ বর্তমানে অতীত সেই অভি-ব্যক্তির ইতিহাসের অধুনাতম প্রযোজনা বা পুনরাবিষ্কারের প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নয়। কিছু জানতে বা বুঝতে হ'লে, কিছু উপলব্ধি বা শিক্ষা করবার প্রয়োজন বোধ করলে—অতীত কীর্তিকলাপের দিকে আমাদের চোখ ফেরাতেই হবে, আমাদের চেয়ে বয়োবৃদ্ধদের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুশাসনগুলিকে সতর্কভাবে অনুধাবন করতেই হবে। কিন্তু এই আস্তিক্য ধারণারও উর্দ্ধে ইতিবৃত্ত সমূহের এমন এক একটি বিশেষ পর্যায় বা ধারা রয়েছে, যেগুলি সম্পর্কে আমরা প্রায়শই নির্বিকার থাকতে চাই, অথচ সেগুলি সম্পর্কে কিছুটা অভিনিবিষ্ট পর্যালোচনাও আমাদের অজ্ঞতার লজ্জাকে বহুলাংশে দূর করতে পারে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই যে অধ্যায়টি আমাদের অবহেলা ও অবজ্ঞার ফলে ক্রমশঃ বিকৃতির এবং কিছু পরিমাণে বিলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সেই অধ্যায়টিকেই আমি বলব 'মৃত ইতিহাস'—মৃত, কারণ ইতিহাসের এই অবজ্ঞাত পর্যায়টি আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিধির বাইরেই ফেলে রেখেছি আমরা। আর এই কৌতূহলোদ্দীপক অথচ হতভাগ্য পর্যায়টিকে যদি মুহূর্তের

জন্যেও হাজির করা যেত আমাদের সামনে তাহ'লে দেখা যেত' নাট্য প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বসূরী যতেক জ্ঞানীগুণী মণীষীর যাবতীয় চিন্তা ও আলোচনার কোন ইতিবৃত্ত সেখানে ধরা রয়েছে। সেই ইতিবৃত্তই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিত, তথাকথিত 'বুদ্ধিমান'দের সকল অনুমান ও অনুসিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে নাট্য আজও আপন অন্তর-প্রকৃতির 'নিজস্বতায় সম্পূর্ণ অমলিন, অকলুষিতই রয়ে গেছে। মানস সরোবরের হংসের মতন নাটক তার পিঠের ওপর আলোচনা সমালোচনা বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতম ও অবিরাম বর্ষণকে অকাতরে সহ্য করেছে কিন্তু সেই অবিরাম বর্ষণের দ্বারা আপন স্বভাব ধর্মকে সিক্ত তথা বিভ্রান্ত হ'তে দেয়নি।

তাই বলছিলাম, নাট্যের জন্যে নতুন করে কোনও কিছু করার সাধ্য আমার নেই। সে চেষ্টাটাও হবে নিছক দুশ্চেষ্টা! তবে এটাও ঠিক, নাট্যের মঙ্গল যেমন আমি করতে পারব না, তেমনি তার অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। সোজা কথায় যতই কিছু বলি না কেন, তা শুধু বলাই হবে। তার দ্বারা কাজ হবে না কিছুই। তবু যেহেতু আজ আমাকে কিছু একটা করার দুঃসাধ্য প্রয়াস পেতেই হবে, সেই হেতু, একজন কর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নাট্যের একটি বিশেষ গোলমেলে ও বিভ্রান্তিকর পর্যায় সম্পর্কে দু'চার কথা বলার চেষ্টা করব। জানি, সেই বলাও যথেষ্ট নয় এবং আপনাদের অভীপ্সা সম্পূর্ণাঙ্গ হবে না বলেই আপনারা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। তবু সেই একটু কিছু বলা-ই আমার কাছে অনেক কিছু করার মতন হবে—এটুকু সান্ত্বনা আমার থেকে যাবে।

২.

ঠিক কাজটি ঠিক পথে শুরু করতে পারার একটা আনন্দ আছে, আর মানুষ যখন তার জীবন সাধনার মূলগত প্রত্যয়টিকে আগে থেকে উপলব্ধি করতে পারে, যে কাজে সে আত্মনিয়োগ করতে চায় তার স্বরূপটিকে তার বিভিন্নতাকে ও তার সীমাবদ্ধতাকে সহজবুদ্ধির আয়ত্বে আনতে পারে, তখনই সে সক্ষম হয় নিজের সকল কর্মোৎসাহকে সঠিক পথে চালিত করতে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত হ'য়ে কাজ করবার যে সুবিধে, শিল্পের বা জীবিকা অর্জনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের রয়েছে। আমরা, যারা মঞ্চজগতকে অধিকতর আকর্ষণীয় করবার জন্য প্রাণপাত করে চলেছি, সেই সুযোগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সেই সুযোগ থেকে আমরা যে শুধু বঞ্চিতই তা নয়, আমাদের কাজের প্রসঙ্গে এমন সব নির্বোধসুলভ, হাস্যকর ও অর্থহীন আলোচনা ইত্যাদি হ'য়ে থাকে কাগজে কাগজে—যার ঠেলায় আমরা কাজ করতে নেমে আরও হাজারগুণ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। এমন কি নাট্যকর্মের অতি সাধারণ বিভাগগুলিরও যে সব সংজ্ঞা চালু করা হয়েছে, তা যেমন বিচিত্র তেমনই গোলমেলে। যেমন ধরুন 'মেলোড্রামা' কথাটা। এর শব্দার্থ করলে দাঁড়ায় "সাঙ্গীতিক নাটক"। কিন্তু মেলোড্রামা বললে আমরা কদাচ কি "সাঙ্গীতিক নাটক" বুঝি ? সত্যি বলতে কি, মেলোড্রামা বলতে সঠিকভাবে কি যে বোঝায় তা আজও কেউ আমার কাছে প্রাঞ্জল করে বলতে পারেন নি। স্বল্পবুদ্ধি বাক্যবাগীশরা মেলোড্রামা কি তা না বুঝেই এ সম্বন্ধে অনেকে গালভরা কথা বলে থাকেন। তাদের কথা আমি ধতব্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু যথার্থ প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ অনেককে এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছি আমি, কিন্তু তাঁরাও কেউই এর কোনও নিশ্চিত সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারেন নি। তারপর ধরুন, আর একটা শব্দের কথা—ড্রামা অর্থাৎ নাটক। এই শব্দটির আগে "মেলো" বসানো নেই। যে কোনও রীতি প্রকৃতির, যে কোনও অভিনয়কেই সমালোচকরা 'নাটক' বলে অভিহিত করে থাকেন। বলা বাহুল্য এটা একটা খামখেয়ালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আছে 'কমেডি'। কোনো কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধরনের লঘু ওজনের হাস্যরসাত্মক নাটককেই 'কমেডি'র অন্তর্গত বলে উল্লেখ করে থাকেন। শব্দার্থ পুস্তকগুলিও তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে। আবার একদল আছেন, যাঁরা বলেন, যা কিছু ট্রাজেডি বা ফার্স-এর অন্তর্গত নয়, তা গুরুগম্ভীর ভাবেরই হোক বা অন্য যে রকমেরই হোক না কেন—তাই-ই কমেডি। ফার্স বা প্রহসন শব্দটির উৎপত্তি ফোর্স বা স্থূল প্রক্রিয়া থেকে। অর্থাৎ যত রাজ্যের অদ্ভুত ও অসম্ভব উপাদানের স্থূল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে যে রসের উৎপাদন হয় তাই ফার্স বা প্রহসন। অথচ আমরা

যারা প্রায়শই প্রহসন নাটকে অংশ গ্রহণ করে থাকি, ভাল করেই জানি, জীবনের সঙ্গে বিশ্বস্ত সংযোগ না রেখে প্রহসন নাটক যদি লেখা ও অভিনয় করা হয় তাহ'লে এর সবটাই অহেতুক ও অসার প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। অর্থাৎ, যেনতেন প্রকারেণ, যা হোক একটা কিছু খাড়া করলেই সেটা প্রহসন নাটক হ'য়ে ওঠে না। তারপর স্মরণ করুন আরও একটি বহু ব্যবহৃত শব্দের কথা—"প্লে" (Play) বা "অভিনয়"। যে কোনও ধরনের নাটকীয় ক্রিয়া কলাপই অভিনয়ের এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল এবং গোলমেলে। এই জটিলতার জঞ্জাল থেকে নাট্যকে উদ্ধার করে তাকে আমাদের সুবিধামত কাজে লাগাবার জন্যে নাট্যের দুটি শ্রেণী বিভাগ আমরা করে নিয়েছি :

এক : ড্রামা বা নাটক।

দুই : আদার থিংস বা অপরাপর বিষয়।

আমাদের অভিধানে নাটক বলতে বোঝায় মানবজীবনের অভিজ্ঞতার চিহ্নবাহিত যাবতীয় অভিব্যক্তির মঞ্চায়িত প্রকাশ মাধ্যম। এর বাইরের আর যা কিছু তা সবই ঐ অপরাপর বিষয়ের অন্তর্গত।

আমাদের মতে নাটক তখনই যথার্থ অর্থে নাটক হয়ে ওঠে অর্থাৎ নাটকের উদ্দেশ্য সাধনে সার্থকতা লাভ করে, যখন তা মনুষ্যজীবনের দুঃখ সুখের, চাওয়া পাওয়ার, আশা নিরাশার কাহিনীকে, মনুষ্য চরিত্রের ভাল মন্দ সকল দিকের বিশেষত্বকে এক কথায় মানুষের অস্তিত্বের সত্যকে বিশ্বস্ত প্রত্যয়ের ঔজ্জ্বল্যে মূর্ত করে তুলতে পারে। বিয়োগান্ত, মিলনান্ত অথবা লঘুগুরু নাটকের এই সব অভিধাগুলো তখন আর কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে না।

ভাষা, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বাহ্যিক ও আঙ্গিক বিবিধ প্রকরণের সাহায্যে মানুষকে উদ্দীপিত, শিহরিত, রোমাঞ্চিত, আমোদিত করার আর সকল প্রচেষ্টাকে, জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণের সূত্রে যা সংযুক্ত নয়, আমি ঐ অপরাপর বিষয়ের অন্তর্গত ব্যাপার বলে মনে করি। এই অস্বাভাবিক

বিষয়গুলিকে যদিও সময় সময় নাটকের রূপেই উপস্থিত করা হয়, তবুও এগুলিকে যথার্থ অর্থে নাটক বলা চলে না। অত রঙচঙে, অত কৃত্রিমতায় ভরপুর, অত চূড়ান্ত ও পরিপুর্ণ বিকৃত চিন্তা ও চরিত্র চিত্রণ কখনই জীবনসঙ্গত হ'তে পারে না।

নাটকের এই শ্রেণী বিভাগ যদিও আমরা নিজেদের স্বার্থেই করে থাকি বলেছি, আসলে কিন্তু এ-কথা সত্য নয়। এটা একটা চিরাচরিত ব্যাপার। চিরকালই এক শ্রেণীর দর্শক আছেন, যাঁরা উন্নত চরিত্রের নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন এবং তাঁদেরই চাহিদা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যুগে যুগে দৃশ্যকাব্য তথা নাটকের এই বিবর্তন ও বিশেষত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাঁদের এই চাহিদা যে বিশেষ কোনও তত্ত্ব, জীবনদর্শন বা আদর্শকে আশ্রয় করে রূপ নেয় —তা নয়। এমন কি সম্ভবতঃ তাঁরা নিজেরাও জানেন না, তাঁরা যা চান তা কেন চান? তবুও সেই উন্নত রুচির নাটকের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের সম্মিলিত ও আন্তরিক চাহিদার তাগিদেই ধীরে ধীরে নাটকের সংজ্ঞার এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। মানুষের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে তাল রেখে টিকে থাকার ও এগিয়ে চলার চিন্তা চেতনাকে আশ্রয় করেই নাটককে আরো জীবনানুগ ও বাস্তবমুখীন চরিত্র গ্রহণ করতে হয়েছে।

দয়া করে কেউ মনে করবেন না যেন, নাটকের ঐ সংজ্ঞার স্বপক্ষে ওকালতি করবার জন্যেই এত কথা বলছি। যুগে যুগে নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নাটক আজ যে সংজ্ঞা লাভ করেছে, আমি সেই দিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি মাত্র। কারণ, নাটক আজ আর শুধুমাত্র অভিনীতিব্য বস্তুই নয়, আমাদের সকল ভাবনা বাসনার একটি চমৎকার প্রকাশ-মাধ্যমও বটে।

যুগ যুগ ধরে নাটক মানুষের জীবন বিকাশের মহৎ ভাবনাকেই অনুসরণ করে এসেছে। আর শতাব্দীব্যাপী সেই সাধনার ঐতিহ্যই নাটককে আজ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু করে অন্তর্লোকের গভীরতম রহস্য ও গূঢ় তাৎপর্যকে বিশ্বজনীন পরিচয়ের আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলার অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত করেছে আজ। ছন্দে সাজানো কথার কাব্য নয়,

প্রতিটি অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে আছে যে গভীর ও অনির্বচনীয় কাব্য কথা নাটক সহজেই হ'তে পারে সেই জীবন ছন্দের অকৃত্রিম রূপকার। মঞ্চের ওপর অভিনীত নকল জীবনের নকল বেদনার নয়, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের আশা নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান প্রতিটি মানুষের জীবনের অন্তরের নিরুচ্ছ্বাস কান্নার রুদ্ধ আবেগকে একান্ত অকৃত্রিমতায় অভিব্যক্ত করাই নাটকের স্বভাব-ধর্ম। আবার পেশাদার কৌতুকাভিনেতার স্থূল রসিকতা বা ভাঁড়ের ভাঁড়ামো নয়, প্রতিটি মানুষের প্রকৃতি ও সত্তায় লুকিয়ে আছে যে সুনির্মল আনন্দ চেতনা, সেই অনাবিল কৌতুকময়তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশও দেখতে পাই নাটকে।

তাই বলছিলাম, নাটক আজ যে রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা অসীম। কিন্তু নাট্য-স্রষ্টার সংখ্যা অতি সীমাবদ্ধ। এরও মধ্যে আবার খুব সাধারণ বুদ্ধি ও অক্ষমতাসম্পন্নদের সংখ্যা যেমন অধিক, যথার্থ ক্ষমতাবান ও ধীমানদের সংখ্যা তেমনই মুষ্টিমেয়। আমার মনে হয়, অন্যান্য শিল্প ও জীবিকার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা বিদ্যমান। আমি অনেককে বলতে শুনেছি যথার্থ ব্যঞ্জনাময় ও সার্থক-মানের চিত্রশিল্পের সংখ্যা অতি কম। সঙ্গীত-জগতেও নিম্নমানের ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন গীতিকার ও গায়কদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই সর্বাঙ্গীন ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে, নাট্যের ক্ষেত্রে যদি ঐ সামান্যতার মাত্রার কিছু ব্যতিক্রম থাকত, তাহ'লে কি ভালই না হ'ত। কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু যদি নাও থাকে তবু নাট্যের ক্ষেত্রে এই অধঃপতন কেন ঘটেছে তার কারণ খুঁজে বার করা এতই সহজ যে, নাটকের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা আর তার সমালোচনা করাই যে সব ব্যক্তিদের উপজীবিকা তাঁরা অবশ্যই লজ্জা পেয়ে যাবেন। অনেকেই বলে থাকেন, এঁদের মধ্যে অনেক মহারথীও আছেন। নাটক হ'ল প্রকৃতির দর্পণ—অবশ্যই মানব প্রকৃতির। আজকের নাটকের এই ভূমিকাটি খুবই প্রত্যক্ষ। আর সেই কারণেই যত কিছু কুৎসিত, অসুন্দর, অসম্পূর্ণতার আবর্জনাকেই প্রতিফলিত হ'তে দেখি আজকের নাট্য-দর্পণে। ভাবুন তো একবার, আজকের যে কোনও দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠাগুলিকে যদি নাট্যের দর্পণে অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত করা

হয়—তাহ'লে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্রটি ফুটে উঠবে তাতে তার রূপটি কেমন দেখাবে ?

যাক সে কথা। এবার আমি সরাসরি আমার মূল প্রশ্নে আসি :

নাটক কী ? বা কাকে বলে ? বিয়োগান্ত, মিলনান্ত বা কৌতুকাবহ যাই হোক, নাট্যকার যা কিছু লিখে দেন তাই কি নাটক ? এর উত্তরটাও আমি দিচ্ছি, অর্থাৎ এ বিষয়ে আমার ধারণার কথাই বলছি। হ্যাঁ, নাটক বলতে সাধারণতঃ লোকে মুদ্রিত বা পাণ্ডুলিপি আকারের নাট্যগ্রন্থকেই বোঝে। সেই কারণেই কেউ যখন কাউকে কোনও নাটক দেয়, তখন তা পড়তে পড়তে সে বলে—সে নাটকই পড়ছে। মার্জনা করবেন আমাকে, আপনাদের এই ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। নাটক কেউ পড়তে পারে না। সঙ্গীতের কথাই ধরুন। নানান ধরনের আঁকিবুকি কাটা কতকগুলো কথার মালা সাজানো। মনে হবে যেন কাঁটা তারের বেড়া, একটি কাগজ আপনার হাতে দেওয়া হ'ল, আপনি সেটা পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই বলবেন না যে আপনি গান পড়ছেন। বড় জোর বলতে পারেন আপনি একটি সঙ্গীতের স্বরলিপি পড়ছেন। তারপর সেই কাগজটি পকেটে নিয়ে যখন ঘুরবেন পথে তখন নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে না যে, আপনি একটি গান পকেটে নিয়ে ঘুরছেন। হবে না তার কারণ, ওটি গান নয়—একটি গান কোন সুর তান লয় ছন্দে গাইতে হবে তারই নির্দেশ মাত্র। যতক্ষণ না সেই নির্দিষ্ট সুর-তান-লয় ছন্দের সাহায্যে বাতাসের একটি বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারছেন আপনি, ততক্ষণ সেই সারি সারি সাজানো কথার মালা গান হয়ে উঠবে না।

নাটকের ব্যাপারেও তাই। মুদ্রিত অথবা পাণ্ডুলিপি আকারে যে সংলাপ সংগ্রহটি আপনার হাতে রয়েছে সেটি আসলে নাটক নয়। একটি নাটক সৃষ্টির নির্দেশাবলীমাত্র। ঐ নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনা দ্বারাই যথার্থ অর্থে নাটক সৃষ্টি সম্ভব। তাই কেউ যখন বলেন যে, তিনি নাটক পড়তে পারেন, তখন তা খুব হাস্যকর শোনায় আমার কাছে। কারণ, এটি একটি দুঃসাধ্য কর্ম। নাটক পড়া যায় না। বড় জোর সেই সংলাপ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আসল নাটকটি কেমন হবে তা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারি

আমরা। একটি অগ্নিকাণ্ড বা মোটর দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা কি ঐ ঘটনার বিবরণ পাঠের মধ্য থেকে লাভ করা সম্ভব? তেমনই নাটক তখনই সৃষ্টি হচ্ছে, যখন নাটক সৃষ্টির উপকরণ ও নির্দেশাবলী জীবনছন্দে মূর্ত হয়ে উঠবে।

৪.

আমি ধরে নিচ্ছি নাটক সম্পর্কে আপনাদের যে ভুল ধারণা ছিল, এতক্ষণে আমি তা নিরসন করতে পেরেছি। এবার তাহ'লে এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ে আসা যাক:

মনে করুন, কোনও এক ভাগ্যবান নাট্যকার তাঁর একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যে কোনও এক ভাগ্যবান প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। আমি প্রযোজকটিকে ভাগ্যবান বললাম এই কারণে যে, তিনি যে নাটকটি বেছে নিয়েছেন তার মধ্যে আর্থিক সাফল্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে বলে মনে হয়েছে তাঁর। আবার নাট্যকারটিকেও ভাগ্যবান বললাম এই জন্যে যে, বরাতগুণে তাঁর কপালে হয়তো এমন একজন প্রযোজক জুটেছেন যাঁর মধ্যে যথার্থ ব্যবসায়ী নাট্য প্রযোজকের গুণপনাগুলির সব ক-টিই বিদ্যমান।

নাট্য প্রযোজকের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে শোনবার ইচ্ছা আপনাদের না থাকাই সম্ভব। তবু এঁদের প্রসঙ্গে আমার অভিমতের কথা একটু বলে নিতে চাই। নাট্য প্রযোজকদের দু'টি শ্রেণী বিদ্যমান—ব্যবসায়ী নাট্য প্রযোজক এবং খেয়ালী নাট্য প্রযোজক। ব্যবসায়ী নাট্য প্রযোজকদের কাছে নাট্য প্রযোজনাটা একটা ব্যবসায় ভিন্ন আর কিছু নয়। এঁরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে মঞ্চগৃহ বাবদ ব্যয় থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। তাই এঁদের লক্ষ্যও থাকে নাটক মঞ্চস্থ করে যাতে যতবেশী সম্ভব অর্থ উপার্জন করা যায় সেই দিকেই। ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির জন্যে এই শ্রেণীর প্রযোজকদের কপালে জোটে অজস্র নিন্দাবাদ। অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই যে, অন্যান্য যে কোনও জীবিকার লোকেদেরই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হ'তে একটুও বাধা নেই। শিল্পী, সঙ্গীতকার, বাদ্যকর, অংকনশিল্প ব্যবসায়ী,

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকাশক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনবিদ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের আর সকলেই আজ অর্থের জন্যে হন্যে হয়ে ছুটছেন। সেটা মোটেই দোষাবহ নয়। আর নাট্য-প্রযোজক যদি অর্থের দিকে নজর রেখে নাট্য প্রযোজনা করেন তা হ'লেই তিনি হ'য়ে গেলেন ঘৃণ্য, পাষণ্ড, বদমাশ, অর্থপিশাচ! যেহেতু তাঁরা আপামর জনসাধারণের কাছে সহজগ্রাহ্য ও সমাদৃত হবার মতন নাটক সমূহ মঞ্চস্থ প্রযোজনা করে থাকেন, সেই হেতু তাঁরা হ'লেন দুনিয়ার ঘৃণ্যতম জীব। আমি অবশ্য নাট্য প্রযোজক হিসাবে তাঁদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কোনও বিচার এখানে করতে চাই না। এ ব্যাপারে প্রযোজকদের মধ্যে প্রচুর তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক, অন্যান্য উপজীবিকার আর পাঁচজন মানুষের মধ্যে। আমি শুধু এই শ্রেণীর নাট্য-প্রযোজকদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে যে অসঙ্গত বিক্ষোভ দেখা যায় সেই দিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মানুষের আবেগ ও মনন-সঞ্জাত অপর আর কোনও শিল্পসৃষ্টির প্রতি এমন বিপুল অবজ্ঞা ও অবেহলা প্রকাশের নজির খুঁজে বার করতে আমার সুদীর্ঘ সময় কেটে যায়।

যাক, যা বলছিলাম। এই শ্রেণীর প্রযোজকের হাতে নাটক তৈরীর নির্দেশ তথা সংলাপ সংগ্রহটি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাথমিক চিন্তা হয়, কেমনভাবে ঐ নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে নাটকটিকে উপস্থিত করা যায়। প্রখর ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার জন্য নীচাশয় বলে ধিকৃত এই প্রযোজকের মূল লক্ষ্য থাকে নাটকটিকে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে তা সর্বশ্রেণীর মানুষের মনোরঞ্জনে সহজেই সক্ষম হয়। অর্থাৎ তার আর্থিক সাফল্য লাভ ঘটে। তখন তিনি নাট্যকার, মঞ্চ সজ্জাকর, আলোক সম্পাতকারী, নাট্য পরিচালক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যথা কর্তব্য নির্ধারণে সচেষ্ট হন।

আঙ্গিকগত তথা নাটকে ব্যবহার্য বাহ্যিক উপকরণগুলি সংগ্রহের সমস্যা ততটা নেই, যতটা গভীর সমস্যা দেখা দেয় ঐ কৃত্রিম বস্তুগুলিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবানুগ করে নাটকের বহিরঙ্গ প্রসাধনে নিয়োগ করার ব্যাপারে। তার চেয়েও বেশী সমস্যার বিষয় হচ্ছে, নির্দেশিত চরিত্রগুলিকে অভিনয়ের

দ্বারা জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ যা ছিল নাট্যকারের কল্পনায়, তাকেই ভাবভাষা ভঙ্গী ও আবেগ দিয়ে মূর্ত করে তোলা।

কিছুদিন আগেও এমন ছিল—যখন নাটক জীবনানুগ না হ'লেও কেউ কিছু মনে করতেন না। আজ কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজকের না কে একান্তভাবেই জীবনসঞ্জাত ও জীবন-সম্পৃক্ত হ'তেই হবে। এ না হ'লে নাটকের চরিত্র তার বৈশিষ্ট্যচ্যুত হবেই এবং মঞ্চের ওপর ঐ চরিত্রের আচার আচরণ দেখে কখনই মনে হবে না যে, একটি জীবন্ত চরিত্র ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। এর অনিবার্য পরিণাম—নাটকটির অঙ্গহানি ও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কতকগুলো মৃত ও বিকৃতচরিত্র নাট্য কাহিনীকে কখনই প্রাণরসে সঞ্জীবিত করতে পারে না।

নাটকের চরিত্রগুলিকে হত্যা করার কতকগুলি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। যেমন, গড়গড় করে মুখস্থ করে বলে যাওয়া, অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক রকম অঙ্গ-ভঙ্গী বা মুখভঙ্গী করা, অশ্লীল কণ্ঠবাদন ইত্যাদি। এসব ব্যাপার সেকালে চলতো। কিন্তু আজ এসব অচল। সুতরাং নাটককে নাটক হিসাবে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হ'লে ঐ সব অস্বাভাবিক ও অপ্রয়োজনীয় বাচনভঙ্গী ও অঙ্গ প্রক্ষেপন বর্জন করতেই হবে।

আজকের নাটকের অতি জীবনানুগত্যই আবার আজকের দর্শকদের অতিশয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার সম্পর্কেও এমন সচেতন করে তুলেছে যে, কোথাও সামান্য একটুখানি ত্রুটিবিচ্যুতিও তাঁদের নজর এড়ায় না। এই ধরনের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে বিশেষভাবে দু'টি ত্রুটি প্রসঙ্গে কিছু বলবো, কারণ এই দুটি ত্রুটিই বহু নাটকের ব্যর্থতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। প্রধানতঃ অভিনয়ের ক্ষেত্রেই এই ত্রুটি দু'টি প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ত্রুটি, নাটকের ঘটনাবলী চরিত্রগুলির জীবনে যেন সেই প্রথমই ঘটছে—প্রতিদিনের অভিনয়ে দর্শকমনে এই বিভ্রম সৃষ্টির আবশ্যকতা সম্পর্কে অসচেতনতা। এবং দ্বিতীয় ত্রুটি, রচনাকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে চরিত্র ও ঘটনাবলীকে হুবহু ফুটিয়ে তোলা সম্পর্কে অতি-সচেতনতা।

বিষয় দু'টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। অভিনেতার [এবং অভিনেত্রীরও] পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, চরিত্রটিতে তাঁকে অভিনয় করতে হবে, তার সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই সব জানা হ'য়ে যায় তাঁর। বিশেষ করে একই নাটক পরপর কয়েক রাত্রি অভিনয় করার পর অভিনীত চরিত্রের সব কিছুই অভিনেতার সচেতন চিন্তার মধ্যে স্থায়ীভাবে গাঁথা হ'য়ে যায়। নাটকের চরিত্র ও সেই চরিত্রের অভিনেতা তো একই ব্যক্তি নন। সুতরাং নাটকের অভিনেতার পক্ষে জানা সম্ভব নয় নাটকের চরিত্রটির জীবনে কোন কোন ঘটনা ঘটতে পারে এবং সেই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরিত্রটিতে কোন কোন ভাবের আবর্তন ঘটতে পারে। অভিনেতা যা পারেন, তাহ'ল চরিত্রটিকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে, তাকে একটি জীবন্ত সত্তায় রূপান্তরিত করতে, তার মনের ভাবনা কামনা বাসনাকে শ্রুতিগ্রাহ্য ভাষা জোগাতে। নাটকের চরিত্র ও অভিনেতা তখন মিলে মিশে একাকার হ'য়ে যায়। এটি করা খুবই দুরূহ কাজ। কারণ, অভিনেতা বিলক্ষণ ভাল করেই জানেন, তাঁকে কোন কথার পর কোন কথা বলতে হবে, কোন ভাবের পর কোন ভাবটিকে ধরতে হবে। অথচ, তাকে এমন ভান করতে হবে যেন চরিত্রটির তাৎক্ষণিক অস্তিত্বকে পেরিয়ে পরবর্তী আর সব কিছুই তাঁর কাছে দুজ্ঞেয় নিয়তির মত রহস্যময়, অজানা। এই ভানটাকে নিজের এবং আর সকলের বুদ্ধির অগোচরে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা সত্যিই অত্যন্ত কঠিন। জীবন্ত মানুষের স্বাভাবিক আচার আচরণের সঙ্গে এই অস্বাভাবিক আচরণের দুস্তর প্রভেদ। মানুষ তার প্রতি পরবর্তী মুহূর্তের ঘটনাকে জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু শত চেষ্টাতেও জানতে পারে না। কিন্তু অভিনয়ের কালে সর্বশক্তিমান বিধাতার মত নাটকে ঘটমান ও ঘটিতব্য সকল ব্যাপারই অভিনেতার গোচরীভূত। অথচ তাঁকে সেই সর্বজ্ঞ-চেতনা পরিহার করে নিয়তির হাতের পুতুল সদৃশ এক অস্তিত্বহীন চরিত্রের অন্তর-সত্তাকে নিজস্ব অস্তিত্বের মাঝে জীবন্ত করে তুলতে হয়। অর্থাৎ চরিত্রটির জীবনে যে ঘটনা ঘটছে তা যেন সেই সর্বপ্রথমই ঘটছে—অভিনয়ের যাদুতে দর্শক মনে এই বিভ্রম সৃষ্টি করতে হয়। আপাত অসচেতনতার এই সচেতন অনুসরণে ত্রুটি

ঘটলেই—গোটা নাটকটিই প্রাণহীন পুতুল খেলায় পর্যবসিত হয়ে যাবে দর্শকের চোখে।

ঐ বিভ্রমসৃষ্টিতে ব্যর্থতা শুধু যে চরিত্রটির মানসিকতা ও আবেগকে যথাযথভাবে রূপ দিতে না পারার জন্যেই ঘটে—তা নয়। গোটা নাটকটা জুড়ে থাকে এই বিভ্রম সৃষ্টির উপকরণ। আর পরিবেশানুগ গভীর কোনও অভিব্যক্তি থেকে শুরু করে সামান্য একটুখানি দৃষ্টি নিক্ষেপ বা মৃদু হাসির যথাযথ উপস্থাপনায় ত্রুটি ঘটলেই দর্শক-মনে বিভ্রম সৃষ্টি কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, নাটকে কোনও চরিত্রের কোনও এমন একটি ঘরে প্রবেশের দৃশ্য আছে যে ঘরটি আগন্তুকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অভিনেতা যদি এ বিষয়ে সচেতন না থাকেন তাহ'লে তাঁর ঘরে প্রবেশের ভঙ্গীটি এমন দেখাবে যেন জন্মকাল থেকে তিনি ঐ বাড়ীতেই আছেন এবং ঐ বাড়ীর সব কিছুই তাঁর নখদর্পনে। অর্থাৎ একটি অজানা পরিবেশে একজন নবাগত'র প্রথম প্রবেশের কালে তার চলা বলা ও চাহনির যে ভঙ্গী হওয়া উচিত তার কোনওটিই সেই অভিনেতার আচরণে প্রকট হ'ল না। তারপর ধরুন, কোনও প্রেমের দৃশ্যে অভিনয়ের ব্যাপারটি। এটা তো অনেকের কাছে আরও সমস্যাপূর্ণ। কারণ সেই প্রেমিক-যুগল কখনই তাদের বাস্তব সম্পর্ক বা বাস্তব-অভিজ্ঞতা তথা প্রেমের আবেগ প্রকাশে নিজস্ব রীতির বৈশিষ্ট্য কিছুতেই ভুলতে পারে না। ফলে এই হয় যে, অভিনেতা নায়ক যদি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, যা নাটকের চরিত্রের পক্ষে সমান প্রযোজ্য, সলজ্জতা নিয়ে নায়িকাকে প্রেম নিবেদন করেন, তাহ'লে পরের দিনই কাগজে কাগজে নির্মম সমালোচনা বেরিয়ে যাবে তিনি একটি আনাড়ি অভিনেতা, কেমন করে প্রেমের অভিনয় করতে হয় তা জানেন না। তিনি যতশীঘ্র রঙ্গজগত থেকে বিদায় নেন, ততই মঙ্গল ইত্যাদি। আবার যদি তিনি সেকেলে অভিনেতাদের মত অত্যন্ত সচেতনভাবে, বিচিত্রভঙ্গী সহকারে ও বিশেষ ঢঙের সুরে কথা বলে, নায়ক কর্তৃক নায়িকাকে প্রথম প্রেম নিবেদনের সেই দৃশ্যটি অভিনয় করেন—তাহ'লে কোনও দর্শকই দৃশ্যটিকে যথার্থ ও সত্য বলে গ্রহণ করবেন না। কারণ, নায়কের নির্লজ্জ বিচিত্র প্রেম নিবেদনের রীতি দেখে এ কথা তাঁদের

পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, ইতিপূর্বে নায়কটির জীবনে কমপক্ষে পঞ্চাশটি 'প্রথম প্রেম' নিবেদনের অভিজ্ঞতা নেই। ভেবে দেখুন, একটি নাটকে কত ঘটনা ও কত চরিত্র থাকে। প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীই যদি অভিনীতব্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বভাবানুসারী অভিনয় করতে থাকেন, তাহ'লে তার ফলটা কি দাঁড়াবে।

কিন্তু 'এই-ই প্রথম ঘটছে' এই বিভ্রম সৃষ্টির পথে উপরোক্ত ধরনের বাধা-গুলিই সব নয়। নাটক এমনই একটা ব্যাপার যেখানে সব কটি খণ্ড খণ্ড উপকরণের নির্ভুল সংযোগ ঘটলেও তা একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার রূপ পরিগ্রহ করে না। নাটকটি সামগ্রিক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তার ভাবসত্তাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলাটাই সাফল্যের মূল কথা।

একই নাটক অভিনীত হয় রাতের পর রাত। কিন্তু প্রতি রাতেই সেই নাটকের দর্শক কখনও একই হয় না। সুতরাং নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনাটি এমনই হ'তে হবে যা দেখে প্রতি রাতের প্রতিটি দর্শকই মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁদের সামনে পাদ-প্রদীপের ঐ আলোকিত বেষ্টনীর ওপারে যা কিছু ঘটছে তা যেন সতত সঞ্চারমান জীবনেরই এক বিচিত্র সুন্দর অভিব্যক্তি—প্রত্যহের পরিচয়ে প্রত্যহই নতুন। প্রতিদিন একই ঘটনার যান্ত্রিক অনুবর্তন নয়। যে শক্তিশালী নাট্য পরিচালক তাঁর সামগ্রিক প্রযোজনার মধ্যে এই অকৃত্রিম জীবনাশ্রয়ী চেতনার স্পন্দন ঘটাতে সক্ষম হন তাঁর সকল পরিশ্রমই সার্থক।

নাটককে ব্যর্থ করে দেবার জন্য দায়ী অপর আর যে কারণটি উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ রচনাকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে চরিত্র ও ঘটনাবলীকে হুবহু ফুটিয়ে তোলার প্রতি অতি সচেতনতা—তা কিন্তু প্রথম বিষয়টির মত তেমন মারাত্মক নয়। অর্থাৎ একটু চেষ্টা করলেই এই ত্রুটিকে সংশোধন করা যায়। অভিনেতাদের [এবং অভিনেত্রীদেরও] একটা বিচিত্র স্বভাব লক্ষ্য করেছি। অভিনীতব্য চরিত্রকে রূপ দেবার সময় এমনভাবে হাঁটেন, বসেন,

কথা বলেন, নিশ্বাস নেন, হাসেন, কাসেন—যার সঙ্গে বাস্তবের আদৌ কোনও সংযোগ দেখা যায় না। ফলে তা অতিমাত্রায় নাটকীয় হ'য়ে উঠে হয় চরিত্রটিকে হত্যা করে অথবা তাকে বিকৃত করে দেয়। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, নাটক জীবনকে অনুসরণ করে, অনুকরণ করে না। কোনও নাট্যসৃষ্টি তখনই জনচিত্তে একটি সর্বজনীনতার সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়, যখন সেই নাটক দর্শকসমক্ষে জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য ও অকৃত্রিম প্রতিরূপ রূপে প্রতিভাত হয়। নাটককে যথার্থ অর্থে নাটক অর্থাৎ জীবন নির্য্যাস রূপে গড়ে তুলতে হ'লে প্রতিটি নাট্যকার ও নাট্য প্রযোজককে প্রত্যেকের জীবনের ছোটখাটো ভুলত্রুটিগুলিকে লক্ষ্য করলেই চলবে না। অগণিত মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাস, বৈশিষ্ট, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সব কিছু থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

যে কয়টি মৌলিক গুণের সমবায়ে জীবন ও জীবনীশক্তি গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল মানুষের সেই চারিত্রিকতা ও বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা এককথায় বলে থাকি ব্যক্তিত্ব। আজকের দিনে বিদগ্ধ মহলে এমন একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে, নাট্যশিল্পের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কোনও সম্পর্ক নেই এবং ব্যক্তিত্ব নামক বস্তুটিকে অতি খেলো-জিনিস বলে অবজ্ঞা জানানই প্রকৃত বৈদগ্ধ্যের লক্ষণ। কিন্তু বক্তিত্বের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ আছে কি নেই, ব্যক্তিত্ব মূল্যবান বস্তু অথবা অসার পদার্থ—সে বিষয়ে যতই বিতর্ক থাক না কেন, আধুনিক মঞ্চাভিনয়কে প্রাণ সঞ্জীবিত করার জন্যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য। বিশেষ করে আজকের দিনে নাটক ও জীবন যখন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। পৃথিবীতে এমন একটিও মানুষ নেই, যার চেহারায় কোনও না কোনও রকমের একটি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই। আর সেই কারণেই কোনও অভিনেতা যদি কোনও ব্যক্তিজীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে কাজে না লাগান, তাহ'লে সেই চরিত্রের অস্তিত্ববাহী একটি মৌল উপাদানকেই তিনি বর্জন করবেন।

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এমন একজনও অভিনেতার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে অপর এক ব্যক্তি হয়ে উঠতে

পেরেছেন। ব্যক্তিবিশেষের আচার আচরণ, মুদ্রাদোষ কথা বলা ও অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রতিটি ভঙ্গীকে সহজেই আয়ত্ব করা যায়। কৌতুকাভিনেতা ও বহুরূপী শ্রেণীর চরিত্রাভিনেতারা ঐ কায়দা কানুনগুলোকেই আয়ত্ব করে প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তার কোনই সম্পর্ক নেই।

আজকের দিনে যাঁরা প্রতিভাপন্ন অভিনেতারূপে অবিসম্বাদিত খ্যাত ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের অভিনীত শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলিকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েই অবিস্মরণীয় করে তুলতে পেরেছেন। আবার দেখা গেছে, বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা কোনও কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে সকরুণ-ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন শুধু মাত্র চরিত্রটি তাঁর ব্যক্তিত্ব সঙ্গত না হওয়ার জন্যেই।

আমি জানি, অভিনয়কলায় পারদর্শিতা লাভের উপায় সম্পর্কে যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ চালু আছে, আমার মতের সঙ্গে তার বিস্তর অমিল। বস্তুতঃ-পক্ষে প্রাজ্ঞ নাট্যবিদগণ স্বীকার করেন না যে, যে অভিনেতা তাঁর ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অভিনীতব্য চরিত্রকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সুন্দরভাবে জীবনানুগ সত্যতায় মূর্ত করে তুলতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁদের মতে, যে অভিনেতা যতবেশী ও যত ভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রের সার্থক ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাঁরা বলেন কোনও একটিমাত্র চরিত্রে অভিনয় নৈপুণ্যের বিচারে অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতার মান নির্ধারণ করা যায় না। সেই অভিনেতাটি অভিনয় পারদর্শিতার উচ্চতম মানে পৌছাতে পেরেছেন কিনা সেটা যাচাই করার জন্যে আমাদের দেখতে হবে তিনি কত বিভিন্ন চরিত্রে কত ভাল অভিনয় করতে পারেন। এর অর্থ কি দাঁড়ায় বুঝেছেন তো? যিনি যত বড় জিমন্যাস্ট তিনি তত বড় অভিনেতা। প্রেক্ষাগৃহে বসে আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে অভিনেতার অভিনয় পারদর্শিতা নয়, অভিনয়ের কসরৎ পরিদর্শনের পারঙ্গমতা এবং যিনি

যত ভিন্ন চরিত্রে যত ভিন্ন ধরনের কসরতের উৎকর্ষতার প্রমান রাখতে পারবেন তিনিই তত বড় অভিনেতা। ব্যাপারটা খুবই বিচিত্র ও উপভোগ্য তাই নয় কি? সোজা কথায় ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম—কোনও চিত্রশিল্পী, যদি তিনি শ্রেষ্ঠতম মানেরও ছবি এঁকে থাকেন তবুও তিনি শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর মর্যাদা পাবেন না, কারণ তিনি যে শুধু নিসর্গ দৃশ্যই আঁকেন। যে ব্যক্তি হরেক রকমের "হরেকরকমবা" ছবি আঁকতে সক্ষম তাঁরই গলায় দিতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের মালা। সুখের বিষয় এই, আজ অবধি কোনও প্রতিভা সম্পন্ন মঞ্চাভিনেতাই এই ধরনের বহুরূপী সাজার প্রতিযোগিতায় নামবার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন নি।

'দি ইভিউশন অব কাস্ট টাইপ
ইন অ্যাকটিং'
অনুসরণে
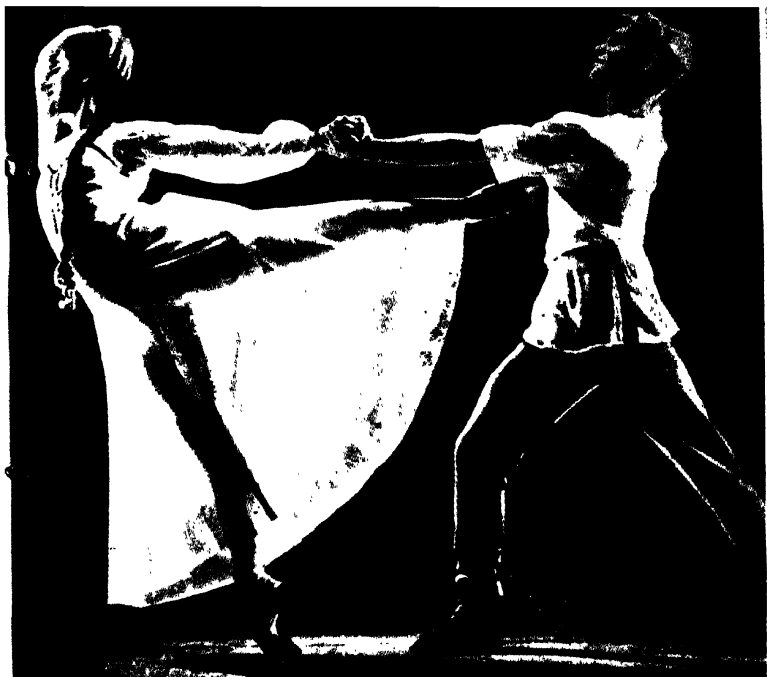
রেঃ কাটেরিনা ও
রূপে রাশিয়ান ব্যালের
চরম নৃত্যমুহূর্তে
মোভা ও ভাসিলায়েভা।

নপাশেঃ সেনেগাল স্টেট
কোম্পানী নিবেদিত
টি ব্যালের বিশেষ দৃশ্য।

রুবী ডি ও সিডনি পইটার
রেইজিন ইন দি সান'

রে : 'ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিডা'
টকের একটি মুহূর্ত।

পাশে : 'র সো ম ন'
টিকের একটি মুহূর্তে রড স্টিগার
ক্লেয়ার বুম।

অভিনয় ও অনুভব

মূল রচনা : এ্যালবার্ট ফিন্ডে
অনুসরণে : দুলেন্দ্র ভৌমিক

আলোচনার শুরুতেই কথা দু'টো সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাকে আরও একটু স্পষ্টতর করে নেওয়া আবশ্যক। অভিনয় এবং অনুভব কথা দু'টো অভিধানিক অর্থে ভিন্ন হ'লেও এক্ষেত্রে কথা দু'টোর মধ্যে একটা গভীরতম আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। অনুভব করা এবং অনুভব করানো এটাই হ'চ্ছে অভিনেতার প্রধান দায়িত্ব। অর্থাৎ অভিনীত চরিত্রের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা সব কিছুকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে সমবেত দর্শকদের কাছে পৌছে দিতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন অভিনীত চরিত্রটিকে বোঝা, তার মানসিক অবস্থাকে অনুভব করা এবং পরে অভিনয়কালে সেই অনুভূত সত্তাটিকে দর্শকদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়া।

কিন্তু এ কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। অভিনীত চরিত্রকে যথাযোগ্যরূপে মঞ্চে রূপ দিতে গেলে অভিনেতার প্রকাশভঙ্গির প্রতি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এবং এ-ক্ষেত্রে পরিচালক ও অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গির বা প্রকাশরীতির সুষ্ঠ সমন্বয় ঘটানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। পরিচালক যে-ভাবে চরিত্রটিকে বিচার করেছেন, এবং একে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন

তা' সব সময় সব অভিনেতার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান পরিচালকরা চরিত্রটির দায়িত্ব অভিনেতার ওপরেই ছেড়ে দেন। প্রতিটি সৃষ্টিশীল অভিনেতাই চেষ্টা করেন চরিত্রটিকে যথাযোগ্যভাবে রূপ দিতে। যেহেতু প্রত্যেকের প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র সেই হেতু এ-কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, বিশেষ একটি ভঙ্গিমাতেই অভিনেতারা তাঁদের অভিনয় করে যাবেন। বরঞ্চ বলা চলে যে, প্রত্যেক অভিনেতার জন্যই স্বতন্ত্র পথ আছে। যিনি যে-ভাবে খুশী সেই ভাবে তাঁর অভিনয় ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারেন, পারেন অভিনীত চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে দর্শকদের সামনে। এর জন্য বিশেষ কোনো বাঁধাধরা পথের প্রতি আনুগত্য দেখাবার প্রয়োজন নেই।

*   *   *   *

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে অভিনেতা যখন অভিনয় করেন, তাঁর চরিত্রকে রূপায়িত করতে যান তখন প্রত্যেক অভিনেতার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অভিনেতা হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব দর্শকদের কাছে। চরিত্রটির সঙ্গে যদি তাঁদের একাত্ম করে না ফেলা যায় তবে চরিত্রচিত্রণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমন কি এক্ষেত্রে অভিনেতার নিজের আত্মতৃপ্তিই বড় কথা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দর্শকদের তৃপ্তিবিধান করানো যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অভিনেতার কোনো তৃপ্তি নেই। কোনো চরিত্রে অভিনয় করে শিল্পী হয়ত নিজে খুব পরিতৃপ্ত হ'লেন কিন্তু আসলে দেখা গেল সেই চরিত্রের অভিনয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে তৃপ্তি দিতে পারে নি, তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে নি, সে-ক্ষেত্রে অভিনেতা হিসেবে তিনি ব্যর্থ হ'লেন। কারণ, অভিনেতার কাছে নিজের আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা দর্শকদের আত্মতৃপ্তিই অধিক মূল্যবান। একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মঞ্চের ওপর অভিনেতার হাসি, কান্না, আবেগ সবই দর্শকদের জন্য। তাঁদের হৃদয়কে যদি এগুলো স্পর্শ না করতে পারে তবে এর কোনো সার্থকতাই নেই। এমন কি শেষের সারিতে বসা দর্শকদের হৃদয়ে পর্যন্ত চরিত্রের প্রত্যেকটি আবেগকে সঞ্চারিত করে দিতে পারাই সার্থক অভিনেতার কাজ। দর্শকদের পরিতৃপ্তিই অভিনেতার সার্থকতা আনে। কিন্তু

এই পরিতৃপ্তির প্রশ্নে, অর্থাৎ দর্শকদের খুশী করতে যাওয়ার একটা মাত্রা অবশ্যই আছে। এই মাত্রাবোধ না থাকলে অভিনয় অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় মাত্রাবোধের প্রশ্ন হাস্যরসাত্মক নাটকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

সেকালীন অভিনয়ে মুখোসের ব্যবহার

'হাস্যরসাত্মক' নাটকের অভিনেতাদের অনেকেই এই মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেন। দর্শকদের অসঙ্গত চাহিদার কাছে অনেক অভিনেতাই চরিত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে গিয়ে অবশেষে ভাঁড়ে পরিণত হন। যেহেতু বিশেষ একটি অঙ্গভঙ্গিমায় দর্শক খুব হেসেছে, কিংবা কোনো একটি সংলাপ উচ্চারণের কায়দা দর্শকদের মধ্যে হুল্লোড় তুলে দিয়েছে, সেইহেতু দর্শকদের খুশী করতে অনেক অভিনেতাই সেই একই ভঙ্গিমা এবং একই সংলাপের পুনরাবৃত্তি করেন, অতিরিক্ত সংলাপ বলেন।

*　　*　　*　　*

দর্শকদের খুশী করা অভিনেতার প্রধান দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হ'লেও এ-জাতীয় কাজ অভিনেতার ব্যর্থতারই পরিচায়ক, এবং এ-ধরনের অভ্যাসও মারাত্মক। যিনি এরূপ অভ্যাসে অভ্যস্ত এবং দর্শকদের অসঙ্গত চাহিদার কাছে যিনি নিজের শিল্পীসত্তাকে বিসর্জন দেন, শিল্পী হিসেবে তিনি মৃত। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, নাটকের মহলা চলা কালীন শিল্পী নিজের চরিত্রটিকে যেমন বুঝেছেন এবং যেভাবে অভিনয় অনুশীলন করেছেন ও যে সত্য তার চোখে তখন ধরা পড়েছে তা থেকে বিচ্যুত হওয়া কোনোমতেই উচিত নয়। এখানে সত্য বলতে ফটোগ্রাফীর সত্যতা বা বাস্তবতার কথা (photographic naturalism) বলা হচ্ছে না। কারণ, নাটকের সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়, এবং এর পার্থক্যও যথেষ্ট। এই কথাটি প্রত্যেকটি অভিনেতার স্মরণ রাখা উচিত।

জীবনের বাস্তবতা এবং নাটকের বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলাই অভিনেতার কাজ। দর্শকদের মনে নাটকের চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য

করে তুলতে হ'লে এই সামঞ্জস্য অভিনেতাকে করতেই হয়। পুরোপুরি বাস্তব চরিত্র-চিত্রণ মঞ্চে সম্ভব নয়। অতএব নাটকের ক্ষেত্রে আমরা যখন 'বাস্তব' কথাটি ব্যবহার করি তখন সেটা নাটকের বাস্তবতা বলেই ধরে নি—যেহেতু 'বাস্তব' কথাটি মঞ্চে ও জীবনে একই মাত্রায় বাঁধা নয়। আগে যে কথার উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ দর্শকদের মধ্যে অভিনেতার নিজের আবেগকে সঞ্চারিত করে দেওয়া সেই মূল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

আমি যত অভিজ্ঞ এবং ক্ষমতাবান অভিনেতাই হই না কেন, চরিত্রটিকে আমি যত নিপুণভাবেই বিশ্লেষণ করে থাকি না কেন, তাতে দর্শকদের কিছুই এসে যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আমার ক্ষমতাকে, চরিত্রটির অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের বিশ্লেষণকে দর্শকদের মধ্যে অভিনয়ের মাধ্যমে সজীব করে তুলতে পারছি ও বোঝাতে পারছি যে, চরিত্রটি আমি সত্যিই বুঝেছি। এখানে আমার বোঝাই শেষকথা নয়, দর্শকদের উপলব্ধি করানোই শেষ কথা।

অভিনেতার চরিত্র নির্বাচন সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা এসে যায়। অনেক অভিনেতাই আছেন, যিনি নিজের ভূমিকা নিজেই বেছে নেন। এই বেছে নেবার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের পক্ষে এ কাজটা ভালই। কারণ, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, উপযুক্ত চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ না পাওয়ায় অনেক প্রতিভা বিকশিত হ'তে পারে না। এমন কথা নিশ্চিত করে বলা খুবই মুস্কিল যে অভিনেতার প্রতিভা কখন কিভাবে প্রকাশিত হবে। সামান্য একজন খুঁদে অভিনেতাও সহসা এমন অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দেন যে, তাতে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে ঐ উপযুক্ত ভূমিকা নির্বাচনই অভিনেতার সাফল্যের কারণ। ভূমিকা যদি শিল্পীর পছন্দসই হয়, ভূমিকাটি যদি শিল্পীকে আকর্ষণ করে থাকে, তবে, শিল্পী অনেক বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে চরিত্রটিকে বুঝতে ও বিচার করতে উৎসাহী হন। ফলে অনুশীলন চলাকালে চরিত্রটির প্রতি তাঁর গভীর অধ্যবসায় লক্ষ্য করা যায়। আর এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি সাফল্যজনক অভিনয়। অভিনেতা যখন চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার অন্তর ও বাহির উভয় দিকই মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পান, চরিত্রটিকে যখন ভালবেসে ফেলেন তখন সেই চরিত্রের

সার্থক রূপদান আর তার কষ্টসাধ্য নয়। চরিত্রটি কেন কাঁদছে, কেন হাসছে, আর কেনই বা উত্তেজিত হচ্ছে—এ রহস্য যখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন সেই কান্না, হাসি এবং উত্তেজনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আর আমার কাছে যা স্পষ্ট তা' ঠিক অনুরূপ-ভাবে অভিনয়ের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে পারলেই চরিত্রটি মঞ্চের পরিধি অতিক্রম করে সামনে বসা দর্শকদের হৃদয়ে প্রবেশ করার পথ পাবে। চরিত্রটি যদি আমার অভিনয়ের মাধ্যমে আমি দর্শকদের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে পারি তবে সেই চরিত্রের দুঃখ, বেদনা, আনন্দ উত্তেজনা এই বগগুলি তাদের হৃদয়ে বিশ্বাসযোগ্যরূপে পৌঁছে দেওয়া তখন আর কোনো কঠিন সমস্যাই হবে না। দর্শক এবং মঞ্চের অভিনেতার মধ্যকার সব ব্যবধান তখন খুলে যাবে। দর্শক চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। যা ভিন্নতর কোনো আঙ্গিকে করা সম্ভব নয়।

* * * *

তাহ'লে একটা জিনিস বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, অভিনেতা হিসেবে দর্শকদের কাছে আমার যে দায়িত্ব আছে, তা যদি পরিপূর্ণভাবে আমাকে পালন করতে হয় ও আমার অভিনীত চরিত্রটিকে দর্শকদের হৃদয়ে যদি মূর্ত করে তুলতে হয়, এবং আমার উপলব্ধ সত্যকে যদি তাঁদের অনুভবেও অনুরূপ ভাবে সত্য করে তুলতে হয়, তবে সবার আগে দরকার অভিনীত চরিত্রটি সম্পর্কে এবং মূলনাটক সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা রাখা। বিশ্লেষণী মন নিয়ে চরিত্রের প্রতিটি মুহূর্তকে যাচাই করা, মূল নাটকের ঘটনার সঙ্গে, নাট্যকারের মূল বক্তব্যের সঙ্গে চরিত্রের সংযোগ গুলি খুঁটিয়ে দেখা। একজন সার্থক অভিনেতা আগে বিশ্লেষক তথা গবেষক, পরে অভিনেতা। প্রতিদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে এবার সেই উপলব্ধ সত্য সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা। প্রকাশ ভঙ্গির বিভিন্নতার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং বিশেষ কোনো ঘরানাকে আঁকড়ে থাকা যে অর্থহীন একথা আর নিশ্চয়ই বলার প্রয়োজন নেই। অভিনেতা এবার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করবেন নিজের ভেতরের সেই সত্যকে প্রকাশ করতে। যদি পারেন তবেই সার্থক। একথাও

প্রতিটি অভিনেতার স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কোনো অভিনেতা নিছক একটি চরিত্রে অভিনয় করার জন্যই করছেন না, মূল নাটকের প্রতিও তার দায়িত্ব আছে। তার চরিত্রটিও এসেছে মূল নাটকের প্রয়োজনে। অতএব তিনি যখন ভাববেন, তখন সে ভাবনা একক বা বিচ্ছিন্ন না হয়। গোটা নাটকের সমগ্র ঘটনার পটভূমিতেই চরিত্রটিকে তিনি চিন্তা করবেন।

অনেক সময় এমন ঘটনা বহু দেখা যায় যে, কোনো নাটকের প্রধান চরিত্রের বা অন্য কোনো চরিত্রের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে কিন্তু আসল নাটক তাতে খুব বেশী লাভবান হয় নি। এমন কি স্থানে স্থানে মূল নাটককে অতিক্রম করে গেছে শিল্পীর অভিনয়। সে-ক্ষেত্রে শিল্পী হিসেবে তিনি অসার্থক। কারণ, বোঝা যাচ্ছে উনি নিছক অভিনয় করতে এসেছেন, চরিত্র এবং নাটকের প্রতি কোনো দায় দায়িত্ব ওঁর নেই। ফলে দর্শকদের ভালো লাগলেও তাদের অনুভবে সমগ্র নাটকটির যেমন কোনো মূল্য থাকবে না, তেমনি ঐ চরিত্রটিরও নয়। কারণ গোটা নাটকের চাইতে যখনই চরিত্রটি বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখনই সে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এমন কি দর্শকদের অনুভবেও তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়ে গিয়েছে।

'মেকিং দেম ফীল'
অনুসরনে

অভিনয়ে স্বর্গীয় সুষমা

মূল : ওটিস স্কিনার

অনুসরণে : বীরু মুখোপাধ্যায়

কৌতুকাভিনয়ের যেমন কোনও নির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি নেই। ঠিক তেমনি কোনো অভিনয়ই নির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতির ধারা মেনে চলে না। চলতে পারে না। কারণ অভিনয়, শিল্পীর স্বকীয় প্রতিভা উদ্ভূত শিল্পসৃষ্টি—যে সৃষ্টির পশ্চাতে অভিজ্ঞ পরিচালকের সক্রিয় সহযোগিতা কেবলমাত্র থাকে কিন্তু বিশেষ করে কৌতুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিনেতার নিজস্ব বিশিষ্ট শিল্পরীতি কি স্ব-উদ্ভাবিত অভিনয় পদ্ধতি তাঁর সৃষ্টিকে মহিমময় ক'রে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকের ভূমিকাকে অতিক্রম ক'রে এ-সকল অভিনয় অবিস্মণীয় সৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

নানা ধরনের রীতি-পদ্ধতি কি বিভিন্ন ধারার অভিনয়ের মধ্যে কৌতুক অভিনয় নামক অঙ্গটি সর্বাধিক দুরুহ এবং কঠিন। ভীষণ রকমের সমস্যাজড়িত একটি অভিনয়ের টান এবং উৎকণ্ঠা যখন শক্ত মুঠিতে দর্শক হৃদয়কে চেপে ধরে আছে, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস দর্শক যখন প্রচণ্ড রকমের উত্তেজিত, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের মনের ওপর চন্দনের শীতল প্রলেপ দেবার মতনই কৌতুকাভিনয় ভিন্ন ধরনের এক প্রশান্তি বিলোতে পারে। নাট্যক্ষেত্রের যত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি

তাঁদের মত একথা প্রমাণ করেছে, কৌতুকাভিনয় কেবলমাত্র কঠিন ধরনের Art-ই নয়, এর অভিনেতারা প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। এবং সকল ধরনের অভিনয়রীতির মধ্যে কেবল একেই স্বর্গীয় সুষমাময় বলা চলে।

অভিনয় এবং ঐতিহ্য

অতীতে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ ক'রে ফ্রান্স ও ইটালীতে কৌতুকাভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন শিল্পী, যেমন স্ক্যাপিনেয় ভোটর, ক্যাপিটানো—এঁরা বিভিন্ন স্বকীয় শিল্পরীতিতে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য সে রীতি অনেক ক্ষেত্রেই মঞ্চ কৌশলের রীতি, অর্থাৎ বিশিষ্ট অঙ্গ-ভঙ্গী, মুখ বিকৃতি বা স্বর-বিন্যাস ইত্যাদি। কিন্তু এই রীতিগুলি সে যুগে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, পরবর্তী কয়েক যুগ ধ'রে সেই বিশিষ্ট শিল্পরীতির মহিমা ছিল অব্যাহত। ফলে নতুন কৌতুকাভিনেতাদের অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'ত। দর্শকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাঁদের পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ ভিন্ন তাঁদের আর কিছু করার ছিল না, এবং সেই কারণেই পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্পীই প্রতিষ্ঠা পান নি কৌতুকাভিনেতা হিসাবে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইয়োরোপের মঞ্চ-প্রধান দেশগুলিতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে কৌতুকাভিনয়ের সূক্ষ্ম রীতি-পদ্ধতির অনুশীলন শুরু হয়েছিল। এ সময় থেকেই কৌতুক অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যটি প্রতিষ্ঠা পায়। ভাঁড়ামো আর চরিত্রাভিনয়ের পার্থক্যও সূচিত হয় সেই সময় থেকেই। এবং রুচিশীল দর্শক ও সাধনানিষ্ঠ অভিনেতার চোখে এ-কথা স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে, কৌতুকাভিনয় বাস্তবিকই Serious অভিনয় অপেক্ষা অনেক কঠিন।

দুই সত্তার দ্বন্দ্ব

সকল অভিনেতারই দুটি সত্তা নিয়ে কারবার: একজন স্রষ্টা, আর একজন সমালোচক। এই দু'টি সত্তাকে সর্বদা সজাগ না রাখলে কোনো চরিত্র সৃষ্টি করাই চলে না।

চরিত্রের মধ্যে ডুবে যাওয়া বলে একটি সাধারণ প্রবাদ প্রায়ই শোনা যায়। কথাটিশুধু নিরর্থক নয়, বিভ্রান্তিকরও। কোনো ভাবাবেগময় চরিত্রের মধ্যে যদি অভিনেতা নিজে ডুবে যান, অর্থাৎ নিজের সমালোচক সত্তাকে ডুবিয়ে দেন তা'হলে সে চরিত্রেরও সলিল সমাধি সেইখানেই। একটি উত্তেজনাময় দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে চরিত্রমগ্ন অভিনেতা যদি নিজে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তা'হলে অবস্থাটা কি হবে তা নতুন করে বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত ধীসম্পন্ন অভিনেতার কাজ কী? তার কাজ হবে এই যে, স্বীয় অভিনীত চরিত্রকে তিনি পুর্ণ বিকশিত ও বিশ্বাস্য করে তোলার জন্য যতখানি সম্ভব আবেগের ব্যবহার করবেন, প্রয়োজনে চড়া স্বর ব্যবহার করবেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমালোচক মনকে এমনভাবে সজাগ রাখতে হবে, যেন অভিনয় একপেশে না হয়, কোনো বৃত্তিই এখানে স্বেচ্ছায় স্পষ্টতর হয়ে না ওঠে। এই সঙ্গে ভূমিকাটি স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল কি না—তাও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যায়, তিনি নাকি 'কিং লিয়ারে'র ভূমিকাভিনয়ে এক চরম অবরোহের দৃশ্যে এমন ভাবাবেগ সৃষ্টি করতেন, যাতে দর্শকরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন এবং সেই মুহূর্তে তিনি এগিয়ে আসতেন পাদ-প্রদীপের সামনে, শান্তভাবে দর্শকদের হাততালি গ্রহণ করতেন। প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে আবার শুরু করতেন অভিনয়। অনন্য সাধারণ প্রতিভা শিশিরকুমার সম্পর্কেও এরকম বহু কাহিনী শোনা যায়। একদিন সীতা নাটকের এক দৃশ্যে যেখানে রাম দূরে লবকুশের কণ্ঠস্বর শুনে আবেগাপ্লুত মূর্তিতে মঞ্চে এগিয়ে আসছেন "কার কণ্ঠস্বর!" "কার কণ্ঠস্বর!" বলে, সেই সময় প্রেক্ষাগৃহে কিছু গোলমাল হচ্ছিল। শিশিরকুমার সোজা পাদপ্রদীপের সামনে এগিয়ে এসে শান্ত কণ্ঠে বললেন "যাঁদের ভালো লাগছে না তাঁরা দয়া করে টিকিটের দাম ফেরৎ নিয়ে চলে যান, এখানে গোলমাল

পুরণো যুগের
'কৌতুকাভিনেতার
প্রচলিত অভিব্যক্তি

করবেন না।" পর মুহূর্তে রামের ভূমিকায় সেই দৃশ্যের অভিনয়। এতটুকু বিচ্যুতি নেই, কোনো বৈলক্ষণ নেই। স্রষ্টাসত্তা ও সমালোচক সত্তা কতখানি সজাগ থাকলে এটা সম্ভব হ'তে পারে!

কৌতুকাভিনয় ও দর্শক চাহিদা.

এতো হ'ল সীরিয়াস অভিনয়ের কথা। কৌতুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতাকে ঐ দু'টি সত্তা আরও বহুগুণে জাগরূক রাখতে হয়। তার কারণ কৌতুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকের একটা বড় ভূমিকা আছে। দর্শকের সহর্ষ উচ্ছ্বাস অসতর্ক অভিনেতাকে মুহূর্তে মাত্রা-সীমার বাইরে এনে ফেলতে পারে। যে সংযম এবং পরিমিতিবোধ একজন কৌতুক অভিনেতাকে দর্শকের বিপুল হর্ষধ্বনি উপেক্ষা করে চরিত্রকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করে—তা সাধনা সাপেক্ষ। তাই কৌতুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো মুহূর্তেই শিল্পীকে 'চরিত্রমগ্ন' হওয়া চলে না। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রথম অভিনীত কৌতুকনাট্যের রূপ দর্শকের প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে বহুলাংশে বদলে গেছে। শুধু নাটক নয়, চরিত্র, অভিনয়ের ধারাও দর্শকের প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হ'তে বাধ্য হয়েছে। কৌতুক নাট্য অভিনয়ের কয়েক সেকেণ্ড আগে পরিচালকের পক্ষেও মন্তব্য করা সম্ভব নয়—এ-নাটক দর্শক মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে কিনা। পরীক্ষিত রসসৃষ্টি বার বার ব্যর্থ হয়েছে দর্শকের দরবারে, আবার হঠাৎ এক জায়গায় যেখানে রস পরিবেশনের আয়োজন বিশেষভাবে করা হয় নি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেছে সেখানেই দর্শক আনন্দ পেয়েছে। তাই, এ কথা বার বার বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কৌতুকাভিনয়ে দর্শকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এমনও দেখা গেছে বহু কৌতুকাভিনেতা কোনো নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে অপূর্ব অভিনয় করলেন, কিন্তু পরবর্তী কোনো অনুষ্ঠানেই সেই 'ক্ষণদীপ্ত' অভিনয়দ্যুতি লক্ষ্য করা গেল না। শুধু কৌতুক নাটক নয়, সীরিয়স অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বহু অভিনেতা রাত্রির ঔজ্জ্বল্যকে পরবর্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত রাখতে পারে না। এর প্রধান কারণ অভিনেতার আবেগ

তাঁর শিল্পসৃষ্টির সহায়তা করে, সমালোচক সত্তাকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রেখে। তাই পরবর্তীকালে যখনই আবেগের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে তখনই অভিনেতা সচেতন হ'তে থাকেন দর্শকের প্রতিক্রিয়ায়, ফলে স্রষ্টা-সত্তা বাধা পায় শিল্পসৃষ্টিতে।

মায়ারহোল্ড: ক্যারিকেচার

প্রথম অভিনয়ের অভিজ্ঞতা.

কিন্তু শক্তিমান অভিনেতার ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠানে সমালোচক সত্তাকে সজাগ রেখে তাঁরা দর্শকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকেন ও পরবর্তী অভিনয়ে তার সদ্ব্যবহার করেন। কৌতুক নাট্যের ক্ষেত্রে প্রথম অনুষ্ঠানরজনী একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরিচালক, শিল্পী এমন কি লেখকও অনেক সময় জানতে পারেন না তাঁর নাটকের কি পরিণতি হবে দর্শকের আদালতে।

কৌতুক নাট্যের প্রথম রজনীর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রখ্যাত অভিনেতা ওটিস স্কিনার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার একটি সুন্দর গল্প বলেছেন। "অনার অব দি ফ্যামিলি" নাটকে "কর্ণেল ব্রিদোঁর" মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে পরদা পড়ার কিছু আগে তাঁর ভূমিকায় সবটা অংশ সম্পর্কে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, সেই অংশে দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেবেনই তিনি। কারণ সেই অংশটি অভিনেতার মুখ চেয়েই নাট্যকার লিখেছিলেন। সেই অংশের সাফল্য সম্পর্কে স্কিনারের মনে এতটুকুও দ্বিধা ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যায় ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির শব্দ থিয়েটারের ছাতে এক প্রচণ্ড ঐক্যতান সৃষ্টি করেছিল। বৃষ্টির শব্দ ও ঝড়ের গর্জন উপেক্ষা করে স্কিনার যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে সেই মেলো ড্রামাটিক অংশটুকু অভিনয় করলেন। যে অংশের সাফল্য সম্পর্কে তিনি এত নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন যে পরদা পড়ার আগেই তিনি দর্শকের সহর্ষ অভিনন্দন আশা করছিলেন, কিন্তু সবিস্ময়ে স্কিনার শুনতে

পারলেন অভিনন্দনের পরিবর্তে কানফাটা চিৎকার। অত্যন্ত মর্মাহত স্কিনার বুঝতেন পারলেন না, গোলমালটা আসলে কোথায় হয়েছে। এবং কেনই বা হয়েছে।

চরিত্র ব্যাখ্যা.

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই আবার তাঁর আবির্ভাব। এবারেও সবিস্ময়ে স্কিনার লক্ষ্য করলেন, সেই গোলমাল থেমে গিয়ে স্বচ্ছন্দ হাসিতে ভরে গেছে গোটা প্রেক্ষাগৃহ। মুহূর্তে স্কিনারের মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল—ও হরি. চরিত্রের ব্যাখ্যাটাই ভুল ছিল তাঁর নিজের। কর্ণেল ব্রিদোঁ আসলে রোম্যান্টিক 'হিরো' নয়, সে যে আমুদে লোক। স্কিনার বলেছেন : ঐ দর্শকরা যদি দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে না হাসত, তা হ'লে হয়তো কোনোদিনই তাঁর ব্রিদোঁ চরিত্রের সঠিক রূপায়ন হ'ত না।

কৌতুক নাটক যদি বহু রাত্রি পুনরভিনীত হয়, তাহ'লে তার ধার ভোঁতা হয়ে যায়। শিল্পীরা যান্ত্রিক হয়ে যান। পূর্বের সেই সতেজ স্বচ্ছন্দ ভাব ক্রমে অতি অভিনয়ে পরিণত হয়।

বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা যোশেফ জেফারসনকে এক অভিনেত্রী একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "কি ব্যাপার বলুন তো, আমার হাসির জায়গাগুলোতে লোকে আর হাসছে না কেন?" জেফারসন উত্তরে বলেছিলেন—"আপনি যে জেনে নিয়েছেন কোনগুলো হাসির জায়গা—তাই হয়েছে বিপদ।"

জেফারসন ঠিকই বলেছিলেন। অভিনেতা যদি সচেতন থাকেন—'এই হচ্ছে আমার তুরুপের তাস। এই জায়গাটায় আমি লোককে হাসিয়ে ভাসিয়ে দেবো'। তাহ'লে কখনও তিনি সহজ হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারবেন না। স্কিনার বলছেন : কৌতুকাভিনয় হ'ল নরম তুলোর পাখী, তাকে আলতো হাতে ধরতে হয়।'

অভিনয় ও কণ্ঠস্বর.

সহজ অভিনয়ে কি পরিমাণ হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় তার দৃষ্টান্ত দিয়ে

স্কিনার বলেছেন যে 'কিসমেট' নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন ভিক্ষুক 'নাজ' মরনোন্মুখ অবস্থায় আবর্জনার স্তূপের উপর পড়ে তার ভাগ্যের জন্য বিধাতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, হঠাৎ পাশ থেকে অন্ধকারের মধ্যে তার শত্রুর যন্ত্রণা-কাতর চিৎকার ভেসে এল। 'নাজ' তখন আনন্দে বলে উঠল "আল্লা লোক ভালো, আমাদের পাশাপাশি মরবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আর কোনো দুঃখ নেই।"

নাজের ভূমিকায় অভিনয় করতেন স্কিনার নিজে। একটা ছত্র থেকে তিনি কিছুতেই উচ্ছ্বসিত হাস্যরোলের সৃষ্টি করতে পারছিলেন না প্রেক্ষাগৃহে। তিনি বহুবার, বহুভাবে বললেন ছত্র ক-টি। কিন্তু সবই ব্যর্থ। হাস্যরস ছেড়ে করুণ রসেরই উদ্রেক হ'ত প্রতিদিন। কিন্তু তাতে তাঁর চরিত্রের ক্ষতি হয়, নাটকেরও। অনেক অধ্যবসায়ের পর তিনি একদিন সফল হ'লেন। সফল হ'লেন শুধু কণ্ঠকৌশলের দ্বারা। এক বিচিত্র স্বরে কথাগুলোকে তিনি এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন দর্শকের ওপর, মনে হ'ল যেন দর্শকরা হাস্যবানে বিদ্ধ হলেন মুহূর্তে। স্কিনার সফল হ'লেন।

এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় কৌতুক অভিনেতাকে বহু রকমের কণ্ঠশৈলী আয়ত্ব করতে হয়।

স্বাভাবিক অস্বাভাবিক.

মঞ্চে 'স্বাভাবিক অভিনয়' কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ছায়াচিত্রে অভিনয়ের যে স্বাভাবিকত্ব তার সঙ্গে মঞ্চ অভিনয়ের আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনয়কে সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে হয় অনুশীলনের দ্বারা। দর্শকের চোখে যে অভিনয় যত সহজ, স্বাভাবিক মনে হবে, বুঝতে হবে সেই অভিনয়ের পিছনের শিল্পীর ততখানি অনুশীলন ও অধ্যবসায় বর্তমান। যে-চরিত্রে শিল্পী অভিনয় করবেন, সেই চরিত্রের ভাবাবেগ, অঙ্গচালনা, স্বরক্ষেপণ, এমন কি মুদ্রাদোষ পর্যন্ত অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তাঁকে আয়ত্ব করতে হবে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করে সেই চরিত্রের দোষ ও গুণগুলিকে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক ক'রে ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর সেই সঙ্গে অতন্দ্র প্রহরার

মধ্যে রাখতে হবে নিজের সমালোচক সত্তাকে—যেন এতটুকু বিচ্যুতি সে ক্ষমা না করে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে শেষ কথা এইটুকুই, কৌতুক অথবা করুণ, মধুর কিংবা বীভৎস যে কোনো রসের অভিনয়ই হ'ক, তার কোনো বিধিবদ্ধ ধারা নেই। প্রতিভা চেনা রাস্তায় কখনও চলে না, সে নব নব পথ সৃষ্টি করে নেয় দিকে দিগন্তরে—।

'কিণ্ডলিং দি ডিভাইন স্পার্ক'
অনুসরণে

ব্যজনিকা ব্যঞ্জনা

মূল রচনা : আঁথে স্যোনর
অনুসরণে : মনোজ মিত্র

১. অভিনয়ে যুগ

অতীত যুগ-চিহ্নিত নাট্যাভিনয়ে ইংরেজরা চিরকালই মার্কিন অভিনেতাদের চেয়ে দক্ষ। এর কারণ হয়তো ইংলণ্ডের ঐতিহ্য ধারা উত্তরোত্তর আমাদের প্রভাবিত করে চলেছে। অথবা এই দ্বীপবাসীদের এক ধরনের সহজাত সংস্কারপ্রীতি আছে যার বলে অনায়াসে তারা বিগতের মাঝে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই ধারণা। আমেরিকায় আপনি বহু বিচিত্র পরিবেশে সর্বদা একাধিক স্ববিরোধী প্রভাবকে ক্রিয়াশীল দেখবেন। কাজেই ও-দেশের অভিনেতা জন্মসূত্রেই বৈচিত্র্য প্রেমিক ; কোনো বিশেষ নিয়মের দাস নয়। কিন্তু এ দেশে আমরা আমাদের বয়োবৃদ্ধ আভিজাত্য আর শিক্ষা-ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যে বিশেষ সংস্কারকে ধরে রেখেছি—তার ফলে বৈচিত্র্য বা নিয়মভঙ্গের স্বাদ কখনো পেলুম না। ইংরেজরা, অতি সহজে বাচনভঙ্গি কি অঙ্গভঙ্গির 'এক মার্জিত' প্রকার রপ্ত করতে পারে—অনায়াসে রাজকীয় ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে। একটি প্রগতিশীল সাম্যবাদী রাষ্ট্রে এমন কখনোই হবে না।

২. ঐতিহ্য প্রসঙ্গ

একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। 'লেডি উইনডারমেয়ার' চরিত্রের নবাগতা অভিনেত্রীকে শেখাচ্ছিলুম—উনবিংশ শতাব্দীর রীতিতে হাতপাখার ব্যবহার প্রথমে জানিয়ে রাখি, আমি সে সময়কার পাখার কোনো বিস্তৃত বর্ণনা কোথাও পড়ি নি—এখানে ওখানে দেখা তৎকালীন চিত্রকলা থেকে কিছু ইঙ্গিত ইত্যাদি উদ্ধার করেছিলুম মাত্র। তবু সেই নবাগতাকে শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলুম যেহেতু আমি বিশ্বাস করি ঐ সময়ের রীতি নীতি আচার ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক পটভূমি অনুসন্ধান করলে হাতপাখার গতি প্রকৃতি বুঝতে পারব।

ইংলণ্ডের সমাজ জীবনে সর্বদা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। প্রতিদিন আমরা বিগত দিনের প্রথা, আচার অনুষ্ঠানের সান্নিধ্যে আসে। বিশাল অট্টালিকাগুলি চোখের সামনে অতীত যুগের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথাই ভাবুন না। ও দেশের পার্লামেন্টে যখন অধিবেশন বসছে, অভিষেক বা অন্য কোন রাজকীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হ'চ্ছে তখন অজ্ঞাতে ওঁদের মনে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রবণতা জাগে। কোনো শিল্পমেলা বা মহামহিম সৌধের প্রবেশ দ্বার থেকে পদে পদে আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন যুগের বিশেষ বিশেষ ফ্যাশন বা ফ্যাশনের কথা—তৎসাময়িক চিত্রপট আর আসবাবগুলি চোখের সঙ্গে আপনার হৃদয়াবেগকেও আকৃষ্ট করবে। ঐতিহ্যকে, চাইলেই ভোলা যাবে না।

৩. ব্যজনিকা ব্যঞ্জনা

যে কোনো যুগের জীবন এবং তার দর্শন সে-যুগের মানুষের কেশ বিন্যাসে, বসনে ভূষণে, আলাপে প্রসাধনে, সঙ্গীতে বা নৃত্যে প্রতিফলিত হয়। ঠিক তেমনি ব্যজনিকার ব্যঞ্জনাময়ী আন্দোলন কালগুণে আক্রান্ত হয়। শেষ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ রমণীরা রাশি রাশি তরঙ্গায়িত কেশস্তূপের পূজারিণী ছিলেন, আংশিক বক্ষোন্মচনে তাঁদের ঔদ্ধত্য প্রকৃতপক্ষে ছিল পিউরিটানি সংস্কারের বিরুদ্ধে। ফলত, এই সময় চিহ্নিত নাটকে হাতপাখারা যে মহিলাদের

কুঞ্চিত কেশদাম প্রদক্ষিণ করে সানন্দে ছোট ছোট হিল্লোল তুলবে, অথবা অর্ধোন্মোচিত বক্ষোভাগে প্রতীক বৈজয়ন্তী রূপে শোভা পাবে এতো যুগধর্মী যুক্তিনিষ্ঠ।

প্রচলিত ধারার রূপসজ্জায় বৃটিশ মঞ্চ নায়িকা

পরবর্তী শতাব্দীর লঘু আতিশয্যপূর্ণ চরিত্র, কেশ-রচনার গরিমা কিংবা মহিলাদের অতি প্রিয় দীর্ঘদেহী মস্তকাবরণ থেকে বেশ অনুমান করা যায়, সে সময়ের হাত পাখা আকারে ছিল বড় আর প্রকারে সুচারু কারুকার্য চিত্রিত। কাজেই এই সময়-চিহ্নিত নাট্যে নটীদের পাখার ব্যবহার আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হবে। বাহুলতার সম্পূর্ণ প্রসারণে দেহ থেকে যথাসম্ভব দূরে যদি পাখা নাচানো হয়, তবেই মনে হয় এ যুগের লোক-দেখানো আদিখ্যেতার চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আবার ভিক্টোরীয় যুগে ঐ উঁচু লম্বা টুপির বদলে এলো বনেট, পোষাকে প্রসাধনে সূক্ষ্মতা, নারী-হৃদয়ের ক্ষণিক দুর্বলতা ধরা পড়ল। কাজেই মহিলাদের হাতে পাখা এ-সময় কয়েকটি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করাই সমীচীন। যেমন ধরুন, তাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে ললাট-মণ্ডলে কোমল ব্যজনে মন্দমন্দ বায়ু বিকিরণ, অথবা শিকারী-সাক্ষাতে লতার আড়ালে হরিণের মুখ লুকোবার মতো, নির্লজ্জ-দৃষ্টি প্রিয়তম সন্দর্শনে ব্যজনিকান্তরালে তথাকরণ। এবম্বিধ ব্যবহার আদৌ বাস্তবানুগ না হ'তে পারে— কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। একটি ক্ষুদ্র পাখার সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনায় একটি যুগ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। দর্শকেরা পাখায় ভর করে অনায়াসে বিগত যুগের নির্ভুল আকাশে উড্ডীন হ'তে পারেন।

৫. বাস নয়, অন্তর্বাস

কোনো বিশেষ যুগের চেহারা পরিস্ফুটনে আবার পোষাকের আগে দরকার —পোষাকের নিচে নজর দেওয়ার। ঐতিহাসিক জামা কাপড় পরতে

গেলে আগে শরীরের তদনুপাতিক গঠন দরকার—অন্তর্বাস ইত্যাদিতে ফাউনডেশনটা তাই সঠিক হওয়া প্রয়োজন। দিন না আমায় হাড়ের তৈরী একজোড়া বডিস, কোমরের সঙ্গে আটকাবার মতো একটা লেস্, আর অন্ততঃ তিনটে থাপি পেটিকোট—তারপর যদি সর্বাংগে আমার একটা টেবল ক্লথও জড়িয়ে দেন তবু আমায় দেখে একজন আঠারো শ সত্তরের মহিলা বলে মনে হবে। আবার পোষাক পরার চেয়ে গুরুত্ব বেশি পরে চলাফেরা করার ওপর। উনবিংশ শতাব্দীর একজন মহিলা হ'তে গেলে সর্বাঙ্গে লম্বা স্কার্ট পরে চলা শিখতে হবে আপনাকে। মাথা উঁচু করে, পিঠ সোজা রেখে চলতে হবে; বসতে হবে সামনের মেঝেতে একটা পায়ের সামনে আরেকটি রেখে কোলের ওপর দু'টি হাত ভাঁজ করে।

অনেক সময় দেখা যায় আধুনিক অভিনেত্রীরা অভিযোগ করছেন, লম্বা ভারী পোষাক পরে তাঁরা ঘোরাফেরা করতে পারছেন না। এখানে আমাদের সতর্ক হতে হবে। পোষাক আছে পরার জন্যে, কাউকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধার জন্যে নয়। চলার সময় স্কার্টের যে অংশটুকু মাটির ওপর লেজের মতো ঘষ্টায় তাকে পায়ের আছাড়ে এমন ভাবে সরিয়ে দিতে হবে যেন সে চলার পথে বিঘ্ন না হয়—অথবা হাত ঝুলিয়ে তাকে কিঞ্চিৎ তুলে চলতে হবে। এ সব কিন্তু যথেষ্ট অনুশীলন সাপেক্ষ।

৫. পরিশেষে জুতো

জামা কাপড়ের সঙ্গে জুতো ম্যাচ না করলেই সব গেল। আধুনিক হাই-হিল জুতোয় বিস্তৃত স্কার্টের নীচে লঘু পদক্ষেপে রমণীয় সন্তরণের কথা ভাবাই যায় না। এর জন্যে গোড়ালিবিহীন চটি—রিবনের ফিতে পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা অথবা অল্প একটু উঁচু জুতোর দরকার। সপ্তদশ শতাব্দীতে জুতোর সামনের দিকটা ছিল চৌকো—গোড়ালি ইঞ্চি দেড়েকের মতো উঁচু। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উচ্চতা আর একটু বাড়ল।

একজনের ব্যক্তিত্ব পদাবরণে কেমন করে পাল্টে যায় তা বোঝা যাবে যখন আমরা বাইরের জুতো খুলে রেখে ঘরের চটি পরি। আর যুগলক্ষণ যে পায়ের জুতোয় কেমন করে ঠোকর খায় তা কি আর জানতে বাকি আছে কারুর ?

'..অন দি আর্ট অব পেরিয়ড এ্যাকটিং'

অনুসরণে

নির্দেশনা ও প্রয়োগকলা

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

নির্দেশনার খুঁটিনাটি, মহলা থেকে মঞ্চে, গ্রুপ থিয়েটার গ্রুপ এ্যাকটিং, শেকসপিরীয় প্রযোজনা, মহলাঘর : অনুশীলন প্রসঙ্গ, নাট্যশিল্পে অভিনবত্ব, ভবিষ্যতের প্রযোজনা, নির্দেশনা, কাজের নামে অকাজ, হাসি কান্না হীরে পান্না

নির্দেশনার খুঁটিনাটি

মূল রচনা : জন ভন ড্রুতেঁ

অনুসরণে : দীপক রায়

জীবনে প্রথম নাট্যনির্দেশনার কাজ বা দায়িত্ব কাঁধে নেবার অভিজ্ঞতাটি সত্যই বড় করুণ। এবং ভীষণ করুণই বলা যায়। পরিচালক তথা নির্দেশক হিসাবে আপনি যদি সুখ্যাতি লাভ করে থাকেন বা সুপরিচিতি লাভ করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রথম অভিজ্ঞতার কথাটি আপনার পক্ষে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। যায়ও সবাই। কিন্তু কোনো নির্জন অবকাশে আপনি সেই অতীতকালের বিশেষ কয়েকটি দিনের স্মৃতি স্মরণ করে দেখবেন, হুবহু ওই স্মৃতিটি মনে পড়লে এখনও আপনার বুক ধুকপুক করবে। করবেই। সেই প্রথম অভিজ্ঞতার মতন অতটা না হ'লেও আপনি কিছুটা বিচলিত বোধ করবেন নিশ্চয়ই।

আমি, আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, জীবনে প্রথম নাট্যনির্দেশনার কাজ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে থাকেন সকলেই। কিন্তু সেই উৎসাহিত হওয়াটা ঠিক দমকা বাতাসের ঝাপটার মতন। এককথায় বলা যায় এটি ক্ষণকালের আনন্দ। সহজ উপমা দিয়ে বোঝাবার জন্যে আমি একে একটি দেশলাই কাঠি জ্বালানোর সঙ্গে তুলনা করছি।

পরিচালক কর্তৃক অঙ্কিত 'আই লিভড উইথ ইউ' নাটকের গ্রাউণ্ড প্ল্যান

বারুদে কাঠিটি ঘষবার সঙ্গে সঙ্গে ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠল, জ্বলল খানিক, তারপর নিবে এল আস্তে আস্তে। অবশ্য আমি বলছি না, অন্তত নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে যে, এই জ্বলাই শেষ জ্বলা। বরং বলা যায় পরিচালক হিসাবে নাট্যক্ষেত্রে আগমনের পর্বটা এমন, যেন, তিন কি চারটি কাঠিঅলা একটি দেশলাই সঙ্গে আছে এবং সামনে রাখা হয়েছে একটি প্রদীপ—নির্দেশকের কাজ অনেকটা এই দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে প্রদীপের সলতেয় অগ্নিসংযোগ করার মতন। হাওয়ার প্রবল ঝাপটার মধ্যে অত্যুৎসাহের আনন্দে প্রথম কাঠি জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল, ক্ষণিক আলোর আভা ফুটিয়েই তা নিবে গেল। দ্বিতীয়বারের অবস্থাও ঠিক একই হ'ল তৃতীয় কাঠিটি হয়তো খানিক বেশি জ্বলবে; পরের বারে প্রদীপটি জ্বালানো সম্ভব হ'তে পারে। দেশলাইয়ের এই এক একটি কাঠিকে ভিন্ন ভিন্ন Production-এর সঙ্গে তুলনা করছি।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেকে বলবেন, নজির দিয়েও বলতে পারেন,

অমুক নাট্যনির্দেশক তাঁর প্রথম পরিচালনা-কর্ম থেকেই সাফল্য লাভ করে আসছেন, বা সফলকাম হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিভা বাস্তবিক ঘরে ঘরে জন্মায় না। বেশিরভাগ শিল্পী কি নির্দেশকই ঘষে মেজে নানাবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করে নেন। তাকে জানতে হয়, শিখতে হয়। অতএব এমনতর ক্ষেত্রে আবার সেই দেশলাই-কাঠি জ্বালানোর প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করছি, কেন সেই প্রথম বা দ্বিতীয় কাঠি নিবে গিয়েছিল? গিয়েছিল, কারণ. সতর্কতা সচেতনতার অভাব ছিল। সেই সঙ্গে ছিল আতঙ্ক এবং সংশয়। ইতস্তত, কুণ্ঠা, আত্ম-অবিশ্বাস যেহেতু তাকে বিচলিত করে তুলছিল, অতএব হাওয়ার তাড়না থেকে আলো আড়াল করে সে প্রদীপ জ্বালাতে পারে নি।

অভিনেতা স্তানিস্লাভস্কি

ক্রুর্তের মতন বিখ্যাত ব্যক্তি প্রথম নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন: জীবনে প্রথম নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে আমি ভয়ঙ্কর রকমের আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কাজটি যখন পেলাম, উৎসাহ এবং আনন্দ আমাকে উদ্বেলিত করেছিল। পরে ভয়ে শুকিয়ে এলাম। বহু নাটকের সঙ্গে, অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কিছু পড়াশুনাও করেছিলাম এ-বিষয়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামতে নিয়ে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, এ বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই, নির্দেশনার কিছুই আমি জানি না।

বলা বাহুল্য এই আতঙ্ক যখন আমাকে পীড়ন করছিল, ঠিক তখন আমি এমন অনেকের কথা স্মরণ করেছি। ভেবেছি তাঁরা কেমন করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নাট্য পরিচালনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছিলেন। এ-সময়ে আমি Auriol Lee-র কথাও ভেবেছি। বেশি করেই ভেবেছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, সেই সময়ে কেবলমাত্র Auriol-এর বাচনভঙ্গি ও রুচিশীল অঙ্গভঙ্গী ছাড়া কিছুই আমার স্মরণে আসে নি। ভদ্রমহিলাকে আমি আমার

এই অবস্থার কথা জানাই, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, '**পরিচালক হবার প্রথম শর্ত হ'ল অভিনয় সম্পর্কে পুরা জ্ঞানলাভ। যে পরিচালক নিজে উৎকৃষ্ট চরিত্র রূপকার নন, তিনি কখনও ভাল নাট্যনির্দেশক হতে পারেন না।**'

Auriol-এর কথামতন, পরিচালক হবার প্রথম শর্ত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। ছিল না বলেই আমার মনে হচ্ছিল, অভিনয় শেখার কাজটি নতুন করে আমাকে শিখতে হবে। কিন্তু আমার হাতে এত বেশি সময় ছিল না যে, অভিনয় শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি দিন কয়েক দিতে পারি কারণ নাটকটি পড়বার দিন ও তারিখ আমি আগেই ধার্য করে ফেলেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, নাটক পড়বার সময় মানসিক দিক থেকে আমি আরও কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। মনের আতঙ্ক কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে ততক্ষণে। ইতস্তত কুণ্ঠা আত্ম-অবিশ্বাস আমাকে নরম মাটির মতন পেয়ে বসেছিল। কোনোরকমে ওই পর্বটি সমাধা হয়। ততক্ষণে আরও বেশি অনিশ্চয়তা আমার মনে ঠাঁই পেতে বসেছে।

কী করি, এই সংশয় নিয়ে, প্রথম রিহার্সালের আগে আমি দু'জন নবীন পরিচালকের দ্বারস্থ হলাম। আলাপ-আলোচনা করছিলাম। ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, নাট্যাভিনয় ব্যাপারটা প্রথমতঃ হচ্ছে 'ভিস্যুয়াল আর্ট'। কাজে কাজেই পরিচালকের প্রথম কর্তব্য গোটা নাটকের দৃশ্যগুলি, পারলে মুহূর্তগুলির চিত্র অঙ্কন করে নিতে হবে। মঞ্চের কে কোথায় কি অভিনয় করবে, অভিনেতৃবর্গ কে কোথায় দাঁড়াবে, কে কোথা থেকে কোথায় এগিয়ে আসবে—এর হুবহু চিত্রাঙ্কন বা স্কেচ না থাকলে নাট্য নির্দেশনার কাজ করা অসম্ভব। অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে, **নাট্যনির্দেশককে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রী তথা চিত্রকলার নিপুণ শিল্পী হতে হবে।**

নবীন অভিনেতাদের আর একজন, সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পরামর্শ ও যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। করে বললেন, কেবলমাত্র অঙ্কনই শেষ কথা নয়, নাট্যনির্দেশনার সার্থকতা যে কটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তার প্রথম শর্তটি হ'ল অভিনয়ে গতিবেগ গঠন। সেটি হচ্ছে অগ্রগমনের কথা। অর্থাৎ
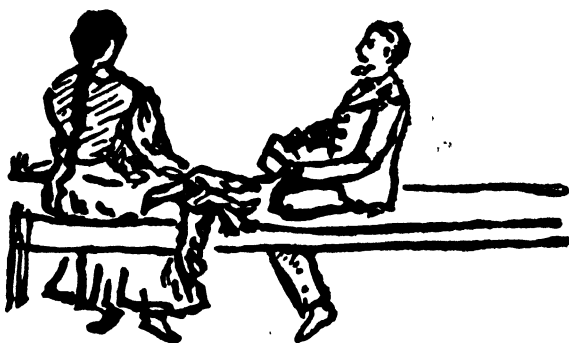
স্তানিস্লাভস্কি প্রযোজিত ও পরিচালিত 'দি সী গাল' নাটকের একটি। স্কেচ স্তানিস্লাভস্কি অঙ্কিত

অভিনয় একই ছন্দে চলতে শুরু করবে, যেন সে কখনও থেমে না যায়, এর কোথাও ঝুলে না পড়ে সেটা আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। এর জন্য আগে বিচার করতে হবে কাহিনী গঠন। গল্পটি কিভাবে আরম্ভ করা হয়েছে, কোথা থেকে তার সূচনা, এবং তার ক্রমিক গতি সমতালে এগিয়েছে কিনা, নাট্যমুহূর্তগুলির সংযোজন স্বাভাবিক হতে পারল কি না এসব ছাড়াও কাহিনীর ক্রমিক উন্মোচনের দিকটি সুপরিকল্পিত আছে কি নেই নাট্যনির্দেশককে এ-সবও দেখতে হবে, বিচার করতে হবে। সবশেষে বিচার্য, নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোথাও বাধা সৃষ্টি হয়েছে কিনা। এবং পরিণতি দৃশ্যটির রচনা নাটককে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলের মাটিতে পৌঁছে দিতে পেরেছে কি না। যদি না পেরে থাকে তবে নির্দেশক নাটকের খামতিগুলো হয় নাট্যকারকে ডেকে আবার লিখিয়ে নেবেন, অথবা নিজেকেই কলম চালাতে হবে। **নির্দেশকের ভূমিকাটি এখানে সার্থক সম্পাদকের নিশ্চয়।**

ভদ্রলোক যখন বলছিলেন, বাস্তবিক আমি আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম বেশি করে। কারণ ওঁর কথায় এমন আভাষ ছিল যে, **নাট্যনির্দেশককে একজন উৎকৃষ্ঠ কৃতি নাট্যকারও হতে হবে।** তার সাহিত্যবোধ পুরাপুরি থাকা চাই, সংলাপ রচনায় সুদক্ষ হাতও থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতএব **নির্দেশক যেমন হবেন নিপুণ সংলাপ রচয়িতা, তেমনি তার মধ্যে উন্নত সাহিত্যবোধ সম্পন্ন লেখকের মনটিও থাকা উচিত।** এসব ছাড়াও

ভদ্রলোক এ প্রসঙ্গে এমন সব বিষয়ের কথা বলেছিলেন যা আমার আদৌ জানা ছিল না। অভিনয়ে সমতা রক্ষা, মুড সৃষ্টি, একীকরণ প্রভৃতি সব কঠিন কথা। এ-সব শুনে, বলতে দ্বিধা নেই আমি বিন্দুমাত্র ভরসা তো পাচ্ছিলামই না বরং আরও বেশি করে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আমার মানসিক অবস্থা তখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, আমি প্রায় স্থির করেই ফেলেছিলাম যে, কাজটি আমার পক্ষে আয়াসসাধ্য নয় যেহেতু অতএব এই দায়িত্ব আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

দিনকয়েক পরে আমি সামান্য আশার আলোকণা দেখতে পেয়েছিলাম। অত্যন্ত নিরাশ, ভীষণ রকমের হতাশা নিয়ে আমি যখন প্রায় স্থির করে ফেলেছি যে নির্দেশনার কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, ঠিক তখন একজন প্রবীণ লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই ভদ্রলোক আমাদেরই কোনো রঙ্গশালার মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। আমাদের পরিচয় খুব গাঢ় ছিল না। বিভিন্ন সময়ের সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে জানা-চেনার ব্যাপারটাই মোটামুটি হয়। সম্ভবত ভদ্রলোক খবর পেয়েছিলেন যে আমি একটি নাটকের অভিনয় পরিচালনার কাজে হাত দিচ্ছি। প্রসঙ্গটা আগে উনি তোলেন। উত্তরে আমি আমার মনের অবস্থার কথা তাকে জানাই। বলা বাহুল্য, তিনি কিছুতেই যেন খুশী হতে পারেন নি।

"এসব বোকামি কোরো না" ভদ্রলোক আমার উপর চোখ রেখে বললেন। "নিজের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগাও। আগে দেখ তুমি যা করছ, সেটা ভাল দেখাচ্ছে কি না। অনেক নাটক দেখার অভিজ্ঞতা তোমার আছে। অভিনয়টা মোটামুটি ভাল জানো, তোমার রুচি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না। এটুকু থাকাই যথেষ্ট। তোমার যা বোধ আছে সেইটুকু সম্বল করে কাজে এগিয়ে যাও। সব কিছুই জানো এরকম ভাণ না করে, নির্দেশনার কিছু কিছু যে তোমার অজানা সেকথা অভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বলতে ভয় পেয়ো না। মিথ্যে সম্মান পাবার জন্যে নিজেকে অভ্রান্ত প্রমাণ করার কোনো মানে হয় না।"

সাহস ও স্বস্তি পেলাম। এ-পরামর্শগুলো ক্ল্যাসিকাল কি পুঁথিগত যদিও

কোনোটাই নয়, তবু নাট্য নির্দেশনার কাজ শুরু করার ব্যাপারে ঐ কথা ক'টি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করল। নাট্য রচনার জ্ঞান মোটামুটি আমার ছিল। রুচির স্বাতন্ত্র্যটি বরাবর পোষণ করে এসেছি। শিল্পসত্য সম্বন্ধে আমার কিছু নতুন কথা বলবার ছিল। পরন্তু বহু নাটক দেখার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলাম। আমি ভেবে নিলাম এগুলিই আমার পাথেয়। কাজে নেমে দেখলাম, সত্যি আমি কিছু ভুল করি নি।

নাট্য পরিচালনা সম্পর্কিত সামগ্রিক জ্ঞান আমার ছিল না। খুঁটিনাটি অনেক কিছুই আমি জানতাম না। কিন্তু পূর্ববর্ণিত কিঞ্চিৎ পাথেয় নিয়ে তিন তিনটি নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে দেখলাম, এ বিষয়ে আমি অল্প কিছু বেশী জেনে ফেলেছি। শুনলে অনেকে অবাক হবেন, পরের নাটকগুলির নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণকালে প্রথমবারের মতন প্রতিবারেই আমাকে আতঙ্কিত হতে হয়েছে। আমি দেখেছি অভিনয় সম্বন্ধীয় খটখটে তত্ত্ব ও তথ্যের বইগুলো এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকদের শিল্পসৃষ্টির নজীর আমাকে ভয় পাইয়ে দিত।

ক

এ-সময়ে আমার আরও মনে হয়েছিল, অন্ততঃ আমার নির্দেশিত নাট্যরচনা থেকে যে, নাটকের সংলাপ, সংঘাত, নাট্যমুহূর্ত গঠন কি চরিত্রগত মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব স্পষ্টভাবে নাটকে বর্ণিত না হ'লেও পরিচালনার ব্যাপারে এগুলি কোনো বাধাসৃষ্টি করে না। করে না কারণ নাটকটিকে সুষ্ঠুভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করার মূল দায়িত্বটি নাট্যকারের কিয়দংশ, পরিচালকের সবটাই। নিজের নাট্যবোধকে চরিতার্থ করবার জন্য যে ক্ষমতা পরিচালককে অর্জন করতে হয়, সেটা আসে যত ভালভাবে সম্ভব মূল নাটকটি উপলব্ধি করার চেষ্টাতে। নাটকের গঠনগত ও প্রকাশগত উপলব্ধি সকল নির্দেশকের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত একথা আমি বিশ্বাস করি।

খ.

নাট্য পরিচালকের কাছে সময় সম্পর্কিত জ্ঞান একালের একটি প্রধান অঙ্গ

বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। হয়তো একটি বিশাল কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার ছোট একটি, কি সাধারণ একটি বক্তব্য বলতে চেয়েছেন। একথা কেউ নিশ্চয় হলপ করে বলতে পারে না উৎকৃষ্ট নাট্যকারকে মঞ্চ বিষয়ে সজাগ হ'তে হয়। ওটা আলদা জিনিস। নাট্যকার তাঁর বক্তব্যটিকে প্রস্ফুটিত করার জন্যে কয়েকটি চরিত্র, কিছু ঘটনার সংযোজনার মাধ্যমে হয়তো পরিণতিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা যদি হুবহু সেই নাটকটি মঞ্চে উপস্থিত করি তবে হয়তো নাটকটি অভিনীত হ'তে চার ঘণ্টা সময় লাগতে পারে, আবার দু' ঘণ্টাতেই কোনো কোনো নাটকের কাহিনী শেষ হ'য়ে যায় এবং নাট্যকার এর মধ্য দিয়েই তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করতে পারেন। কিন্তু নাটকটি যখন মঞ্চে পরিবেশিত হ'বে, তখন তার অভিনয়কে একটি নিদিষ্ট সময়ে বদ্ধ করার দায়িত্ব নির্দেশকের। এখানে, পরিচালনার পাশাপাশি দর্শকদের কথাও নির্দেশককে ভাবতে হ'বে।

গ.

কে না জানে আজকের দর্শক চারঘণ্টা রঙ্গমঞ্চে বসে থাকতে গররাজি ; আবার দু' ঘণ্টাতেও তার মন ভরে না। তার ধৈর্যকে পীড়ন না করে, বিরক্তির সৃষ্টি না করে অভিনয় দর্শনকালে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়ে দিতে হবে যে সে রঙ্গমঞ্চে এসেছে, সামনে যা দেখছে তা নাটক নামীয় বিভ্রান্তি তথা মেকী জিনিস। কোনো পরিচালকের সাফল্য নির্ভর করে সেখানে, যেখানে সে দর্শকের মনকে নিজের মুঠোর মধ্যে ধ'রতে পারে। অর্থাৎ দর্শকের মনে এমন বোধের জন্ম দিতে হবে যে, সে যেন মনে করে সামনে ঘটা ঘটনাগুলোর সঙ্গে সেও সংশ্লিষ্ট। এজন্যে সময় সম্পর্কে নির্দেশকের জ্ঞানটি টনটনে থাকা উচিত। এই সময় সামগ্রিক অভিনয় সম্পর্কে যেমন, তেমনি নাটকের খণ্ড খণ্ড অংশ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ধরুন, একটি নাটকের অধিকাংশ অঙ্কগুলি পয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ। এবং দৃশ্যগুলি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের বৃত্তে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে যদি কোনো একটি দৃশ্য দ্বিগুণিত হয়, সেখানে দর্শকের ক্লান্তি আসাই স্বাভাবিক।

এক্ষেত্রে নির্দেশককে প্রথমে দেখতে হবে এই দীর্ঘ দৃশ্যটি Bore ক'রছে কিনা। তা' করলে দৃশ্যটির সম্পাদনা করতে হবে। তাহ'লে উক্ত দৃশ্যে এমন কিছু বৈচিত্র্য, কিম্বা নাটকীয় সংঘাত বা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে তাকে উপভোগ্য না করতে পারলে দর্শক বিরক্ত হবেন। সবচেয়ে ভাল হয় দৃশ্যগুলি মোটামুটি ছোটবড়ো একটি বিশেষ সময়ে বদ্ধ করতে পারলে। নাটকের কোথাও হয়তো একটি প্রেমবিষয়ক দৃশ্য আছে, কোথাও আছে পারিবারিক বিরোধের দৃশ্য কিম্বা হৃদয় বিদারক কোনো মর্মন্তুদ দৃশ্যও থাকতে পারে। নাটককে রসসহ করবার জন্যে কোন্ দৃশ্যে কতটা সময় দেওয়া হবে, বা দিলে দৃশ্যটি চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠবে—এ ধরনের সময় বণ্টনের কাজটি পরিচালককেই করতে হবে।

শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রেই অনুশীলন বা চর্চা শুধুমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাই নয়, সার্থকতা লাভের জন্য এর মতন প্রয়োজনীয় আর কিছু নেই। আমি এমন একাধিক অভিনেতা পরিচালককে জানি, দীর্ঘকাল কাজে লিপ্ত না থাকার দরুণ তাদের বোধবুদ্ধি ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা অনেকাংশে ভোঁতা হয়ে এসেছে। অনেকে এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে অবসর গ্রহণ করেছেন এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। অতএব চর্চা কথাটি নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য। অভিনয়জনিত মূল চর্চার ক্ষেত্র বলতে আমি রিহার্সালকেই বুঝি। বার্ণার্ড শ থেকে শুরু করে গতকাল যে তরুণ কি নবাগত পরিচালকটি নাট্যাভিনয়ের কথা ভাবছেন—সকলকেই ঠিক ওই একটিমাত্র জায়গার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে দেখেছি, দেখছি, এবং দেখবও। ভাল মহলা হয়েছে এমন ধরনের নাট্যাভিনয় খুব কমই অসার্থক হয়। অতএব পরিচালকের প্রাথমিক কাজগুলো সমাপ্ত হবার পর, নাটকটি সকল চরিত্রশিল্পীদের উপস্থিতিতে পাঠ করে ফেলা দরকার। তারপর যদি আপনি চরিত্রবণ্টন বা ভূমিকার জন্যে শিল্পী নির্বাচনের কাজটি অত্যন্ত সহজ উপায়ে করতে চান, তবে আগে থেকে নিজে শিল্পী-নির্বাচন না করে, আপনি উপস্থিত শিল্পীদের

ওপর এ-দায়িত্বটি ছেড়ে দিতে পারেন। বলবেন, কোন ভূমিকাটি কার পছন্দ এবার বেছে নাও। পরিচালক হিসাবে আপনি যদি মনে মনে শিল্পী নির্বাচনের কাজটি করে ফেলে থাকেন, তবে তা আপাতত মনেই পোষণ করুন। ফলটা তাতে ভালই হবে। ভাল হবে এদিক থেকে যে, ধরুন, একটি বিশেষ চরিত্রের জন্য বিশেষ কোনো অভিনেতার কথা আপনি ভাবছেন, কিন্তু ভূমিকা নির্বাচনের দায়িত্বটি উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে দেওয়ার দরুণ সে চরিত্রটি আর একজন বেছে নিলেন। তিনি যদি তার ক্ষমতা দিয়ে এ ভূমিকাটির রূপায়নে কৃতিত্বের ইঙ্গিত দিতে পারেন তা হ'লে আপনার বলার কিছু নেই। কিন্তু এই শিল্পী যদি অসার্থক হন, তবে তার মনোকষ্টের জন্য আপনার কোনো দায়দায়িত্বই থাকল না। এ ধরনের ব্যবহারে আরও একটি সুফল পাওয়া যায়। একথা কোনো পরিচালকই হলপ করে বলতে পারেন না, আপাত-বিচারে কোন চরিত্রে কাকে মানাবে তিনি আগে থেকে জেনে বসে আছেন।

ভূমিকা বণ্টন বা শিল্পী নির্বাচনের কাজটি সমাধা হ'লে, পরিচালকের পরবর্তী দায়িত্ব হ'ল, প্রতিটি ভূমিকার সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক কি, এর প্রয়োজনীয়তা কেন, এটি না থাকলে নাটকের কি অঙ্গহানি হতে পারত এবং চরিত্রটির প্রকৃত মানসিকতা কী. অন্যান্য ভূমিকার সঙ্গে তার যোগ, বিচ্ছিন্নতা পরন্তু পার্থক্য কোথায় এ-সব বুঝিয়ে দেবার পরই কেবলমাত্র মহলার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

রিহার্সাল চালানোর ব্যাপারটা একটি শক্ত ধরনের আর্ট। নির্দেশককে সব সময়ে মনে রাখতে হবে, সব নাটকের রিহার্সাল একই ধরনের হতে পারে না। নাটকানুযায়ী রিহার্সালের কথা চিন্তা করার কথা ভাবতে হবে আগে। কিন্তু সে ধরনের মহলা পদ্ধতি, বলা বাহুল্য অল্পই দেখা যায়। নাট্যাভিনয়ের অন্যান্য সকল দিকের অগ্রগতি ঘটলেও, মহলা বিষয়ে আমরা প্রাচীন তথা

প্রচলিত বিধিটি সর্বদা মেনে চলছি। কিন্তু আপনি যদি উৎকৃষ্ট পরিচালক হতে চান, তা হ'লে নাটকের Content ও ফর্ম বিচার করে নতুনতর পদ্ধতিতে রিহার্সাল করার কথা আপনার ভাবা উচিত। আমি নিজে রিহার্সাল করার ব্যাপারে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত উপায় উদ্ভাবনে প্রয়াসী। এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত হওয়ায়, ও সঠিক হিসাবে ভিন্নতর রিহার্সাল-পদ্ধতি গ্রহণ করায় প্রচুর সুফলও আমি পেয়েছি। কাজে কাজেই এ প্রসঙ্গে আমি সকল পরিচালককেই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করার পরামর্শ দেই এবং দিয়ে থাকি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বিশ্বাস করি। সেটি হ'ল এই যে, রিহার্সাল পদ্ধতিতে নবত্ব আনতে গিয়ে, কি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করতে গিয়ে কেউ যেন এমন কথা মনে না করেন যে, যেহেতু তিনি নতুন কথা ভাবছেন বা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন না, অতএব পুরনো প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে কিছু জানতে হবে না। স্তানিস্লাভস্কি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রিহার্সাল পদ্ধতি যদি পরিচালক না জানেন তবে তার পক্ষে নতুন ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কারের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ হবে। আমি নিজে বার্ণার্ড শ-র 'আর্ট অব রিহার্সাল' গ্রন্থটি পারলে এখনও দেখি।

মহলা দেবার নানাবিধ পদ্ধতির মধ্যে যেটি সময় এবং কষ্ট লাঘবের আর্ট শেখায় 'আর্ট অব রিহার্সাল' তারই সহজ ও বাস্তবোচিত পদ্ধতির গ্রন্থ। এ-গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হ'ল, শিল্পীর ক্ষমতা কি করে কাজে লাগানো যায়। অনেক সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত ও পথের নিশানা এতে রয়েছে। এর যে সব কথাগুলো সবচেয়ে আমাকে আকর্ষণ করে তা হ'ল এই :

> একমাত্র প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই নাট্যগত ও দৃশ্যগত দোষত্রুটি ঠিকমত ধরতে পারেন। বাদবাকি যাঁরা, তাঁরা কেবল হয়তো বলবেন : এটি নির্দোষ নয়। এখানে দোষ রয়েছে। কিন্তু কেন দোষ রয়েছে, ভুলটা ঘটেছে মূলতঃ কোথায় সেটি চিহ্নিত করতে এঁরা পারেন না। তোমার কর্তব্য, কেন ওদের এটি ভাল লাগছে না, তার কারণগুলো

জেনে নেওয়া। সবাইকে শুধতে পার, বুদ্ধি বা পরামর্শ নিতে পারো কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য কিনা সে ভাবনা তোমার। এ-সব বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ না করলেও, একথা সত্যি এরা তোমাকে অন্তত কিছু বিষয়ে সচেতন করতে পারবে।

কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক শহরে একটি নাটকাভিনয় পরিবেশিত হয় এই নাটকের অভিনয় আমি অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে দেখেছিলাম। এমন কি অভিনয়ের আগে নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিও আমি পড়ে ফেলি। বলা বাহুল্য, এটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার ও দুঃখের কারণ এই যে, এ নাটকটি অভিনয়ে একেবারেই জমল না। আগাগোড়া ভীষণ ক্লান্তিদায়ক মনে হয়েছিল। দর্শকরা বললেন: বড্ড মন্থরগতি অভিনয়। সমালোচকরা লিখলেন, 'গতিশীলতায় ভীরু নাটক ও পরিচালনা'। বললে বিশ্বাস করবেন না, এই নাটকটি অন্তত আমি যা দেখেছিলাম, তাতে হলপ করে বলতে পারি, এটি অত্যন্ত দ্রুতই অভিনীত হয়েছিল। তবে এত ক্লান্তিকর হওয়ার কারণ কী? কারণ এ-নাটকের সংলাপগুলোর অধিকাংশ বিশেষ অর্থপূর্ণ থাকায়, এবং সেগুলি দ্রুত বলার দরুণ দর্শক এতে ঠিক মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। থেমেথুমে বলার কোনো বালাই-ই পরিচালক এতে রাখেন নি। অভিনয়ও তেমনি বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়েছিল। অতএব এর ফল হ'ল উলটো—অর্থাৎ তীব্র ক্লান্তি ও গতিহীনতা। এ প্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ কি বলেন তা আমি খুঁজে বের করেছিলাম। তিনি বলেছেন:

'....যদি দৃশ্যটাই দর্শকের ক্লান্তিদায়ক হয়, তা হ'লে এ থেকে পরিত্রাণের জন্যে দশের মধ্যেকার নয়টি ক্ষেত্রেই অভিনেতার সংলাপ পরিবেশনের গতি কমিয়ে দিয়ে

কণ্ঠস্বর ও স্বরগতির বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সেই বিশেষ ও মূল অর্থটি পরিস্ফুট করে তুলতে হবে।'

এই বিশেষ ঘটনাটিতে আমি পরিচালকের ত্রুটি ধরতে পেরেছিলাম। আগেই বলেছি, এর কারণ নাটকটি আমার পূর্ব পঠিত ছিল। যদি তা পড়া না থাকত, তবে আর দশজন দর্শকের মতনই আমার মনে হ'ত নাটকটি বড্ড ক্লান্তিদায়ক। অতএব একথা আমি বলি, মুল নাটকটি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে বা পরিচয় না থাকলে পরিচালনার ভালমন্দ বিচার অত্যন্ত দুরূহ। অভিনেতার সোজাসুজি অতি অভিনয়, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কি মঞ্চের একেবারে সামনে এসে সংলাপ বলার প্রবণতা, প্রবেশ প্রস্থানে গলতি, অস্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালন—এ-সব ত্রুটিগুলো অনায়াসেই, যে কোনো দর্শকই সম্ভবত ধরতে পারেন। পুরনো দিনের অভিনেতৃদের কথা এখানে না উল্লেখ করে আমি বলব, এসব ছোটখাটো ত্রুটি হলেও, আজকের দিনে পরিচালকের এই সব সাধারণ ত্রুটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

নাটকের সকল অঙ্গের মতন মঞ্চস্থাপত্যের প্রতিও পরিচালককে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। কোনো একটি নাটকের মঞ্চসজ্জা হয়তো বাস্তব হ'ল কিংবা অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থক। কিন্তু সজ্জাটুকুই এর শেষ কথা নয়। মঞ্চসজ্জার সার্থকতা নির্ভর করে ভাল কম্পোজিশনের ওপর। মনে রাখতে হবে, মঞ্চটা শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে কথা বলবার জন্যে নয়, তাকে পুরোপুরি যদি ব্যবহার না করা যায় তবেও অভিনয়ে একটি বড় রকমের খামতি থেকে যাবে। ধরুন এ সবেই একটি নাটক সার্থক হ'ল। তাতেই কি নাট্যাভিনয় সাফল্যলাভ করবে? আমি বলব, কিছুতেই না। এর পরে পরিচালকের কাজ হ'ল নাটকটির মুল বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হতে পারছে কিনা। এবং এর মুল্যমান সম্বন্ধে দর্শকদের ওয়াকিবহাল করাও পরিচালকের অন্যতম প্রধান কর্ম। কারণ দর্শক যদি তা বুঝতে না পারে তবে তার অতৃপ্তি আসা অসম্ভব নয়।

ঋ.

আজকের দিনে, অন্তত আমার মনে হয়, খুব অল্প প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই পরিচালনা প্রসঙ্গে অত্যধিক ভাল কি মন্দ বলা হয়ে থাকে। এরূপ ভাববেন না, এর দ্বারা আমি পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ কাজ অথবা মঞ্চাভিনয়ের জন্যে তার সং প্রচেষ্টাকে ছোট করছি বা লঘু ভাবছি। আমি শুধু এগুলো কী এবং কেন—পরন্তু কতটুকু এগুলি মূল্যবান তাই বোঝাবার চেষ্টা করছি মাত্র। সাধারণভাবে এমন অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, বা প্রচলিত কিছু কথা আছে যার সঙ্গে আমি একমত নই। ধরুন, যেমন বলা হয়, 'নাট্য পরিচালক হ'ল অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টারের মতন।' কিন্তু আমার মনে হয়, তুলনাটা একেবারে মূল্যহীন বা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ নাটকটি যখন মঞ্চে অভিনীত হতে থাকে, বলতে গেলে পরিচালকের তখন কিছুই করবার নেই। সর্বশেষ ড্রেস ও স্টেজ রিহার্সাল হয়ে গেল তো, ব্যস। পরিচালকের কাজটি প্রথমতঃ এখানেই সমাপ্ত। তারপর প্রথম অভিনয় রজনীতে সে নীরব দর্শক ভিন্ন অন্য কিছু না। নাট্যকারের কল্পনাকে, চিন্তাকে, বক্তব্যকে সে নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সাহায্যে মঞ্চে উপস্থাপিত করে তাকে উর্বর করেছে, দিয়েছে জীবন ও প্রাণ এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছে।

পরিচালক কি নাট্য-নির্দেশক কথাটা নিতান্তই হালফিলের। খুঁজলে এখনও প্রমাণিত হবে, মাত্র বছর কয়েক আগে এ মানের মূল্য নিরূপিত হয়েছে। অভিজ্ঞ নাট্যামোদী মাত্রেই জানেন, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও David Belasco থেকে শুরু করে সকল পরিচালককেই 'স্টেজ ম্যানেজার' বলা হ'ত। সে দিনের স্টেজ ম্যানেজার আধুনিক পদবীতে ভূষিত হয়েছে সত্যি কিন্তু মূল কাজগুলো কিন্তু একই রয়েছে প্রায়। অতিরিক্ত কাজের মধ্যে কেবল বেড়েছে মঞ্চসজ্জার বাগাড়ম্বরতা ও আলোর কাজের বাড়াবাড়ি। আর আশ্চর্য, নাট্য-সমালোচনার ব্যাপারও একালে এইসব বাহাদুরী ধরনের বাড়তি কাজের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগের দিনে এ সবের বালাই ছিল না। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, নাটকে কেন এসব বাড়াবাড়ি প্রাধান্য পাচ্ছে, কেনই বা দর্শকরা এগুলিকে অভিনন্দন করছেন? এর উত্তর

সম্ভবত একটিই। সেটি হ'ল এই যে, চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যাপকতাই এর কারণ। দর্শকের এই চাহিদা দিনে দিনে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নাট্য-আঙ্গিককে একীভূত করতে প্রয়াসী। এমনি করে যদি আমরা কেবল দর্শক চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করি তবে আর মাত্র কয়েক যুগের মধ্যে দেখা যাবে, রঙ্গমঞ্চগুলো এক এক করে উঠে যাচ্ছে। সমগ্র শিল্পধারাটিকে গ্রাস করে ফেলেছে চলচ্চিত্র। অতএব পরিচালকদের কাছে আমার বলবার কথা এই যে, নাটকে যান্ত্রিক কুশলতার আধিক্য ঘটিয়ে এই কলারূপকে হত্যা করবেন না। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলব, আপনারা, হে প্রকৃত সমালোচকবৃন্দ, দয়া করে অভিনয়গত মানের প্রসঙ্গেই আপনাদের চিন্তা ও লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখুন। মঞ্চে যান্ত্রিক অগ্রগতিকে প্রাধান্য দিয়ে দয়া করে খাল কেটে আঙিনায় কুমীর ডেকে আনবেন না।

এ

নাট্য-নির্দেশনা প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞানীগুণী নানারকম মন্তব্য করেছেন। অত ভারী ভারী কি গুরুগম্ভীর কথা বলার অধিকার আমি চাই না। আমি অস্বীকার করি না যে, নাট্য-নির্দেশক creator নন। তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্টি-কর্তা। কিন্তু সেটি ওই নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিচালনা বাস্তবিক আলাদা কিছু হয়ে পরিস্ফুট হবে না, তার প্রধানতম কাজ হবে নাট্যরচনাটির মূল্যায়ন ও বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা।

হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন, যেহেতু আমি নিজে নাট্যকার, অতএব এই বিশেষ মতবাদের ওপর জোর দিচ্ছি বা একে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। আসলে কিন্তু তা নয়। আমি মনে করি মঞ্চকলা সংলাপের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বাস্তবিক, থিয়েটার যতদিন সংলাপের ওপর নির্ভর করবে, যতদিন পর্যন্ত থিয়েটার কাহিনীর গুরুত্ব স্বীকার করবে, ততদিন পর্যন্ত নাট্যাভিনয়কে আমার যুক্তি মেনে নিতে হবে।

কী করে নির্দেশনার কাজ সার্থকভাবে করা যেতে পারে এবং নাট্য-নির্দেশকের প্রস্তুতিপথ ও হাতিয়ার কি হওয়া উচিত? এখানে দু'টি প্রশ্ন আমি রাখলাম। বলা বাহুল্য প্রথম প্রশ্নটির উত্তর প্রতি ব্যক্তি বিশেষে

ভিন্নতর হবে। অধিকাংশ নির্দেশকই রিহার্সালের আগে কাগজে কলমে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অবস্থা ও গতিবিধির স্কেচগুলি এঁকে ফেলবেন। বার্ণার্ড শ নিজেও বলেছেন সময় বাঁচাবার জন্তে এর প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমি নিজেও প্রায়ই ওরকম করেছি; করেছি কারণ, আমার দৃষ্টিলব্ধ কল্পনা খুবই অল্প এবং মঞ্চে একদল অভিনেতা অভিনেত্রীর অবস্থান অথবা সম্পূর্ণ মঞ্চদৃশ্যটিই বাস্তবে রূপ নেবার আগে আমার দেখা দরকার বলে। বহু পরিচালক তার অভিনেতাকে বাচনভঙ্গী সহকারে কিছুই দেখান না অথবা নিজে বলে সেটাকে নকল করতেও বলেন না। তারা হয়ত এক লাইন সংলাপের অর্থ বোঝাতেই দশ মিনিট সময় নিয়ে নেন। এবারেও শ' সাহেবের সময় বাচানোর যুক্তিটাই আমার কাছে গ্রহণীয়। কিন্তু অভিনেতা বিশেষে পরিচালকের পথটিও পালটাতে হবে। কারণ, অনেক অভিনেতাই পরিচালকের বলার ভঙ্গীটি তুলতে পারে না অথবা বলতে গেলে পায়রার মত এবং যান্ত্রিক ভাবে বলে যান। এমন পরিচালকও আছেন যিনি অভিনেতার কাছ থেকে তার পার্ট সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য অথবা যুক্তি শুনতে চান না। বহু অভিনেতাকেই দেখেছি আশ্চর্য হয়ে যেতে, যখন তারা একটা কিছু ভাল মন্তব্য অথবা যুক্তি দেখালে সেটাকে আমি গ্রহণ করেছি। বেশ কিছু একনায়ক পরিচালক অতীতে এদের মনে ভয়টি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অন্য কোনো পরিচালক হয়তো দূরে অথবা পেছনে বসে থাকবেন—আর অভিনেতারা যে যার পার্ট বহুক্ষণ ধরে বলে যাবে। শেষে তিনি তার বক্তব্যটি রাখবেন। কোনো কোনো পরিচালক মঞ্চে গিয়ে অভিনেতাদের নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দেবেন তিনি কি চান। অন্যরা হয়তো অর্কেষ্ট্রার Conductor-এর মতন পরিচালকের টেবিলটি কখনই ছাড়বেন না।

অতএব প্রস্তুতি পথটি নিতান্তই পরিচালকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার মনে হয় হাতিয়ার হচ্ছে মূল্যবোধ। পরিচালকের অভিনয় জ্ঞান থাকা দরকার কিংবা অবশ্য প্রয়োজনীয়। Auriol leeর বক্তব্য ছিল: প্রত্যেক পরিচালককেই অভিনেতা হতে হবে। এটা হয়তো একটু বেশী বলা হয়েছে। কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে আশ্চর্য না হয়েই দেখবেন, অধিকাংশ পরিচালকই বাজে

অভিনেতা। কিন্তু আমার মনে হয়, নিজেরা অভিনয় করে দেখাতে না পারলেও অভিনয়কলার মূল কথাগুলো এবং কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে সেগুলো পরিচালককে জানা দরকার। তাকে শুধু কি করতে চাই জানলেই হবে না কিভাবে করতে হবে সেটাও জানা দরকার। লেখার বেলায়ও মনে হয়, এই একই নিয়ম চলে। পরিচালককে যদিও লিখতে জানার দরকার নেই, তবুও নাট্যপদ্ধতি সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। নাট্যকারের লেখার ভুল ত্রুটি ধরে দেওয়া এবং সেগুলোর কিভাবে সংশোধন করলে লেখকের কল্পনা আরও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হবে সেটা বলার ক্ষমতা পরিচালকের থাকা দরকার। যদি সত্যিই সে তা করতে পারে তাহ'লে নাট্যকার ও অভিনেতা দু'জনের প্রতিই তার বিরাট দান থেকে যাবে।

অবশেষে তার কাজ হ'ল সমালোচকের। অনুশীলনের কালে সামনে বসে দর্শকের মন নিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে অভিনয়ের প্রভাবকে বিচার করবে এবং দেখবে তার কল্পনার রূপ বাস্তবে প্রতিভাত হচ্ছে কি-না। অভিনয় এবং নাটক লেখার জ্ঞান হচ্ছে তার অর্জিত ক্ষমতা। বাকি হাতিয়ার থাকবে তার নিজের মধ্যে—তার সুষ্ঠু রুচিতে, জ্ঞানের বিচারে আর বৃহৎভাবে মানুষ হিসেবে তার সত্তায়। অন্তর্জগতের এই চেতনাগুলোর মধ্যে মনস্তত্ত্বের জ্ঞানই হচ্ছে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। তার কাজ হচ্ছে, যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেক অভিনেতাকে নিজের করে নেওয়া। কাকে উৎসাহ দিতে হবে, কাকে দাবিয়ে রাখতে হবে, কোন অভিনেতা কিছু মনে না করে সোজাসুজি সমালোচনা সহ্য করতে পারবে এবং কাকে হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে ঘুরিয়ে সমালোচনা করতে হবে—এ সমস্তই তার জানা কর্তব্য। তাকে বুঝতে হবে প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতার সীমা আছে। সুতরাং অভিনেতাকে দিয়ে তার ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে জোর করে কিছু করানো যাবে না। তাকে দিয়ে কোনো পার্ট ঠিকমত না হ'লে অভিনয়ের চরিত্র সম্বন্ধে পরিচালকের চিন্তা এবং ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। আমার বক্তব্যটুকু সাধারণ হলেও মনে হয়, এগুলো জেনে কোনো নূতন পরিচালকের পক্ষে তার নাট্যকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ হবে ; যা হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে।

'অব অব ডাইরেক্টিং'
অনুসরণে

মহলা থেকে মঞ্চে

মূল রচনা : হেরম্যান রীচ আইজ্যাকস
অনুসরণে : বিদ্যুৎ গোস্বামী

মহলা থেকে মঞ্চে—বলতে গেলে কথাটা খুবই সহজ ও সরল কিন্তু মহলা থেকে মঞ্চে যাওয়ার ব্যাপারটা তত সহজ নয়। একটা নাটককে মহলা থেকে মঞ্চে নিয়ে যাবার পদ্ধতিকে রীতিমত একটা 'অভিযান' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অভিযানের নায়ক থাকেন একজন প্রতিভাধর, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিভাসম্পন্ন নয়, এমন অনেকের মিলিত চেষ্টাতেও এই কার্য সম্পাদিত হয়।

কয়েক দশক আগে নির্দেশক নামক কোনো ব্যক্তি নাটকের পুরোভাগে থাকতেন না। থাকবার রেওয়াজ ছিল না। পুরাতন যুগে Stage manager-ই যথেষ্ট ছিলেন। নাট্যপরিবেশনার পক্ষে যেমন, তেমনি নিখুঁত নির্দেশনাকর্মেও তাঁরই কৃতিত্ব ছিল। এই জন্য, আজকের মতন তাঁকে পরিচালক বলা হত না, প্রযোজকও না। নামে Stage manager হলেও নাট্য-পরিবেশনার সকল দায়িত্ব এরাই বহন করতেন। অতীত সেই যুগগুলির নাট্যপ্রস্তুতির ব্যাপারে অনেক গল্প শোনা যায়। যেমন David Belasco (জন্ম ১৮৫৪—মৃত্যু ১৯৩১) অভিনেতৃবৃন্দকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে নাটক প্রস্তুত করতেন। একবার একটা আবেগপূর্ণ মুহূর্ত সৃষ্টি করার জন্য তিনি নায়িকাকে একটা সোনার

ব্রেখট্-এর 'দি ককেশিয়ান চক সার্কেল' এর নদীতীর দৃশ্যের একটি স্কেচ
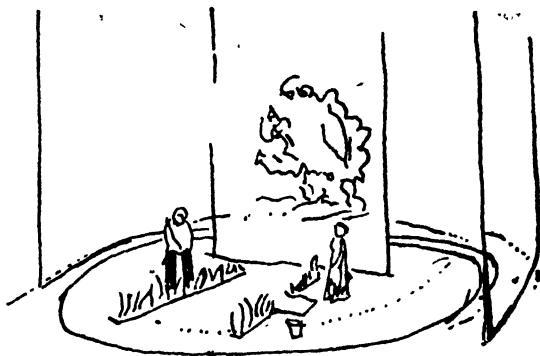
হাতঘড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বহুদিন মহলার পরেও কিছুতেই সেই নায়িকা কাঙ্ক্ষিত আবেগের শীর্ষে পৌঁছতে পারছেন না দেখে David Belasco বহুভাবে নায়িকাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলেন। তবুও ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারাতে সেই অভিনেত্রীর পায়ের কাছে সোনার ঘড়িটি ছুঁড়ে ফেললেন Belasco মূল্যবান বস্তুটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এই দৃশ্যটি অভিনেত্রীটিকে চঞ্চল করে তোলে। এর ফলস্বরূপ পরবর্তী মহলার সময় নাটকের সেই মুহূর্তটি আবেগের চরম শীর্ষে পৌঁছায়। এইভাবে নাটকের সাফল্যের জন্য Belasco সস্তার ঘড়ি বা অনেক জিনিস নিজের কাছে রাখতেন। কিন্তু সে যুগকে আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। আজকের দিনে নির্দেশক ছাড়া নাট্যপরিবেশনা সম্ভব এমন সাংঘাতিক কথা কেউ কখনই ভাবতে পারেন না ?

তাই নাট্য পরিবেশনের পূর্বে মহলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Hermine Rich Issac যে কথা বলেছেন তা শুধু Elia Kazan-এর একটি আধুনিক লোককাহিনীর নির্দেশনাকেই লক্ষ্য করে নয়—নাটকের মহলার গোড়া থেকেই, নাটক পুঁথি থেকে মঞ্চে পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত হ'বার আগে যে বাস্তব ও শিক্ষাগত আদর্শ সামনে রাখা উচিত, তারই পরীক্ষিত সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা তিনি করেছেন।

প্রথমেই মহলা কক্ষের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে আলোচনার শুরু করা যাক। ধরা যাক নাট্য-ভবনের উপরতলায় অবস্থিত একটা ঘর—চারদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র, বাক্স-পেঁটরা, চেয়ার, মই, পর্দা, র‍্যাক প্রভৃতি —উঁচু জানলার ভেতর দিয়ে দিন শেষের নিস্তেজ আলো প্রবেশ করছে— একটা ভ্যাপসা গন্ধ ও একটানা এক বৈচিত্র্যহীন সুর সেখানে বিরাজমান। এরূপ অসম্ভাব্য আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটা মোহের সৃষ্টির প্রয়োজন— যাতে ক'রে নাটক—পুঁথি থেকে মঞ্চে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে গভীর থেকে গভীরতর প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়ে জীবনকেও ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য শুরু থেকেই সে আবহাওয়া সৃষ্টি অসম্ভব। ধীরে ধীরে একে সম্ভব করে তোলাই হবে পরিচালকের কাজ।

Elia Kazan-এর নির্দেশনায় যে নাটকটির মহলার কথা Hermine Rich Issac বলেছেন, সেটি, Franz Warfel-এর উদ্ভট প্রণালীতে রচিত "Jacobowsky and the colonel"। Clifford Odets দুঃখদায়ক ঘটনার মিলনান্ত এই নাটকটির প্রথম অনুবাদ করেন এবং বর্তমানে S. N. Behrman মার্কিন রুচি অনুগামী করে এটিকে আরও সুন্দর ও গতিযুক্ত এবং সার্থক করেছেন।

প্রথম মহলার দিন অভিনেতৃবৃন্দের মনে থাকে সীমাহীন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সে দিন Elia Kazan মাঝখানে বসেছেন, আর তাঁকে ঘিরে রয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতৃবৃন্দ Oscar Karlweis (Jacobowsky'র চরিত্রাভিনেতা) Louis Calhern (Colonel-এর চরিত্রাভিনেতা), Annabela, J. Edward Bromberg, Herbert yost প্রভৃতি। অবশ্য অভিনেতারা আগেভাগেই নাটকটির প্রথম দিকের অনুবাদ পড়েছেন। নির্দেশকের কাছে নাটকটি পুরনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন ঘনিষ্ঠ, পরিচিত। দিনের পর দিন নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে তিনি সংসার করেছেন—তাদের কথা ভেবেছেন—কল্পনার সাহায্যে তাদের সম্পূর্ণ রূপকে উপলব্ধি করেছেন এবং সকল ধ্যান-ধারণার কথা লিখে রেখেছেন নিজস্ব নোটবুকে। সম্যক উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। Group Theatre-এর একজন স্নাতক হিসাবে বহুরকমের

সাংনপ্রণালী তাঁর জ্ঞাত; তা সত্বেও সেগুলোকে স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রেরণায় রূপায়িত করার কথা তিনি ভাবছিলেন। গ্রুপ ডাইরেক্টর Harold Clurman-এর মতন বিশেষজ্ঞের নাট্যচিন্তাকে তিনি এড়িয়ে যান নি। Elia Kazan নাটকের সার বস্তুটিকে আগে খুঁজে নিতেন এবং সেটাকে একটা বাক্যাংশের ভেতর ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। অনেকেই একে নগণ্য বা অতীন্দ্রিয় মনে করতে পারেন কিন্তু নাট্য পরিবেশনায় সামগ্রিক সুরকে বেঁধে রাখার পক্ষে এটি একটি সূক্ষ্ম বাস্তব পরিকল্পনা। এই পদ্ধতি Elia Kazan কে নাট্য-পরিবেশনার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, যথা অভিনয়, মঞ্চ, আলো প্রভৃতির রূপায়ণে সাহায্য করত। এইভাবেই Kazan নির্দেশিত Harriet, The Skin of our Teeth, One Tonde of Venus সফলতার ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে।

বর্তমান নাটকটিকে তিনি "আধুনিক লোককাহিনী" এই দু'টি শব্দের মধ্যে ধ'রে রাখার চেষ্টা করেছেন। লোককাহিনী বা কিংবদন্তী সাধারণতঃ কল্পনা-প্রসূত ? বুদ্ধিপ্রণোদিত এবং প্রচুর হাস্যরসে পুর্ণ। এর নাটকীয় চরিত্রগুলি হাসির হ'লেও বিশ্বজনীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক। "Jacobowsky and the Colonel"নাটকের উভয় নায়কই পৌরাণিক চরিত্রের যদিও কিন্তু এই নাটকের কাহিনী France-এর পতনের পুর্বেকার নয়। Jacobowsky একজন ভ্রাম্যমান ইহুদী ও বিশ্বনাগরিক—একমাত্র বুদ্ধিমত্তা ও অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। Colonel একজন আপোষবিহীন, বলিষ্ঠ ও কঠোর ব্যক্তি। উভয়েরই কিছু না কিছু সদ্‌গুণ আছে—কিন্তু বাঁচার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং নাটকের গল্পটি হ'চ্ছে পুরাতনের অবশিষ্টাংশ থেকে নতুনের জন্ম। এর বক্তব্যটি যদিও গম্ভীর-রসে পুর্ণ—কিন্তু গল্পটি বলা হ'য়েছে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে। নির্দেশকের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, নাটকটি নৃত্যের ভঙ্গীতে হাল্কাভাবে পরিবেশিত হবে—নাটকীয় অধিকাংশ চরিত্রগুলিকে হাস্যরসিক বলে মনে হবে—অর্থাৎ কিনা সামগ্রিকভাবে বলা চলে, মৃত্যু থেকে নতুনের জন্মলাভের একটা আধুনিক কিংবদন্তীর হাস্যরসাত্মক পরিবেশনা।

অবশ্য Kazan-এর নোটবুকে ঠাসা রয়েছে উক্ত ধ্যান-ধারণার তালিকা।

সেগুলো তাকে প্রভূত সাহায্য করেছে নাট্যকার ও দৃশ্যসজ্জাকরের সঙ্গে আলাপে। কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধির লোক। ঐ সব ধ্যান-ধারণার কথা নিয়ে অভিনেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন না—কারণ তিনি বলেন—"আমি অভিনেতৃবৃন্দের কাছে এমন কথা আলোচনা করব-না যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে না; অকারণে তাদের মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে লাভ কি?" তাই তিনি প্রথম মহলার আগে কোনোরকম বক্তৃতা করেন না। মহলার প্রথম শুরু তাঁর নাটক পঠনে। অবশ্য অভিনেতার ভঙ্গীতে নাটক পঠনের তিনি বিরোধী—তথাপি তাঁর পঠনভঙ্গীতে নাটকের ভাব এবং ভাষাগত অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায়। নাটকের কোনো চরিত্রচিত্রণে স্বীয় ধ্যান ধারণাকে অভিনেতার ওপর চাপানোর তিনি পক্ষপাতী নন। কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণ বা চরিত্রানুযায়ী সময়োপযোগী মেজাজের অনুপস্থিতি প্রভৃতির ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট তৎপর। Kazan এই নাটকের অভিনেতৃবৃন্দকে বলেছিলেন—"স্বাভাবিকভাবে নাটকটি পড়বার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সহজ-ভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন—কোনোরকম অভিনয়ের প্রয়োজন নেই—এমনভাবে পরস্পর কথাবার্তা বলুন। কার সঙ্গে কথা বলছেন সেই সম্পর্কটা ঠিক রাখুন এবং অপরে কি কথা বলছেন শুনুন। স্মরণ রাখবেন যে, নাটকটি France এর এক ঘটনাবলম্বনে—অতএব ইংরাজ এখানে ফরাসী। Polish চরিত্রগুলির (Jacobowsky, Colonel এবং অপর কয়েকটি চরিত্র) কাছ থেকে প্রকৃত উচ্চারণ না পেলেও সেই সুর বা ভঙ্গিমা যেন পাই। এ সমস্তই আমি আপনাদের কাছে প্রাথমিক পঠনেই আশা করব।"

পাঠ শুরু হ'ল—কিন্তু কিছু পরেই Kazan বাধা দিলেন। দৃশ্যটি ছিল প্যারীতে বিমান আক্রমণের থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয়স্থল এবং France এর পতনের ঠিক পুর্বে রেডিও থেকে Reymand এর বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। Arras এর কোনো বৃদ্ধা বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সজল-চোখে প্রশ্ন করছেন—"কতদিন এ অবস্থা চলবে?" নির্দেশক বৃদ্ধার চরিত্রাভি-নেত্রীকে বললেন, "মঞ্চ নির্দেশনার এখানে কিন্তু গলদ আছে। তবুও আপনি কাঁদ কাঁদ স্বরে না ব'লে এমনভাবে প্রশ্নটা করুন যেন আপনি উত্তরটা চান

অথচ জানেন যে কেউ উত্তর দানে এগিয়ে আসবে না।" "রুজভেল্ট কি পুণ-নির্বাচিত হবেন?" এমনভাবে প্রশ্নটা রাখুন।...আবার কাউকে বলেন—"দুঃখপীড়িত কোনো ভদ্রলোক নাটকের প্রথম দৃশ্যে এমন হৈচৈ শুরু করেন যে আপপাশ থেকে দর্শকদের নানা মন্তব্যধ্বনি ওঠে।" যে অভিনেতাটি হয়ত কেতাদুরস্ত ইংরাজের মতন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন নির্দেশক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "স্মরণ রাখবেন আপনি ইংরেজ নন—আপনি ফরাসী। বুদ্ধি-প্রণোদিত অথচ হাল্কা ধরনের কথাবার্তা আপনাকে বলতে হবে। গভীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা আপনি করবেন না।" Colonel এর চাকরের ভূমিকায় ছিলেন একজন হাস্যকৌতুক অভিনেতা। Kazan তাকে শৃগালের সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে, ঐরকম গোলমাল সৃষ্টিকারী হতে হবে। কেননা শৃগাল সিংহকে প্ররোচিত করে বাঘের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়—নিজে খানিকটা মাংস খেতে পাবে বলে। এই নাটকে Colonel ও যুবতী Cosette-র একটি বিচ্ছেদ দৃশ্য আছে। অভিনেত্রীটি Cosette-কে অত্যন্ত মিষ্টি ও কোমল-স্বভাব করে গড়ছিলেন—Kazan সংশোধন করার জন্য বললেন, "Cosette নম্র, লাজুক বা অবদমিত মানসিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন মেয়ে নয়, সে একজন ফরাসী মহিলা—স্পষ্টভাষী ও বাস্তবানুগ—বাইরের জগতে সহজ আনন্দে তার মন ভরপুর—এরূপভাবে রূপায়িত করতে হবে—কেন না Colonel এর অন্তর্মুখী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া চাই।" আবার কাউকে হয়ত বললেন—"ব্যাকরণগত তাৎপর্য বজায় রাখতে আপনি অভিনীত অংশের প্রতিটি যতিকে অনুসরণ করে অকারণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন; অভিনেতা হিসাবে প্রতিটি ছেদ বা যতিকে অনুসরণ করলে বাক্যের গতি ব্যাহত হ'য়ে অভিনয়ে শ্লথতা এসে পড়বে। কেননা অভিনয়াংশের প্রতিটি খণ্ড সংলাপই এক একটি বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ। অতএব সেইমত চিন্তা রেখে সংলাপ বলার অভ্যাস করা উচিত।" এইরূপে আলাদা আলাদা ভাবে সকলকে বলার পরেও সামগ্রিকভাবে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এটা বিয়োগাত্মক নাটক নয়—প্রতিটি চরিত্রকে পছন্দমাফিক হাল্কা হাস্যরসাত্মক করে তুলতে হবে।"

প্রথম দিন এভাবে Kazan ফরাসী চরিত্রগুলির গবেষণামূলক ধারণা, নাটকের রসসমৃদ্ধ গুণাবলী এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা চালালেন। তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কখনো পেছনের দিকে ফিরে যান না বরং অভিনেতৃবৃন্দকে পুরাতন আলোচনার অংশ চিন্তা করে আসতে বলেন। পরের দিন আবার পাঠ আরম্ভ হয় এবং নির্দেশকের বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে পঠনের রূপ নতুন নতুন আকার ধারণ করে। প্রথম পাঁচদিনের মধ্যেই ভূমিকালিপির সম্ভাব্য পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু সকল সময়েই নির্দেশকের অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেন অভিনেতৃবৃন্দ। থিয়েটারের দর্শকদের সামনে উপস্থিত হ'লে হয়ত দেখা যাবে যে, Jacobowsky'র চরিত্রাঙ্কনটি স্পষ্ট না হওয়াতে তারা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাই নির্দেশক আগেভাগেই সেই চরিত্রে নির্বাচন করলেন অতি উৎসাহী অভিনেতা Oscar Karlweisকে। Oscar এমনই আন্তরিক ও উৎসাহী অভিনেতা যে অভিনয়ের সংলাপ (বহু বিশিষ্টাংশে) বাদ গেলেও তিনি বলতেন যে, তিনি General হ'লে জামার কাঁধের একটি তারকাচিহ্ন বাদ দিলেও নিজেকে সুন্দরতর মনে করতেন। নির্দেশক Kazan অবশ্য দৃশ্যের সময় সংক্ষেপ করার জন্যে 'Jacobowsky'র অনেকগুলি দীর্ঘ সংলাপের বহুলাংশ কর্তন করেছেন আবার অনেক নতুন সংলাপ যোজনাও করেছেন। Behrman অবশ্য সেগুলোকে পরে সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রাথমিক অবস্থায় নায়কদ্বয়কে নাটকটি একা একা পঠনের বহু সুযোগ নির্দেশক দিয়েছেন—যাতে গোড়া থেকেই চরিত্রগুলি সম্পর্কে এমন একটা পরিষ্কার ধারণা তাদের মনে জন্মায় যা ভবিষ্যতে পরিবর্তনের প্রচুর অবকাশ থাকবে না।

চতুর্থ দিন থেকে রীতিমত কাজ শুরু হ'ল। মহলার ঘরটিকে অল্পবিস্তর গুছিয়ে ফেলা হ'ল। মেঝেতে খড়ির দাগ দিয়ে মঞ্চের সীমারেখা টানা হ'ল—দরজা জানলার অবস্থান ঠিক করা হ'ল—বাক্স, চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হ'ল—প্রথম দৃশ্যের মেঝের নক্সার একটা ব্লু-প্রিন্ট দেওয়ালে টাঙানো হ'ল—তার নীচে আর একটি কাগজে Polish নামগুলির শাব্দিক উচ্চারণ লিখে টাঙানো হ'ল। অভিনেতারা

স্ব স্ব চরিত্রচিত্রণের অভিনয় শিক্ষা করতে লাগলেন। যে সব অভিনেতা সেই দৃশ্যভুক্ত নন তাঁরা ঘরের চারদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে নিজেদের পার্ট বলছেন ও মুখাবয়বের নানা ভঙ্গীমার উৎকর্ষসাধনে ব্যস্ত। থিয়েটারের ব্যাপারে অদম্য উৎসাহী ছাড়া কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে এই আবহাওয়ার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

ঘরের যে অংশটুকু মঞ্চ হিসাবে সীমায়িত করা আছে Kazan সেখানে কর্মব্যস্ত। দৃশ্যটিকে কিভাবে সাজানো হবে—কোন্ অভিনেতা কোন্ অবস্থায় কোথায় থাকবেন—ঠিক ঠিক সময় কিভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য হাতের কাছে পাবেন প্রভৃতি। মহলার ঠিক এই মুহূর্তে একমাত্র নির্দেশকই প্রতিটি অভিনয়াংশ, তার প্রয়োজনীয় প্রয়োগ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে গোটা নাটকটার একটা সম্যক উপলব্ধির ধারণা নিয়ে সেখানে উপস্থিত। কোথায় সংলাপ চড়া সুরে—কোথায় আস্তে—কোথায় টেনে—কোথায় খাদে প্রভৃতি সর্ববিষয়ে একমাত্র নির্দেশকের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নির্দেশক হিসাবে Kazan প্রথম দৃশ্যেই নাট্য-চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুব সচেতন—কারণ পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে ঐ সম্পর্কের ব্যাপার দর্শকমনের চিন্তার কারণ না হ'লে তারা সোজাসুজি নাটকের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। মহলার সময় নির্দেশকের কর্মব্যস্ততা এতই যে তখন তাকে দেখে মনে হয় যেন তিনি সেই মুহূর্তে ভাগ্যগ্রহ—যাকে যেভাবে খুশী চালনা করছেন, কথা বলাচ্ছেন—অভিনেতারা শুধুমাত্র ইঙ্গিতে চলন-বলন-পঠন অভ্যাসে মগ্ন। তিনি ছাড়া আর কারও বোঝার অবকাশ হচ্ছে না যে কল্পিত মঞ্চে বা নাট্যপ্রস্তুতির অস্থায়ী কর্মক্ষেত্রে তারা তখন ডুবে আছে। এভাবে গোড়ার দিকে নিজেই Engine হ'য়ে তারই পাতা লাইনের ওপর দিয়ে সকলকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নির্দেশক। অবশ্য প্রত্যেকের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও তর্ক বিতর্কের বক্তব্য শোনার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়ে চলেছেন।

প্রথম অঙ্কের গোড়াতেই রেডিও মারফৎ Reymand এর শেষ বক্তৃতা—একটা সমস্যার কারণ হয়ে উঠল। বক্তৃতার অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"অবস্থা গুরুতর কিন্তু আয়ত্বের বাইরে নয়—Somme-এ আমাদের

বীর সৈন্যেরা তাদের মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা করার জন্য অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যার গরিষ্ঠতা ও সাজ সরঞ্জামের প্রাচুর্য আমাদের প্রস্তুতিকে..." Kazan দৃশ্যটিকে অত্যন্ত উঁচু পর্দায় শুরু করতে চান। তিনি একজন অভিনেতাকে দিয়ে ঐ কথাগুলো বলালেন। Oscar Karlweis সেটা শুনে মন্তব্য করলেন যে ফরাসীর প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা হিসাবে বলাটা অত্যন্ত দুর্বল ও একঘেঁয়ে লাগছে। নাটকীয় প্রভাব বিস্তার ও বাস্তবতার মধ্যে এটি চিরন্তন দ্বন্দ্ব। Kazan অবশ্য নানা-ভাবে অনেককে দিয়ে সেই বক্তৃতাটা পড়ালেন কিন্তু সিদ্ধান্তটা কাউকে জানান নি।

প্রথম দৃশ্যের শীর্ষস্তরে দেখা যাচ্ছে একজন অনপকারী বৃদ্ধা চিৎকার ক'রে বলছেন—"আমার মেয়েই ঠিক বলেছে—ফ্রান্সে একজন Hitler প্রয়োজন!" তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা—তারপর Jacobowsky মুখ খুললেন—"ভদ্রমহোদয়া কিছুই ভাববেন না, তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। মাথার সামনের চুল ও গোঁফ সে শীঘ্রই পাবে।" এটাই Jacobowsky-র প্রথম গভীর মুহূর্ত। অতএব বাচনটা খুব দ্রুত এবং জোরদার হবে। Kazan বোঝালেন যে সংলাপটি অত্যন্ত দ্রুত শেষ করে তার যন্ত্রটি তুলে নিয়ে শীঘ্র বেরিয়ে যেতে হবে। নির্দেশক ও অভিনেতা বহুবার এই মুহূর্তটির উপর মহলা চালালেন—কেন না সময় এবং দূরত্ব দু'টোই এক্ষেত্রে কম করার দরকার।

একসময় Calhernকে তাঁর অভিনয়াংশের কোনো এক জায়গায় নির্দেশক একটা ধারণার কথা বললেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বললেন যে সঠিক বলে মনে না হ'লে বাদ দিতে। আবার কোনো এক সময় Karlweis যখন কোনো এক নাট্যমুহূর্তে কোমর ভেঙ্গে, ঝুঁকে পড়ে একটা কথা শুনছেন Kazan চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, "অতি উত্তম, Oscar এইটা চাই।" Arras-এর বৃদ্ধাকে সর্বদা সঙ্গে একটা বালিশ বহন করার নির্দেশ তিনি দিলেন এবং একথাও বলে দিলেন—কখনও বালিশের ওপর বসতে, কখনও তার তুলো ওড়াতে—কখনও তাকে সাজিয়ে রাখতে—কখনও ছুঁড়ে ফেলতে প্রভৃতি। এসব বলার পর নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ দিয়ে উঠলেন Kazan. কখনও Joe

Bromberg-এর সঙ্গে নিজেই অভিনয় করে সংঘটনকালের কঠিন একটা সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। নিজেই নাচতে নাচতে হঠাৎ ঘুরে ফেলে আবিষ্কার করলেন একটি লম্ফনযুক্ত পদক্ষেপের এবং সেই ধারণা জোগালেন Karlweis-এর মনে। কখনও ধারে দাঁড়িয়ে অভিনেতাদের চলাফেরা লক্ষ্য করছেন, কখনও পুঁথিতে কি সব লিখছেন, এইভাবে থিয়েটারের মহলা চলেছে পুরোদমে এবং সেখানে তিনি কেন্দ্রবিন্দু।

আটাশ দিন মাত্র মহলার সময়, কারণ সেটা পেশাদারী মঞ্চের নাটক। কত আশ্চর্য ঘটনা এর মাঝে ঘটে যাচ্ছে। মাত্র দু'দিন মহলার পর হয়ত' Jacobowskyর কর্মবহুল দৃশ্যের সেটটি অন্য কোনো রঙ্গালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। নির্দেশককে হয়ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিত্যাগ করে নিশ্চুপ ব'সে থাকতে হয়েছে—যখন হয়ত অভিনেতারা চরিত্রচিত্রণে ব্যস্ত। এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কারণ হঠাৎ অব্যবস্থার সম্মুখীন হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। বহুবার বহু অভিনেতাকে আক্ষেপের সুরে বলতে শোনা গিয়েছে—"সাতাশ তারিখে নাটকের উদ্বোধন হবে না।"

Elia Kazan-কে সারাজীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে—তা সত্ত্বেও তাঁকে কখনো উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় নি—এঁকেই বলে নির্দেশক।

'এলিয়া কাজান ডাইরেক্টস
এ মডার্ণ লিজেণ্ড
অনুসরণে

গ্রুপ থিয়েটার: গ্রুপ এ্যাক্টিং

মূল রচনা: স্টেলা এডলার

অনুসরণে: ভরত আচার্য

গোড়ার দিকে গ্রুপ থিয়েটারে যে সব অভিনয়-শিল্পী নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল তারা নানান সামাজিক পরিবেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁদের কারিগরীবুদ্ধি, প্রতিভা এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যের স্তরও ছিল বিভিন্ন। কেউ ছিলেন আদর্শবাদী, কেউ ছিলেন স্বপ্ন-বিলাসী, কেউ-বা সুযোগ সন্ধানী, আবার এমন কেউ কেউও ছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই তিনটি গুণেরই সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন নিজের মধ্যে। একজন ভাল অভিনেতার ভেতরে এই সব বিচিত্র গুণের একত্র সমাবেশ অস্বাভাবিক নয়, অদৃষ্টপূর্বও না।

এর চেয়ে কম সমগুণবিশিষ্ট লোকজন জোগাড় করা মুস্কিল। যদি জোগাড় হয় তাহ'লে তাদের একটি আঁসাম্বল-এর উপযোগী করে গড়ে তুলতে চাই দূরদৃষ্টি, সাহস এবং কঠিন ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি থাকলে হঠাৎ দেখা যাবে প্রথম থেকেই এদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মিল রয়েছে; যেমন, তাদের সব সময়ে কাজে নিযুক্ত থাকার ভীষণ প্রয়োজন আছে, জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন আছে, আর শিল্পের স্তরে নিজেদেরকে শিল্পী হিসেবে উন্নত করে গ'ড়ে তোলবার গভীর প্রয়োজনবোধও রয়েছে। গ্রুপ

গঠনের একেবারে গোড়ার দিকে থিয়েটার সম্বন্ধে অগ্নিবর্ষী এবং উদ্দীপণাময় আলোচনা শুনেই এদের মধ্যে অনেকে এই নতুন থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সব আলোচনায় থিয়েটারকে বিশ্লেষণ করা হ'ত, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে বিচার করা হ'ত, আবার নতুন আকার দেওয়া হ'ত এবং নতুন যে থিয়েটার গ'ড়ে তোলা হবে তাতে শিল্পীর ভূমিকা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ত। ফলে শিল্পীদের মন প্রথম থেকেই এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। এবং বোঝবার চেষ্টা করেছে। ক্রমে এর ভেতর থেকে দু'টি চিন্তাধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা তাদের আকর্ষণ করে এবং চ্যালেঞ্জও করেছে। এই দু'টি চিন্তাধারার মধ্যেই গ্রুপ থিয়েটারের পরবর্তীকালের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিধৃত। যারা এগুলি মেনে নিয়েছিল তারাই এই থিয়েটারের প্রতি অনুগত্য বজায় রেখে টিঁকে গেছে শেষ পযন্ত।

এর প্রথম চিন্তাটি শিল্পীকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'তে আহ্বান জানায়। তার নিজের কোনো সমস্যা আছে কি? নিজের জীবন এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্যাটি সে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে কি? এবং এ-সব সম্বন্ধে তার নিজের কোনো মতামত সে ঠিক ক'রে নিতে পেরেছে কি?

এই মতামত ঠিক করাটা যে অত্যন্ত দরকার, শিল্পীকে এ কথা বলা হ'ত। কোনো কিছুই নির্দ্বিধায় মেনে না নিয়ে তাকে সব দিক থেকে বিচার ক'রে দেখে নিজে বুঝতে, শিখতে হবে। এবং এর ফলে নিশ্চিতভাবে সে নিজেকেই আরও ভালো ক'রে বুঝতে, পারবে। থিয়েটারের সকল শ্রেণীর সহকর্মীর সঙ্গে একটা সাধারণ সমঝোতা থাকলে শিল্পের কাজে শিল্পীরও অত্যন্ত সুবিধা হয়। শিল্পীকে বলা হ'ত: এই জীবনবোধকে নাটকের ভেতর দিয়ে দর্শকের কাছে পৌছে দেওয়াটাই হচ্ছে সর্বাধিক প্রয়োজন। এবং সত্য ও শিল্পসম্মতভাবে এই কাজটি করবার পক্ষে উপযুক্ত নাটকীয় উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বার করাই হ'চ্ছে একমাত্র কাজ।

দ্বিতীয় চিন্তা হচ্ছে অভিনয়শিল্পী ও তার শিল্পকর্ম সম্পর্কে। নিজের শিল্প-কর্মের ভেতর দিয়েই শিল্পী হিসেবে তাকে বড় হতে হবে। সব অভিনয়-

শিল্পীকে একই মৌল শিল্পকৃতি অনুসরণ করতে হবে। এই ভাবেই প্রকৃত 'আঁসাম্বল্' সৃষ্টি হবে।

এই দু'টি চিন্তাধারা যখন শিল্পীর মনে দাগ কাটল তখনই সে বুঝতে পারল এই থিয়েটার তার কাছে একটি জটিল শিল্পনীতির মৌলবোধ দাবী করছে। নাট্য-ঘটনায় বিধৃত জীবনদর্শন সম্পর্কে অভিনয়শিল্পী, মঞ্চরূপকার, নাট্যলেখক, নির্দেশক—থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি লোকের একমত হওয়াটা অত্যাবশ্যক। এই সব শিল্পীদের কাজ হবে নিজের বিশেষ শিল্প-মাধ্যমে সেই জীবন-দর্শনকে সর্বোত্তমভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করা। থিয়েটারের এই আদর্শটি হাজারো রকমে বারবার লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবং এর মৌল দার্শনিক তত্ত্বটি কখনোই পরিবর্তিত হয় নি।

প্রত্যেক অভিনয়শিল্পী কমবেশি এই তত্ত্বটি বুঝতে পারছে, এটা ধ'রে নেওয়া হ'ত—ব্যক্তিগতভাবে কার ভেতর এই বোধ কতটা একেবারে স্বভাবে মিশে যাচ্ছে তা বলা শক্ত ছিল। প্রত্যেক শিল্পীই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব'লে—শুনতে সকলের ভালো লাগলেও, কাকে কি পরিমাণ সাহায্য করছে সত্যি সত্যি এ-সব কথা, তা থেকে বোঝা যেত না। এমন লোক ছিল যারা হয়ত সত্যিই বুঝত। অন্যেরা চেষ্টা করত বোঝবার—পরস্পরকে বোঝাবারও চেষ্টা করত। কিন্তু কোনো শিল্প নীতি বা বুদ্ধিমার্গের তত্ত্বকথা যখন মাথায় ঢোকে না তখন বেশিরভাগ শিল্পীই কিন্তু তাতে লজ্জিত হয় না। সকলেই বুঝত, এ-সব তত্ত্ব কাজে পরিণত করতে পারলে খুবই উপকার হয়। কিন্তু কী ভাবে করা হবে সেটা? কাজের মধ্যে দিয়েই তো করতে হবে?

অবশ্য হ'তও তাই। প্রত্যেক অভিনয়শিল্পী দেখতে পেত, প্রতিটি শিল্পীর নিজস্ব বিশেষ শিল্প মাধ্যমের ভেতর দিয়ে নাটকের সামগ্রিক লক্ষ্য বা আদর্শটিকে কেন্দ্রমুখী করা হচ্ছে: নাট্যলেখকের মূল আদর্শের প্রতি নির্দেশকের পুনর্লিখনে, মঞ্চরূপকারের সেট তৈরীর কাজে, নাটকের মূল আদর্শের প্রতি নির্দেশকের অঙুলি সংকেতে এবং অভিনয়-শিল্পীর অভিনেয় চরিত্রের বোধের বিবর্তনে ক্রমশঃ এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠত। এই বোধই অভিনয়শিল্পীর সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে—সুতরাং তার অভিনয়কেও পরিচালিত করত। এই ভাবে

ধীরে ধীরে সারা বছর কাজ করার পর সে বলতে পারত মূল নাট্যচিন্তাটি তার ভেতরে একেবারে মিশে গেছে। প্রধাণতঃ এই অভ্যাস এবং নতুন থিয়েটারের ভাবাদর্শের সম্পর্কে নিজেকে নতুনভাবে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টার ফলেই সে গ্রুপ থিয়েটারের কল্যাণে জীবনের অন্য অনেক মূল্যবান বস্তুও অনায়াসে ত্যাগ করার কাজ সহজ হয়ে উঠেছিল।

এই উদ্দেশ্য সাধনে শিল্পীকে সাহায্য করার ব্যাপারে গ্রুপের চেষ্টার পদ্ধতি এদেশে অভিনব। প্রত্যেক শিল্পীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে বিচার করা হ'ত। শিল্পীর উন্নতিই ছিল কাম্য। তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে—অভিজ্ঞতা, সহজাতবোধ ও প্রতিভা দিয়ে যাতে সহজে সে সেই দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার জন্যেই চেষ্টা করা হ'ত। এর জন্যে একটা মৌল শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন ছিল। অন্য সকলের মত অভিনয়শিল্পীরও ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে। এই সব সমস্যা বোঝা দরকার, মানা দরকার এবং তার সমাধানে যতটা পারা যায় সাহায্য করা দরকার, একথা স্বীকৃত হয়েছিল। তার অর্থনীতিক, ব্যক্তিগত এবং শিল্পগত সমস্যা থিয়েটারেরই প্রত্যক্ষ সমস্যা বলে স্বীকৃত হ'ত। শিল্পীকে বোঝা এবং তাকে সাহায্য করার ওপরই শিল্পী হিসাবে তার উন্নতি যে অনেকখানি নির্ভর করে, একথা খুব সত্যি। এই থিয়েটার যে ভাবে গঠিত তার ফলে এই থিয়েটারই তাকে অর্থনীতিক, শিল্পগত অন্যান্য নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে—কাজেই সহানুভূতি ও সাহায্য ছাড়া কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই থিয়েটারে কোনো শিল্পীকে হঠাৎ একদিন হয়ত অসম অভিনয় করতে দেখা গেল। বোঝা গেল, তার ভেতরে কোনো সাংগঠনিক শৃংখলা-ঘটিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে সম্পর্কে বোঝাপড়া করা হ'ত। অন্য কোনো অভিনেতা হয়ত কোনো না কোনো রকমের অসহনীয়তা বা বিরক্তির জন্য যথোপযুক্ত আবেগ প্রকাশ করতে পারল না—তাকে আবার বোঝানো হ'ত, নতুন ক'রে শেখানো হ'ত। সলজ্জ ভাব থেকে বা নিরাপত্তা বোধের অভাব থেকে কোনো অভিনয়-শিল্পীর প্রতিভা ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে ব'লে লক্ষ্য করা গেল। তার ব্যক্তিগত এই সমস্যা তার অভিনয়কে নষ্ট করছে, অন্য অভিনেতাদের কাজকে,

নাটককে, প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারকেই নষ্ট করছে, তৎক্ষণাৎ তাকে সাহায্য করা এবং বোঝানো হয়েছে যাতে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়া দিয়ে নিজের কাজে তথা থিয়েটারের কাজে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারে।

গ্রুপ থিয়েটার কখনোই এ-কথা মেনে নেয় নি যে, কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা আছে বা সাফল্যেই জয়টীকা আছে বলেই কোনো অভিনয় শিল্পী নতুন থিয়েটার গ'ড়ে তোলায় সাহায্য করতে পারেন। গ্রুপে কাজ করতে ইচ্ছুক এরকম বহু অভিনেতা এর জন্যে বিব্রতবোধ করেছে। যারা এই থিয়েটারের সামগ্রিক আদর্শকে মেনে নিয়েছে এবং তার ফলে এর ভেতরে তার নিজের অবস্থিতি সম্পর্কে যারা সচেতন, বিশেষ ক'রে অভিনয় শিল্পীর অহমিকার ব্যাপারে যারা অত্যন্ত পরিষ্কার তারাই প্রথম থেকে গ্রুপ গঠনে উদ্যোগী। 'আঁসাম্বল' ব্যাপারটার প্রকৃতিই এমন যাতে এই ধরনের মনোভাব দরকার হয়। প্রথম থেকেই এটা বোঝা গিয়েছিল, অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হবে—বিশেষ ক'রে অভিনেয় ভূমিকার ব্যাপারে বা বেতনাদির সম্পর্কে তো করতেই হবে। বোঝা গিয়েছিল, এই থিয়েটার করতে এলে তার জন্যে দুঃখ বরণের উপযুক্ত শক্তিও সঙ্গে আনতে হবে। অনেকে এই দুঃখ বরণের শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, অনেকে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রুপ গঠনের গোড়ার দিকে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক অভিনয়-শিল্পীই স্তানিস্লাভ্স্কি-শিক্ষাপদ্ধতি অনুশীলন করেছিল। বিভিন্ন পরিবেশে নানাস্থানে মঞ্চাভিনয় ক'রেই (ব্রডওয়ে, লিট্‌ল্ থিয়েটার, স্টক প্রভৃতি) বেশির ভাগ লোকেরা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। অনেকের এই রকম কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাই ছিল না। স্তানিস্লাভ্স্কি নাট্যাভিনয়ের এক সম্পূর্ণ নতুন দিকদর্শন নির্ণয় করেছিলেন যা রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটার অনুশীলন করছিল। যখন ঐ থিয়েটার সম্প্রদায় এখানে এসেছিল তখন আমরা 'আঁসাম্বল এ্যাক্টিং' বা দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের এক নতুন উচ্চমানের নিদর্শন দেখলাম। স্তানিস্লাভ্স্কির দু'জন প্রধান শিষ্য বোল্স্লাভ্স্কি এবং মাদাম আউস্পেন্স্কায়া প্রথম কয়েকজন তরুণ আমেরিকান অভিনয়শিল্পীকে এই বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দেন। গ্রুপ থিয়েটার এই পদ্ধতিকে অভিনয় শিল্পীর পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ

ও সৃজনধর্মী শিক্ষারীতি বলে মনে করে এবং গ্রুপের সৃষ্টিকাল থেকে—একটু বিশেষভাবে হ'লেও—এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে।

স্তানিস্লাভস্কি-পদ্ধতি ব্যাপারটি জটীল এবং ওটা ব্যাখ্যা করাও কঠিন। স্তানিস্লাভস্কি নিজেই জানতেন এভাবে তাঁর অভিনয়রীতিকে নিয়ম কানুনে বাঁধতে যাওয়ার বিপদ আছে। তবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এবং সোজাসুজি বলতে গেলে বলা যায়, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে প্রথম মঞ্চের ওপর তার কাজ, নাট্যঘটনার সত্যতা, কল্পনা, কার্যকারণের যুক্তি এবং ভাবাবেগ সম্পর্কে নিজেকে অত্যন্ত খাঁটিভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী নানাভাবে নিজের শিল্পবুদ্ধিকে আবিষ্কার করতে শেখে এবং কোনো কিছু অনুমান বা অনুকরণ না ক'রে প্রত্যেকবার নতুন ক'রে প্রয়োজনীয় ভাবাবেগকে সৃষ্টি করতে পারে। এ হচ্ছে শিক্ষার অন্তর্গত ব্যাপার, এটাই শেষ নয়। এই পদ্ধতির শেষ কথা হ'চ্ছে অভিনেতার নিজের পক্ষে অভিনেয় চরিত্রকে সত্যি ক'রে ব্যাখ্যা করতে পারা। নানা কারণে গ্রুপ প্রথম দিকে কোনো নাটকের মহলা দেওয়া শুরু ক'রে তার ভেতরেই এই শিক্ষার কাজটা চালানো যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। কোনো একখানি নাটক পড়া হ'ত, বিশ্লেষণ করা হ'ত এবং সেই বিশ্লেষণের মধ্যে নাট্য-লেখকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হ'ত। তারপর অভিনয়শিল্পী নিজের ভূমিকা অনুশীলন করতেন। এই প্রথম দিককার মহলাতেই স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতিতে শিল্পীর প্রাথমিক শিক্ষা হ'ত।

মহলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের যে বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করা হ'ত তাতে অনেক অভিনেতা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করত। তবে অনেকে আবার আরো ধীরে ধীরে নাটকের ভেতরে প্রবেশ করবার পক্ষপাতী ছিল। বারবার মহলা দেওয়ার ভেতর দিয়েই তারা ভূমিকা ও নাটক বুঝতে চাইত এবং চরিত্রটি আপনিই ক্রমশঃ তাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠুক, এটাই তারা চাইত। নির্দেশকের বোধ থেকে বুঝে নিয়ে কাজ করার চেয়ে এরা নিজেরা চরিত্র সৃষ্টি করাতে অনেক বেশি খুশী হ'ত। নির্দেশক ক্রমশঃ বুঝলেন, নাটক বিশ্লেষণ করার রীতিতে জোর দেওয়ায় শিল্পীর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ছে—সুতরাং সেটা পরবর্তীকালে কমিয়ে দেওয়া হ'ল। পরে

'Affective Memory Exercise'-এর ওপর এবং 'Action' ও অন্যান্য রীতির ওপর জোর দেওয়া হ'ল।

কিছু সংখ্যক অভিনয়শিল্পী মহলার বাইরে যে ক্লাশ হ'ত তাতে যোগ দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করত। কল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টি করার ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে এ-সব করা হ'ত। দীর্ঘ তিন বছর ধরে গ্রুপ এই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে কাজ করেছে এবং এই সময়ের মধ্যে ছ'খানি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। ১৯৩৪ সালে এসে অভিনয়শিল্পীর অনুশীলন পদ্ধতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। অভিনয়শিল্পীর প্রকৃত ভাবাবেগ সচেতনভাবে উদ্বুদ্ধ করার ওপরই এতদিন অত্যন্ত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে— অধিকাংশ শিল্পী এখন এই চেষ্টা ত্যাগ করলেন। স্তানিস্লাভস্কির নিজের নির্দেশেই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হ'ল। যেখানে গ্রুপ তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল করেছিল সেই জায়গাটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেল অর্থাৎ জোর দেওয়ার জায়গাটা পরিবর্তিত হ'ল। এখন থেকে নাটকের বিভিন্ন ঘটনাগুলোর ওপর—সেই ঘটনা সম্পর্কে অভিনেতার কাজের গভীরতর আন্তর যুক্তির ওপর এবং সেই যুক্তি আরও সচেতনভাবে কাজে লাগাবার ওপরই বেশি ক'রে জোর দেওয়া হ'তে লাগল।

এই পদ্ধতিতে মঞ্চ-ঘটনার কার্যকারণের যুক্তির ওপর জোর দেওয়ায় অভিনেতা ও নির্দেশক উভয়েই লাভবান হ'তে লাগলেন। তবে তা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন প্রবর্তনের পূর্বে দলগঠনের প্রথম থেকেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত এমন একটি 'আঁসাম্বল' তৈরী হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত ওদেশে আর ছিল না। এর পর বছরের পর বছর ধরে গ্রুপ থিয়েটারের কাজে এই 'আঁসাম্বলের' শক্তি বা মান কখনোই নীচে নামে নি। গ্রুপ সম্বন্ধে লোকেরা বলত, 'Skilful and inspired', 'এদের অভিনয়ে এদের আদর্শের প্রকাশ', 'নাটক প্রযোজনা করার একমাত্র সত্য পদ্ধতিই হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার-পদ্ধতি'। আর একটু বেশী বলা যায়—বলা যায়, প্রথম নাট্য-প্রযোজনা থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ-প্রবাহ কেবল মাত্র কয়েকজন অভিনেতার মধ্যেই নয়, দেশের সমগ্র নাট্যজগতের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। সমষ্টিগত চেষ্টায়, সমগ্র দলের ঐকান্তিকতায়,

উৎসাহে, উদ্দীপনায় আদর্শানু-রক্তিতে প্রত্যেকটি নাট্য-প্রযোজনা এমন এক উচ্চাদর্শের সুরে বাঁধা থাকত, যা তাকে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষত্বের উর্দ্ধে এক মহত্তর শিল্প-অর্থে উত্তরণ করাত।

গ্রুপ থিয়েটার প্রোডাক্সসের অপারেটিং রুম

শিল্পীর কাজে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'লেও প্রথম থেকেই অনেক শিল্পীকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এটা বিশেষ ক'রে এই জন্যেই হ'ত যে, শিল্পীকে তার 'Affected Memory' ব্যবহার ক'রে মনের অচেতন অংশকে সচেতনভাবে কাজে নিযুক্ত করবার অভ্যাস করতে বলা হ'ত। শিল্পীর সম্বন্ধে স্তানিস্লাভস্কির কার্য-পদ্ধতিতে একটা সামগ্রিক আদর্শ আছে। সমস্ত রকম বাধা মুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবাবেগ আনবার সচেতন প্রচেষ্টার পদ্ধতি এতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং প্রথম থেকেই অধিকতর অভিজ্ঞ অভিনেতারা এই পদ্ধতিতে কাজ ক'রে বেশি লাভবান হতে লাগল। তারা জানত, তারা অভিনয় করতে পারে—করেছে—পেশাদারী মঞ্চের প্রয়োজন অনুসারে তারা কাজ করেছে। কাজেই অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত মঞ্চ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস তারা অনায়াসে আনতে পারত। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা নতুন ক'রে স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতি অনুশীলন করতে লাগল। অভিনয়ের নতুন পদ্ধতিতে তারা নিজেদের আরও জীবন্ত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবাবেগ আনতে আরও বেশি করে সক্ষম ব'লে বুঝতে পারল। তারা নিজেদের এই উন্নতি উপলব্ধি করার ফলে প্রতি অভিনয়ে এক একটি ভূমিকাকে নতুনতর ক'রে সৃষ্টি করতে সমর্থ হ'তে লাগল।

অন্যান্যেরা—যারা অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং কম পরিশ্রমী—তারা আক্ষরিকভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চলল। এদের মধ্যে অনেকেই অভিনয়শিল্পী হিসেবে কোনো উন্নতি করতে পারল না—শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের পুরনো ছকের কায়দাকানুনগুলোর ওপরও আস্থা

হারাল। এরা কেমন যেন একটা গোলমালের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হ'য়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের একক অভিনয় রিহার্সালের পদ্ধতির গুণেই অনেক সময় বেশ ভালোই উৎরে যেত। মহলার সময় প্রত্যেকটি দৃশ্যকে একটি দৃঢ় স্থাপত্য-রীতির ওপর দাঁড় করান হ'ত, যেটা কারো পক্ষে সহজে ভাঙা সম্ভব ছিল না, এবং অভিনয় সম্পর্কে শিল্পীর ব্যক্তিগত সমস্যা যাই হোক না কেন, দক্ষগত অভিনয়-সৌকর্যে অভিনেতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশেষ ভাবে সাহায্যই করত। ১৯৩৪ সালের অভিনয়কাল থেকে এই জীবনধর্মী শিল্প প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রুপের তরুণ অভিনয়শিল্পীরা, শিক্ষার্থীরা এমন কি ববাহুত উমেদার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত শিল্পী হিসেবে উন্নতি করতে লাগল। কোনো গুরুত্বপুর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেবার আগে এদের কাজের সুযোগ দেওয়া হ'ত একটু একটু ক'রে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। নিজের নিজের শিল্প মাধ্যমে এরা ক্রমশঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অবচেতনের স্ফুরণের উদ্দেশ্যে একটা সচেতন মানসিক কাঠামো তৈরী করতে সক্ষম হ'ত। আর ঠিক তখনই অভিনয়শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে একজন স্বাধীন স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নীত হ'ত। আমাদের যৌথ-জীবনের এই ক'টি বছর গ্রুপ থিয়েটার চিহ্নিত শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর শিল্পীর জন্ম দিয়েছে, আর এরা প্রবীণদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ ক'রে অভিনয়ে নির্দেশনায় ও শিক্ষার ব্যাপারে সারা মাকিন দুনিয়ার থিয়েটারের এক সুবৃহৎ অংশের ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শেক্‌স্‌পিরীয় প্রযোজনা

মূল রচনা : মার্গারেট ওয়েবষ্টার

অনুসরণে : শোভা সেন

শেক্‌সপীয়রের সমকালীন কোনো নাট্যকার বলে গেছেন—"বিয়োগান্ত নাটকের জন্য সবাগ্রে প্রয়োজন সমঝদার দর্শক।" কিন্তু তিনশ' বছর আগের সে-কথা আজও সমভাবেই প্রযোজ্য। ইংরাজী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান শেক্‌সপীয়রের নাটককে শুধুমাত্র জীবন্ত থিয়েটারের মাধ্যমেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, যে থিয়েটারের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে দর্শক।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কে মরিস ইভান্স 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকটি প্রযোজনা করে শেক্‌সপীয়রের নাটকের অচিন্তনীয় সম্ভাবনার পরিচয় দিলেন প্রযোজক ও দর্শকের কাছে। এই নাট্য প্রযোজনা শুধু যে রসোত্তীর্ণ ই হয়েছিল তা নয়, অভাবনীয় ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছিল থিয়েটারের জীবনে। কারণ নিউইয়র্ক ও বিভিন্ন শহরে দর্শকবৃন্দ সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল সেই নাট্য প্রযোজনাকে। এরপর "হ্যামলেট" প্রযোজিত হয়েছিল এই প্রথম। এবং মার্কিন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এরপর ক্রমান্বয়ে শুরু হ'ল 'হেনরী' (প্রথম খণ্ড) প্রযোজনা : প্লেয়ার্স ক্লাব, ১৯২৬ সাল।—'দ্বাদশ রজনী' প্রযোজনা : থিয়েটার গিল্ড। যদিও এই নাটকে মিঃ ইভানস ও মিস হেলেন থেইস দেশজোড়া

সুনাম অর্জন করলেন এবং এই সাফল্যের ফলে মার্কিন রাজ্যে শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে শেক্‌স্‌পীয়র স্বীকৃত হ'লেন।

পরবর্তীকালে সব সমালোচকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন ইভান্স প্রযোজিত 'তৃতীয় রিচার্ড'-এর সাফল্যের মূলে ছিল নাট্যকার ও রসিক দর্শক। যেহেতু দর্শকই থিয়েটারের প্রধান উপজীব্য সুতরাং প্রযোজক নাট্যকারের বক্তব্যকে সততার সঙ্গে তাঁদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রযোজকের কাছে হ্যামলেটের মত দুরূহ চরিত্র বিশ্লেষণ এক জটিল সমস্যা। সে-ক্ষেত্রে কোনো প্রযোজকই নাটকের পুরো সমস্যাগুলিকে সমাধান করে দেবার দুঃসাহস আছে বলে স্পর্ধা প্রকাশ করেন নি। বিভিন্ন প্রযোজক বিভিন্ন সমস্যাব সম্মুখীন হয়েছেন, উদাহরণতঃ উচ্চারণ সমস্যা। অনেক মার্কিন শিল্পী শেক্‌স্‌পীয়র-এর নাটকে অভিনয় করতে রাজি হয় নি তখন। কারণ তাঁদের এমন ভয় ও দুর্বলতা ছিল যে, পরিষ্কার ইংরাজী উচ্চারণ করলে ভবিষ্যতে তাঁরা হলিউডে দস্যু ও গুণ্ডার ভূমিকায় পুনরায় অভিনয় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

এ ক্ষেত্রে প্রযোজকেরা একটা সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করলেন। সে রাস্তাটিকে বলা যায় মাঝামাঝি পথ। যাটি ইংরাজী ও স্থানীয় মার্কিনী ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্ট হ'য়েছিল অদ্ভুত এক নতুন ভাষা, যে ভাষা অক্সফোর্ড বা ওহিওর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুরই নিজস্ব ভাষা নয়। তারপর শেক্‌স্‌পীয়র-এর কাব্য তাঁদের কাছে হ'য়ে উঠল আর এক ভয়ানক ভীতির বস্তু। অর্থাৎ ছন্দে যে চরিত্র কথা বলে, সে-চরিত্র কখনই আমাদের আশেপাশে যে মানুষ ঘোরাফেরা করে তার সঙ্গে এক হ'তে পারে না। দর্শকও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই পরীক্ষাকে সমর্থন জানালেন। এবং প্রমাণ করলেন শেক্‌স্‌পীয়র সর্বকালের—সর্বমানুষের। তাই তিনি অমর, তিনি সার্থক। শেক্‌স্‌পীয়র-এর স্বপ্ন সার্থক প্রমাণিত হ'ল তখন কারণ এই দর্শকদের জন্যেই তো তিনি লিখে গিয়েছিলেন তাঁর অমর কাব্য-নাটকগুলি।

অনেকের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, শেক্‌স্‌পীয়র কেবলমাত্র বোদ্ধা এবং গুণীসমাজের কাছেই আদৃত। এক্ষেত্রে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। 'হ্যামলেট' নাটকের কোনো এক অভিনয়ে

প্রচুর ছাত্রছাত্রীর সমাগম হয়েছিল। তারা স্বভাবতই কথা বলে, চেঁচায়, জোরে হাসে ও গণ্ডগোল করে। কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে কিছু পুলিশ মোতায়েন করলেন তাদের আয়ত্তে রাখবার জন্ম। শেষ পর্যন্ত অবস্থা হ'ল এই যে পলোনিয়াসের কথায় যখনই ছেলেমেয়েরা হেসে উঠছিল তখনই পুলিশ তাদের থামাতে ব্যাপৃত হয়ে গেল। ফলে বেচারী পলোনিয়াসকে আগাগোড়া এক গম্ভীর পরিবেশে গোমড়ামুখো দর্শকদের সামনে অভিনয় করে যেতে হয়েছিল।

আমেরিকায় শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক প্রযোজনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল কবির প্রতি এই অতিভক্তির বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা। যেহেতু সেখানে শেক্‌স্‌পীয়র প্রযোজনার বা অভিনয়ের বিশেষ কোনো ঐতিহ্য নেই, সেহেতু প্রযোজনার ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সুযোগ আছে। যে-সব নাট্যসংস্থা সারা দেশ সফর করে বেড়াত তারা অর্থনৈতিক চাপে ও আমোদ-প্রমোদের অন্যান্য মাধ্যমের প্রতিযোগিতায় ভেঙ্গে গেছে। শেক্‌স্‌পীয়রকে যাঁরা আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের অনেকেই অপূর্ব অভিনয়-জ্যোতিতে দর্শককে মুগ্ধ করেছিলেন—যেমন জন ব্যারিমুর, জেইন কাউল, ক্যাথারিণ কর্ণেল ইত্যাদি। কিন্তু এমন কোনো একটি মাপকাঠি গড়ে ওঠে নি যার বিচারে পরবর্তী অভিনেতা ও পরিচালকেরা তাঁদের সজ্ঞাত বা অর্ধঅজ্ঞাত শেক্‌স্‌পীয়র নাট্যাভিনয়ের বিচার করতে পারেন।

ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। তাকে যে সব সময় পুরনো থিয়েটারের কীটদষ্ট জীর্ণ বস্ত্র আশ্রয় করে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আধুনিক নাট্যশালা প্রায় প্রতি বিষয়েই বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত, কারণ সর্বক্ষেত্রেই তা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা বা নতুনত্বের মোহে দোদুল্যমান। যেহেতু এই নাট্যশালার বংশপরিচয় খুব প্রাচীন নয়, সে হেতু এটা মোটেই আশ্চর্যের নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অগ্ন্যুৎপাতের মত যে সব বড় বড় অভিনেতাদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরা শেক্‌স্‌পীয়র-এর নাটককে নিজেদের নাম ও যশের সোপান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য ও বিশালত্ব যখন ধরা পড়ল তখনই অক্ষত অবস্থায় নাটকগুলির

অভিনয় শুরু হ'ল। এডউইন বুথ আমেরিকায় এই দিকপালদের শেষ প্রতিনিধি। সেখানে যেন প্রাধান্য ছিল অভিনেতাদের ; মূল নাটকটা ছিল গৌণ। ইংলণ্ডে হেনরী আর্ভিং-এর অসামান্য সাফল্য আরও বেশী সম্ভব হ'ল তাঁর সহ অভিনেত্রী এলেন টেরীর সহযোগিতায়। বুথের মতই তিনি ছিলেন থিয়েটারের একক আকর্ষণ। লিসিয়াম থিয়েটারে তাঁর নাট্য-প্রযোজনা এবং তাঁর আমেরিকা সফর এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

তথাপি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহের আওয়াজ ধ্বনিত হ'ল। "শিল্পের প্রকৃত সাধারণ তত্ত্বে" স্যাটারডে রিভিউ-এর সমালোচক বলেছেন "স্যার হেনরী আরভিংকে অনেকদিন পূর্বেই তাঁর শেক্স্‌পীয়র অভিনয় লিপির অপরাধে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হ'ত। উনি তো শুধু নাটকগুলোকে কাটেন না, তাঁদের নাড়িভুঁড়ি শুদ্ধ টেনে বার করেছেন।"

নতুন ঋত্বিক ও সমালোচকদের অগ্রদূত ছিলেন জর্জ বার্ণাড শ। "শেক্স্‌পীয়র কি মূর্খই না ছিলেন—" তিনি কোনো এক অতিশয়োক্তির মুহূর্তে ঠিক এই কথাটিই লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, বহুবার এবং বারবার বিদ্রূপ করেছিলেন শেক্স্‌পীয়রকে তাঁর বস্তাপচা কাব্যের দৈন্য, অসহ্য ন্যাকামি, বাগাড়ম্বর এবং ভুয়ো আলঙ্কারিক শব্দের দৌরাত্ম এবং চিন্তার নৈরাজ্যের জন্য। কিন্তু প্রযোজকদের—যেমন আরভিং, অগাষ্টিন ডেলি ইত্যাদিকে শেক্স্‌পীয়রের মতানুযায়ী নাটকের উপস্থাপনা করতে বার বার সচেতন করতেও দ্বিধা করেন নি।

১৮৯৬ সালে এলেন টেরী প্রথম 'ইমোজেনের' চরিত্রে আরভিং-এর সঙ্গে অভিনয়ের আগে শ'এর সঙ্গে যে চিঠির আদান প্রদান করেন, তাতে আছে এক অভিনেত্রীর অমূল্য সুচিন্তিত ও সরলতার সুন্দর প্রকাশ। নব্য শেক্স্‌পীয়র প্রবর্তককে অবশ্য তাঁর মতবাদ প্রকাশের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। ১৮৯৭-এর অক্টোবর-এ ফোর্বস রবার্টসন 'হ্যামলেট' প্রযোজনা করেন লিসিয়াম থিয়েটারে। স্যাটারডে রিভিউ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এরূপ সুন্দর ভাষায়: লিসিয়াম থিয়েটারে ফোর্বস রবার্টসনের হ্যামলেট-এর অভিনয় অভাবনীয় সাফল্যযুক্ত হয়েছে। এখানে রেনাল্ডো, ভল্টিমাণ্ড ও

করনেলিয়াসকে দেখলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁদের দৃশ্যটি এল, স্মরণিকার "ফর্টিনব্রাস" শব্দটির ওপর চোখ পড়তেই কয়েক মিনিটের জন্য কী যে দেখলাম আমি, মনে নেই।

তখন থেকেই থিয়েটারে শেক্‌স্‌পীয়র নিয়ে বেশ কয়েক বছরে রীতিমত মাজা-ঘষা এবং বাস্তববাদী মতবাদের অনুপ্রবেশ লক্ষিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে "একসপ্রেশনিস্ট" মতবাদের প্রভাব এবং প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তির অনুসরণ শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে গতিশীলতার উন্মেষে সাহায্য করে। দৃশ্যসজ্জার ক্রমবর্ধমান অন্তর্ভুক্তি এবং অবাধ স্বাধীনতার প্রভাবে এলিজাবেথীয় জীবনদর্শন ততই অধিকতরভাবে প্রকাশিত হ'ল, যতই নাটকের উপস্থাপনা বিশেষধর্মীতা বর্জন করে এগিয়ে চলল সামগ্রিক সাফল্য প্রয়াসের পথে। এক বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে জাল ফেলা হয়েছিল—যেখানে রূপক ছেড়ে আধুনিক পোষাকে সজ্জিত শেক্‌স্‌পীয়র-এর চরিত্র মঞ্চে উঠল নাটকগুলিকে নবোদ্দীপ্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে।

শেক্‌স্‌পীয়রের কাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সময়ে থিয়েটারের সংজ্ঞা সম্বন্ধে নানারকম কথা বলা হচ্ছে। এবং পুরনো ধারণা পালটেছে। অভিনেতা, নাট্যকার ও দর্শকের অলিখিত চুক্তি এখন ভিন্ন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা'হলে শেক্‌সপীয়রের উদ্দেশ্য আধুনিক বক্তব্যে কী করে প্রকাশিত হবে? এ-ক্ষেত্রে সর্বদা আমাদের চেষ্টা করতে হবে, তাঁর যথার্থ বক্তব্যকে সততার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য, তিনি কি ধরনের মঞ্চ-প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছিলেন, তা আমাদের মানতে হবেই—কারণ সেইভাবে তাঁর নাটকের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল এবং এ বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকলে তাঁর উদ্দেশ্যের বিপরীত সংজ্ঞা নিরূপণের সম্ভাবনা থেকে যাবে। এ-ক্ষেত্রে তিনি কী-ভাবে মঞ্চের সামনে থেকে ভিতর দিকের ক্ষুদ্র মঞ্চাংশে বা দ্বিতলে, বারান্দায় এবং সেখান থেকে আবার ভিতরে নিয়ে গিয়ে নাটককে কী ভাবে গতিসঞ্চার করতেন এটা অনুধাবন করাই যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে তৎকালীন যুগে তাঁর নারী চরিত্রগুলিতে পুরুষ অভিনেতার অভিনয় এবং "কোয়ার্টো" সংস্করণে ছাঁটকাট অন্তর্ভুক্তি এবং মূল কপির পুনর্বিবেচনা থেকে

তার থিয়েটার মননের পরিচয় এবং সর্বশেষে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের তাঁর নাটকের মুল আখ্যানভাগকে 'Early Shakespeare ''another hand' 'a late addition', 'a playhouse omission' ইত্যাদি সনাক্তকরণের মধ্যেও খুঁজতে হবে। আমাদের কাজ অবশ্য চুলচেরা বিশ্লেষণ নয়—সাবিক সমন্বয়। পণ্ডিতমন্যদের কাছে আমরা প্রকৃত আখ্যান-এর জন্য নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ কিন্তু আধুনিক থিয়েটারের পাদপ্রদীপে তাকে বিচার করতেই হবে।

নিছক দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি অবশ্য আমরা সব কিছু বিচার করি, তাহ'লে সেই উনবিংশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিনেতাদের মত শেক্‌স্‌পীয়র-এর অনেক বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলব। শেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে দর্শককে বেশী বুঝতেন এমন নাট্যকার বোধ হয় নেই বললেই চলে। তাই তাঁর পথকে উপেক্ষা বা সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করার মতন নির্বুদ্ধিতা আমরা করব না।

আধুনিক প্রযোজকের হাতে যদি এমন এক নাট্যকার থাকেন যাঁর ৩৭টি নাটক আছে এবং তার বেশীর বেশীর ভাগই মঞ্চসফল। পরন্তু প্রায় ডজন খানেক 'হিট', তাহ'লে নাট্যকারের বক্তব্য একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে শোনার ধৈর্য রাখতে হবে। শেক্‌স্‌পীয়র এখনও ব্রডওয়ের সর্বাধিক সফল নাট্যকার। তাঁকে বুঝতে গেলে, তাঁকে উপলব্ধি ও অনুধাবণ করতে গেলে শুধুমাত্র তাঁর নাটকগুলি পড়লেই তাঁকে বোঝা অসম্ভব।

একটি জার্মান নাটক আছে, যেখানে গ্যয়টে এক কলেজের ছাত্র হিসেবে পরীক্ষকের সামনে গ্যয়টে সম্বন্ধে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চরমভাবে অসাফল্যের পরিচয় দিচ্ছেন। পরীক্ষকের মতানুযায়ী তিনি বহু প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম কিংবা তাঁর উত্তরগুলি বিধিবদ্ধ ধ্যান ধারণার পরিপন্থী। শেক্‌স্‌পীয়রও হয়তো আমাদের বহু জরুরী প্রশ্নের সমাধানে সম্যক সফল হবেন না কিংবা আমাদের সব তুচ্ছ বোঝাপড়া দেখে হেসে কুটোপাটি হবেন। কিন্তু থিয়েটারের ব্যাপারে মঞ্চ-পরিকল্পনা বা দৃশ্যসজ্জার অবতারণায় তাঁর যুক্তিতর্ক অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। হয়ত মনে হয় দর্শককে আমাদের চেয়ে তিনি ভাল বুঝতেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাঁর নাটককে যুগোপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতে পারবেন।

অনেক সময়ই আমরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা নিয়ে আলোচনা করতে বসি: দর্শক কী চায়, কী চায় না—কী দেখে তাঁরা পয়সা খরচ করতে রাজি হবেন; কী না পেলে নয়। কিন্তু তিনি থাকলে হয়ত তাঁর থিয়েটারকে আজকের যুগোপযোগী করে তোলার এক পন্থা বাতলাতে পারতেন। যেহেতু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁর সাহায্য প্রার্থনার কোনো অবকাশ আজ আর নেই, তাই তাঁর মন নিয়ে আজকের অবস্থাকে বিচার করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। এবং তাঁর ও আমাদের চিন্তায় এক সামঞ্জস্য ঘটাবার প্রয়াস পেতে হবে।

যে বিশেষ নীতি নিয়ে কোনো পরিচালক একটি নাটককে দেখবার বা বোঝবার চেষ্টা করেন, শেকস্‌পীয়র-এর নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রমের কোনো কারণ নেই। তাঁর ভঙ্গি ভিন্ন হ'তে পারে—কারণ নাট্য-পরিচালনার ক্ষেত্রটাই বিশেষ ব্যক্তি-চিন্তার ওপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, তাকে নাটকের 'মুড' বুঝতে হবে। তারপর পারিপার্শ্বিক কাঠামো এবং সর্বোপরি এ-সবের সামগ্রিক প্রভাব। আর্ডেন বা এলসিনোর, ইলিরিয়া বা ভেরোনার জগতটা কি? কি কি বিশেষ শক্তি এখানে কার্যকরী? কোন বিশেষ মুল্যবোধ এখানে বলবৎ? শেকস্‌পীয়র তাঁর নাটকে অনেক কলাকৌশল নিয়োগ করেছিলেন যার উৎস বা উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে তিনি যে-সব উপাদান নিয়োগ করেছিলেন সেগুলি আগে উত্তমরূপে আমাদের জানা দরকার।

যে সেতুতে ভর করে আমরা শেকস্‌পীয়র-এর দেশে পৌছব, সেই সেতু আমাদেরই তৈরী করতে হবে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মাঝে—সেখানে মানুষ ছাড়া কেউ নেই! কিন্তু এরা কারা? রাজা লিয়র থেকে শুরু করে তৃতীয় নাগরিক—এদের সবাইকে আমাদের জানতে হবে। ঘনিষ্ঠতার নিবিড় আবেষ্টনীর মধ্যে এদের জানতে হবে—দূরে ঠেলে দিয়ে নয়।

'হটস্পার'কে মূর্ত করে তুলতে গেলে তাকে রয়াল এয়ার ফোর্সের পোশাক পরাবার দরকার নেই। সেইরূপ ভাবে কবি ওলেনাসকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রতীক ভাবলে আমরা দর্শক ও নাট্যকার উভয়কেই হেয় প্রতিপন্ন করব।

নাটকের সভ্যতা কালজয়ী এবং বহিরঙ্গের সাদৃশ্য এক আকস্মিক ঘটনা—যদিও অনেক সময় তা মর্মস্পর্শী এবং পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় বহু পদচিহ্ন অংকিত হয়ে আছে। আজকের দিনে যাঁরা থিয়েটারকে ভালোবাসেন এবং থিয়েটারের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত, তাঁরা থিয়েটারকে সর্বদাই তার বিশেষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে অগ্রণী শেক্‌স্‌পীয়রের লক্ষ্য সোজাসুজি মানুষের মর্মস্থল। সেখানে তাঁর নাটকাবলীর মধ্যে ঘৃণা বা অবজ্ঞার অবকাশ নেই ; আছে অসীম উপলব্ধি।

'প্রডিউসিং মিস্টার শেক্‌স্‌পীয়র'
অনুসরণে

মহলার ঘর: অনুশীলন প্রসঙ্গে

মূল রচনা: রবার্ট লুইস

অনুসরণে: সমরেশ মজুমদার

যেন এ প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর গল্প নয়, তার চেয়ে বেশী কিছু। মেঠো ফসল ঘরে তোলার আনন্দের পেছনে যেমন পরিশ্রম এবং বুদ্ধির বহুতর সহযোগিতা রয়েছে, তেমনি একটি নাটকের প্রদর্শনের সম্পূর্ণতার পেছনে সুনিয়ন্ত্রিত অনুশীলনরীতির ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার্য। অনুষ্ঠানের আগে বেশ কিছুটা দিন আমাদের অনুশীলন-কক্ষে কাটাতে হয়। সুতরাং একটি নাটক মঞ্চস্থ করার আগে অনুশীলনের একটি বিশিষ্ট ছক থাকা দরকার। প্রখ্যাত সমালোচক এবং নাট্যবিশেষজ্ঞ রবার্ট লুইস এই অনুশীলনরীতির একটি সুন্দর ছবি আমাদের সামনে রেখেছেন। যে কোনো অভিনেতা যদি তাঁর অভিনেয় চরিত্রটিকে জীবন্ত করতে চান তা'হলে অবশ্যই এই রীতির অনুসরণ তাঁর কর্তব্য। কারণ কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে এ-বিষয়ে অভিনেতা যদি স্পষ্ট একটা ছবি পান তা'হলে তাঁর কাছে চরিত্রটি ক্রমশ সহজ হয়ে আসবে। তাই শ্রম এবং বুদ্ধির সঙ্গে আর একটি শব্দ ঘনিষ্ঠ হ'ল—প্রকরণ।

শ্রীলুইস বলেন, কোনো চরিত্রে অভিনয় করার সময়ে সেই চরিত্রটি সম্পর্কে

অভিনেতার মনের প্রাথমিক ধারণার বিশেষ মূল্য আছে। আমি কত সময় নিয়ে চরিত্রটি তৈরী করছি সেটা ততটা বড় কথা নয় যতটা আমি কিভাবে তৈরী করছি! কোনো অভিনেতার এমন কিছু করা উচিত নয় যার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত নন; যেমন, খুব প্রাথমিক পর্যায়ে জোরালো আবেগে সংলাপ বললে তাঁর শারীরিক ক্ষতি হতে পারে অথবা শুরুতেই চরিত্রায়ণের উপাদান-গুলোকে দ্রুত রপ্ত করার চেষ্টা তাঁকে চরিত্রটি থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে পারে। রবার্ট লুইস এ-ব্যাপারে একটি মজার গল্প বলেছেন। "জনৈকা তরুণী পিয়ানোবাদিকা একজন বিখ্যাত পিয়ানোশিল্পীকে তার বাজনা শোনাবে বলে বেশ কিছুদিন ধরে পীড়াপীড়ি করছিল। এই শিক্ষানবীশ তরুণীটিকে ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন অজুহাতে। কিন্তু এইবার তিনি তাকে ফেরাতে পারলেন না। মেয়েটি একটা সুর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজালো। বাজনা শেষ হ'লে ভদ্রলোক ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা অদ্ভুত সুর বাজালে তো! কি সুর এটা?' ছাত্রীটি একটি বিশেষ সুরের নাম বলল। ভদ্রলোক আরো অবাক হলেন, 'সে কি? আমি ভেবেছিলাম পিয়ানোতে এই সুরের সব কটা গৎ আমার জানা আছে, কিন্তু আমি এটা ধরতেই পারলাম না!'

মেয়েটি বিনীতভাবে বলল, 'হয়তো আমি যেভাবে অনুশীলন করেছি সেটাই এর কারণ। আমার অবশ্য শেখা শেষ হয় নি।'

'কি বলছো তুমি! তুমি কিভাবে অনুশীলন করো?' ভদ্রলোক প্রায় উত্তেজিত।

'প্রথমে, আমি যখন কোনো সুর তুলি, তখন প্রথমে আমি স্বরলিপিটা ভাল করে শিখে নিই আর সঠিকভাবে যদ্দিন না বাজাতে পারছি তদ্দিন আমি সে'টা অনুশীলন করি। তারপর আমি সুরটার ব্যাখ্যা ভাল করে বুঝে নিয়ে তা স্বরলিপির সঙ্গে যোগ করি এবং সবশেষে, যা আমি এই সুরটায় এখনও শিখতে পারি নি, চড়ায় ও খাদে সুরটাকে রপ্ত করি।'

অভিনেতারা প্রায়ই এই ধরনের ভুল করে থাকেন। তাঁরা অনুশীলনের প্রথম দিনেই ওভারকোটটা পরে ফেলেন। বাকী কয়দিনের অনুশীলনে শরীরে

নিম্নাঙ্গের পোষাক পরতে চেষ্টা করেন এবং শেষ সময়ে দেখা যায় তারা ভেতরের সার্ট অথবা গেঞ্জি পরেন নি। অবশ্য এই রকম ভ্রান্তির পেছনে কারণ থাকে। প্রথম দিনেই তিনি দেখাতে চান যে চরিত্রটি তিনি বুঝে ফেলেছেন এবং ভাল অভিনয় করছেন। ফলে তাঁকে বাদ দেবার যুক্তি অযৌক্তিক। তাই, পরিচালক যখন শিল্পী নির্বাচন করবেন তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত এবং অভিনেতাদের মনে এই ভয় কখনোই রাখা উচিত নয় যে প্রথম অনুশীলন তাঁরা খারাপ করলে বাদ পড়তে পারেন। শ্রীলুইসের মতে, অনুশীলনের সর্বপ্রথম দিনে সম্পূর্ণ নাটকটি কেউ একজন পড়বেন। অবশ্য এর ফলে কিছুটা অসুবিধে হ'তে পারে যদি যিনি পড়ছেন তিনি ভাল অভিনেতা হন। সাধারণতঃ পড়ার সময় এঁরা ভুলে যান যে তাঁর পঠনের উদ্দেশ্য নাটকটিকে সহজ এবং সরল উপায়ে বুঝিয়ে দেওয়া। কিভাবে অভিনয় করতে হবে তা নয়। কারণ এর ফলে অভিনেতারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। ফলত তাঁদের মধ্যে অনুকরণের একটা ইচ্ছা দেখা যেতে পারে। অবশ্য প্রত্যেক অভিনেতার, বিশেষ করে ভালো অভিনেতার অবচেতন মনে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। ফলে অন্যলোকে যেভাবে একটা চরিত্রকে চিত্রিত করার চেষ্টা করবে এঁরা তার সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী চিন্তা করবেন। তাই অনুকরণজনিত বিপদ সব সময় নাও ঘটতে পারে! কিন্তু আমার মতে অনুশীলনের সময় পরিচালকের নাটক পড়া উচিত নয়। অন্য একজন নাটক পড়বেন এবং অভিনেতা যদি কোনো সংলাপ ভুল বলেন তা হ'লে তা কিভাবে বলতে হবে তা পরিচালক দেখিয়ে দেবেন। পরিচালকের কর্তব্য সাহায্য করা, শিল্পিসৃষ্টি নয়।

একটি কম্পোজিশন

অনুশীলনের এই ধরনের নান্দীমুখে বেশ কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, নাটকের সমস্ত শিল্পী যদি একজনের মুখ থেকে পুরো নাটকটি শোনেন তাহ'লে প্রত্যেকের মনে নাটকটি সম্পর্কে একটি ধারণাই প্রতিফলিত হবে।

বিপরীতভাবে, প্রত্যেকে যদি প্রথম অনুশীলনেই নিজের নিজের অংশগুলো পড়েন তাহ'লে নাটকটি সম্পর্কে পরস্পরের ভাবনা বিক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এই শুরুটাই নাটকের পক্ষে বিশেষ জরুরী। প্রত্যেক শিল্পীর পৃথক মত থাকার চাইতে সবাই একটি মতের ছায়ায় থাকলে তা নাটকের পক্ষে শুভ হবে। প্রত্যেক অভিনেতাই চান প্রথম অনুশীলন দিনে একটু ঢিলেঢালাভাবে নাটকটা শুনতে। এবং প্রথম দিনের নাটক শোনার উত্তেজনা নিশ্চয়ই পরে থাকে না। প্রথম অনুশীলনের পরে প্রত্যেক অভিনেতাই অপেক্ষা করেন কখন তাঁদের সংলাপ আসবে এবং ভালভাবে নাটকের অন্যাংশ সম্পর্কে মনযোগ দেন না। এবং কিছুদিন পরে আবিষ্কৃত হয় যে কোনো অভিনেতা হয়তো পুরো নাটকটাই শোনেন নি।

প্রথম অনুশীলনের দিনে বেশ পরিশ্রম হ'লেও অভিনেতারা যেহেতু কোনো কাজ করেন না সেই হেতু এর পরের অনুশীলন বেশ সুন্দর মেজাজে শুরু করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অনুশীলনে, স্বভাবতই অভিনেতারা তাঁদের সংলাপ প্রথম পড়েন। এই সময়টি অত্যন্ত জরুরী। শ্রীলুইসের মতে, এই সময় প্রত্যেক অভিনেতার 'চরিত্রটি বুঝতে পারছি'—এই বোধটাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এমন কোনো দৃশ্য যদি থাকে যেখানে গভীর ভাবাবেগের প্রয়োজন, এইদিন তা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কোনো রকম প্রস্তুত না হয়েই হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অপাতদৃষ্টিতে চরিত্রটিকে যা মনে হয় তাই চিত্রিত করার প্রবণতা দূর করা উচিত। একটি চরিত্র পড়ে মনে হ'তে পারে মেয়েটি খুব চঞ্চল। কিন্তু পরে আবিষ্কৃত হ'তে পারে যে মেয়েটি আদৌ চঞ্চল নয়। ফলে প্রথম ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি অভিনয় করেন তাহ'লে তিনি ভুল করবেন। চরিত্রটিকে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না করে রূপ দেওয়া উচিত নয়। এই সব ব্যাপারের জন্য কোন অভিনেতার মনে অবশ্যই কোনো শঙ্কা থাকা উচিত নয়। প্রথমবারের চিন্তায় নিশ্চয়ই নাটকটি অথবা কোনো পারিপার্শ্বিক ঘটনায় প্রভাবিত হওয়া সম্ভব। এই যদি হয়ে থাকে তাহ'লে অভিনেতার উচিত অত্যন্ত নির্লিপ্ত হয়ে নাটকটির প্রাথমিক ধারণাগুলো গ্রহণ করা। কোনো

অভিনেতা খুব তাড়াতাড়ি চরিত্রটি বুঝে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অভিনয় করতে পারেন—আবার কেউ কেউ চরিত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা বুঝে তবে পা বাড়ান। মোদ্দা কথা, অভিনেতার উচিত তাই করা যা তিনি অত্যন্ত সহজভাবে পারবেন। প্রথম পাঠের সময়ই একটা বিপক্ষ ধারণা পোষণ করা অবশ্যই অসঙ্গত হবে। প্রথম অনুশীলনের দিনটি মোটামুটি পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাই ভাল। আলোচনা বলতে শুধু নাটকটি পড়াই নয়, নাটকটির মূল বক্তব্য নিয়ে অভিনেতাদের একটা মতামত বিনিময়ের আবশ্যকতা রয়েছে। দ্বিতীয় অনুশীলনেও নাটকটি সম্পর্কে সামগ্রিক একটা ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একটা এলোমেলো ধোঁয়াটে অবস্থায় থাকেন সবাই। কিন্তু একথা সত্যি, সংলাপ বলার সময়ে তার বিশিষ্ট অর্থ ইতিমধ্যে অভিনেতার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ধরা যাক একটি সংলাপ আছে, 'আপনার কাছে দেশলাই হবে?' প্রথমে হয়তো এর আক্ষরিক অর্থ-ই মনে আসতে পারে। কিন্তু পরবর্তী পঠনে বোঝা গেল ঐ কথা বলার সময়ে যার কাছে দেশলাই চাওয়া হচ্ছে তাকে হত্যা করার একটা পরিকল্পনা অভিনেতার মনে কাজ করবে। স্বভাবতই সংলাপটির গুরুত্ব বেড়ে গেল।

রবার্ট লুইসের মতে নাটকের তৃতীয় অনুশীলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দিন নাটকটি আগাগোড়া আর একবার পড়া উচিত। এবং পড়ায় সময়ে নাটকের বিশেষ বিশেষ ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে পরিচালকের উচিত অভিনেতাদের সচেতন করিয়ে দেওয়া। এবং সমস্ত অংশ সম্পর্কে পরিচালক কি চিন্তা করেছেন অর্থাৎ তিনি কিভাবে এটি মঞ্চস্থ করবেন তা পঠনের মাঝে মাঝে তিনি অভিনেতাদের বুঝিয়ে দেবেন। এবং এই সময়ে প্রত্যেক অভিনেতা তাঁর অভিনেয় চরিত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়ে থাকেন। সাধারণত এর পরেই পরিচালকের কর্তব্য হ'ল নাটকটি কিভাবে পরিবেশন করা হবে সে সম্পর্কে অভিনেতাদের অবহিত করা; এবং তিনি কিভাবে এগোতে চাইছেন, নাটকটি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা কি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম দিনেই এই সব বিষয়ে বেশী কিছু না বলাই ভাল। তাছাড়া তিনি

কিভাবে নাটকটি পরিবেশন করবেন সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা না নিয়ে বেশী কিছু বলা উচিত নয়। মোটামুটিভাবে সমগ্র নাটকের মৌল বক্তব্য কি এবং বিভিন্ন চরিত্রগুলো কিভাবে সেই বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করবে—এই বিষয়ে আলোচনা (production talk) সীমিত রাখাই সঙ্গত। মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে অভিনেতাদের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে পরিচালক সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেবেন। নাটকটির দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং আলোকসম্পাত নিয়ে আলোচনা এ-সময়ে অনুচিত হবে না। ফলে অভিনেতারা কি পরিবেশে অভিনয় করবেন সে বিষয়ে সচেতন হবেন। এরপর আবার সম্পূর্ণ নাটকটি পড়ে দেখা উচিত যে নাটকটির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রকাশ অভিনেতাদের চরিত্রটি উপলব্ধি করতে আরো বেশী সাহায্য করছে কি না।

অনুশীলনের এর পরের স্তরটি বিশেষ আকর্ষণীয়। অভিনেতাদের কর্তব্য তাঁদের সংলাপের পাশে সংক্ষেপে অর্থ লিখে রাখা। সংলাপটি বলার সময়ে বিশেষ যে চিন্তা বা ভাবনা মনে কাজ করবে তা লিখে রাখলে সংলাপ বলার সময় অত্যন্ত সুবিধে হয়। যেমন, একটি সংলাপে হয়তো মনে হবে মেয়েটি অভিনেতার পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু তার পরে সপ্তম সংলাপ শেষে জানা গেল তার মতন ভাল মেয়ে এভাবে কিছুতেই শুতে পারে না। তাই এই সময়ে মেয়েটি যা বলেছিল, তা, অভিনেতার কাছে ভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অভিনেতা যদি তাঁর সংলাপের পাশে আসল অর্থ সুচিহ্নিত করে রাখেন তাহ'লে ব্যাপারটা তাঁর কাছে সহজ হয়ে যায়। পরিচালকের উচিত বিশেষ বিশেষ অংশগুলোর একটা নামকরণ করে রাখা। ফলে ঐ নামের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতাদের স্মরণে ঘটনা বা সংলাপাংশ উজ্জ্বল হবে। ধরা যাক, সংলাপ ছাড়াই কোনো একটা পার্শ্বচরিত্রের কথার ইঙ্গিতে নায়িকা কেঁদে ফেলল। এই কান্নার প্রকাশ কি ধরনের হবে? পিতার শোক, স্বামীর শোক অথবা পুত্রের শোক নিশ্চয় এক ধরনের নয়। অতএব শোকের প্রকারভেদের সঙ্গে কান্নারও পার্থক্য ঘটবে। নায়কের যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান না থাকে তাহ'লে এখানে তিনি হাস্যাস্পদ হতে পারেন। এই ব্যাপারে তিনি পরিচালকের সাহায্য অবশ্যই পাবেন।

অনুশীলনের পরবর্তী স্তরে পরিচালকের কর্তব্য প্রত্যেক অভিনেতাকে নির্দেশ দেওয়া যে মঞ্চে উপস্থিতকালীন সময়ে যখন কোনো সংলাপ থাকবে না তখন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকতে। এই সময় খুব স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা উচিত। কোনো দৃশ্যে প্রবেশ করার আগে অভিনেতারা স্বভাবতই স্নায়বিক দৌর্বল্য বোধ করেন। পরিচালক এই সময় বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে [মাথায় হাত বুলিয়ে, টাই ঠিক করে দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে ইত্যাদি] অভিনেতাদের স্বাভাবিক করে রাখতে পারেন। এবং এই সব ব্যাপারগুলো অনুশীলনের সময়ে পরিচালক যদি নজর দেন তবে অভিনয়ের সময়ে অভিনেতাদের অসুবিধায় পড়তে হয় না। অভিনয়ের সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছক অনুশীলনের সময়েই অভিনেতাদের মনে আঁকা হয়ে যাবে। মঞ্চে কোথায় দাঁড়ালে সুন্দর হবে, কিভাবে চলাফেরা করতে হবে — এ সম্পর্কে পরিচালক একটা নির্দেশ দেবেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে অভিনয় স্বাভাবিক করবার জন্যে অভিনেতাদের অনুশীলনের সময় থেকেই কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অনুশীলনের সময়ে যদি শিল্পীদের অবস্থান নিয়ে গোলমাল হয় তাহ'লে পরিচালকের কর্তব্য তাঁদের চেয়ারে বসিয়ে অভিনয় করানো। মোটামুটিভাবে সেই সময়ে কোথায় কিভাবে দাঁড়ালে বক্তব্য ভাল বলা যায় এই বোধ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই দৃশ্যটি সেই বোধ অনুযায়ী অভিনয় করানো উচিত। অর্থাৎ Composition এবং Movement এই দু'টো সম্পর্কে পরিচালক এখনই চিন্তা করবেন। এর একটা সুন্দর স্পষ্ট ছবি তাঁর সামনে থাকবে এবং প্রতিদিনের অনুশীলনে তা সুন্দরতর হবে।

মঞ্চে যে আলো অথবা দৃশ্য থাকবে, যে বেশবাস পরতে হবে অর্থাৎ মঞ্চে যা কিছু অভিনয়ের সময়ে প্রয়োজন হবে তাদের সম্পর্কে অনুশীলনকালেই সজাগ থাকা দরকার। যে দৃশ্যে জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে হবে অনুশীলনের সময় কল্পনায় সামনে জানলা রেখে অভিনয় করতে হবে। যে পোষাকে যেভাবে বলা উচিত অনুশীলনের সময়ে সে পোষাক ব্যতিরেকেই সেই ভঙ্গী চলাফেরায় আনা দরকার। ফলে মঞ্চে অভিনয় করার সময় এ-ধরনের অসুবিধাগুলো

ভোগ করতে হয় না। একই কথা আলো অথবা উইংস্ সম্পর্কে বলা যায়। হঠাৎ মঞ্চে প্রবেশ করে অভিনেতারা আলোর আধিক্য অথবা নিষ্প্রভতায় দুর্বল বোধ করেন। কিন্তু সেই দৃশ্যটি সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন থাকলে এই ধরনের দুর্বলতার কোনো কারণ ঘটতে পারে না।

অনুশীলনের সময়ে দেখতে হবে যে কোনো অভিনেতা অন্য অভিনেতাকে অসুবিধেতে ফেলছেন কিনা। যেমন, একজন এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন যে অন্যজনের শরীর দেখা যাচ্ছেনা, অথবা একজনের গলার স্বর অন্যজনের তুলনায় কম বা বেশী শোনা যাচ্ছে অথবা একজন অন্যজনের সংলাপ শেষ না হতেই নিজের সংলাপ বলতে উদগ্রীব—পরিচালক, সে বিষয়ে এঁদের সচেতন করিয়ে দেবেন। অভিনেতারা দৃশ্যগুলো সম্পর্কে অবিহিত হ'লে পরিচালক শেষ সময়ে কোনো মত পরিবর্তন করলে তাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয় না। ধরা যাক, একটি দৃশ্যে প্রেমিক বুঝতে পারলো প্রেমিকা তাকে প্রতারণা করেছে। ধারালো সংলাপ অভিনেতাদের সাহায্য করছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝাতে; হঠাৎ পরিচালক নির্দেশ দিতে পারেন যে প্রতারণা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিক প্রেমিকার মুখের দিকে না তাকিয়ে মনের ভাব অভিব্যক্তি দিয়ে বোঝাবে এবং আলো ও দৃশ্যপট তাঁকে সাহায্য করবে। অভিনেতা যদি দৃশ্যটি সম্পর্কে সচেতন হন তাহ'লে এই পরিবর্তনেও কোনো সমস্যায় তাঁকে পড়তে হয় না। অনুশীলনের সময়েই অভিনয় করতে করতে চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

অনুশীলন শেষে পরিচালক প্রত্যেক অভিনেতার ত্রুটিগুলো তাঁদের জানিয়ে দিলে তাঁরা শুধরে নিতে পারবে। একবার ছেলেটি মেয়েটিকে অতিক্রম করে চলে গিয়েও আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, কেমন আছ?' এটি ত্রুটি নয়। কিন্তু তার পরেও যদি সে পুনরাবৃত্তি করে তাহ'লে তাকে শুধরে দেওয়া প্রয়োজন। নাটকের মূল বক্তব্য থেকে অভিনেতারা যাতে সরে না যান পরিচালকের সে বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। বার বার দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অভিনেতা যদি তা মানিয়ে নিতে না পারেন তাহ'লে পরিচালকের উচিত কিছু অদল বদল করে দেওয়া। সাজসজ্জা এবং দৃশ্যপট সমেত শেষ

অনুশীলনের দিনে প্রয়োজন হতে পারে কিছু পরিবর্তন করা। দর্শক বুঝতে পারছে না এমন কিছু ঐদিন ধরা পড়তে পারে।

অনুশীলনের এই সব স্তরগুলোতে কত সময় লাগবে তা নির্ভর করছে নাটকের প্রকৃতির ওপরে। মনস্তত্ত্বমূলক নাটকগুলো মনে হয় একটু বেশী শ্রমসাধ্য। সংলাপের মাধ্যমে দর্শকদের অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করা অথবা বিশেষ ভাবাবেগপূর্ণ দৃশ্যগুলো সুন্দরভাবে পরিবেশন করার পেছনে সময় নিশ্চয়ই বেশী প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে স্থুলরসের নাটকের [যেখানে দৈহিক-সঞ্চালন প্রয়োজন] পক্ষে অন্য ধরনের কিছু সুবিধে থাকলেও সূক্ষ্মরস পরিবেশনের পেছনে স্বভাবতই দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতি দরকার।

রবার্ট লুইস কোনো নাটক অভিনীত হবার আগে পরিচালকদের নাটকটির আঙ্গিক [Form] এবং বিষয়বস্তু [Content] সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে বলেছেন। স্বভাবতই সব পরিচালক অন্ততঃ এই দু'টি ব্যাপারে একমত হতে চান না। প্রসঙ্গত তিনি বিশ্ববিখ্যাত দু'জন শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন। মস্কোতে হ্যামলেট অভিনয়ের আগে হ্যামলেটের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য নিয়ে স্তানিস্লাভস্কি এবং গর্ডন ক্রেগ যে আলোচনা করেছেন তাতে ঐ 'Form ও Content'এর দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়েছে। নাটকের বিশেষ চরিত্র ওফেলিয়া সম্পর্কে ক্রেগের মত—'সে একাধারে অত্যন্ত মূর্খ এবং মনোরমা। অসুবিধে সেইখানেই।'

স্তানিস—'আপনি কি বলতে চাইছেন? চরিত্রটি কি সদর্থক না নঞর্থক?'

ক্রেগ—'বোধ হয় অস্পষ্টই বলা যেতে পারে।'

স্তানিস—'আপনি কি দর্শকদের কথা ভাবছেন না? ওঁরা ওফেলিয়াকে বেশ একটা আকর্ষণীয় চরিত্র হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, তাই ওঁরা যদি ওফেলিয়াকে অত্যন্ত মূর্খ ও অস্বস্তিকর চরিত্র হিসেবে দেখে তাহ'লে কি বলবে-না আমরা ওফেলিয়াকে নষ্ট করেছি?'

ক্রেগ—'হ্যাঁ, তা আমি জানি।'

স্তানিস—'আচ্ছা, আমরা যদি ওফেলিয়াকে আকর্ষণীয় ও মনোরমা হিসেবে

দেখিয়ে কয়েকটি জায়গায় ওকে মহামূর্খ হিসেবে পরিবেশন করি তাহ'লে বোধ-হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই করবো কি ?'

ক্রেগ—হ্যাঁ, কিন্তু আমি মনে করি সমস্ত পরিবারের মতন বিশেষ করে এই দৃশ্যে সে একটি সামান্যতম চরিত্র।

স্তানিস—কি ভাবে দর্শক এই সব চরিত্রকে দেখবে। হ্যামলেটের চোখে না নিজের চোখে ? যদিও হ্যামলেট এই দৃশ্যে নেই।'

ক্রেগ—এই দৃশ্যে এমন কিছু নেই যা ওদের দেখা দরকার।

স্তানিস—এর ফলে কি ওরা হতবুদ্ধি হবে না ?

ক্রেগ—আমি তা মনে করি না। তোমার মত কি ?

স্তানিস—'মস্কোর দর্শকরা সব সময় পরিচালকের ভ্রান্তি ধরতে চেষ্টা করে।'

ক্রেগ—'তাতে কি আর হবে !'

স্তানিস—'কিন্তু আমি আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে এরকম খুব সামান্য ভুল ওরা ধরতে পারলে নাটকের সব ভাল গুণগুলো ওরা ভুলে যায়। এই ব্যাপারে তাদের পাণ্ডিত্য দেখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

ক্রেগ—'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ওফেলিয়াকে সুন্দর, শুদ্ধ, সৎচরিত্র হিসেবে উপস্থিত করতে চাইবে না। তাহ'লে আমার মনে হয় বিয়োগান্তক ব্যাপারটি ভাবা যায় না।'

স্তানিস—আমি কিন্তু এটা মানতে পারছি না। যদি ওফেলিয়া অত্যন্তই মূর্খ হতো তাহ'লে তা হ্যামলেটের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানসূচক।

ক্রেগ—(আমার মতে সে নাটকের পক্ষে খুব অল্পই করুণরস সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। সাধারণত আমি শেক্সপীয়রের নাটকে কিছু সংযোজন অথবা পরিবর্তন পছন্দ করি না। কিন্তু এই দৃশ্যে কোনো বলিষ্ঠ বক্তব্য বা স্বতন্ত্র কিছু নেই। তাই এই দৃশ্যটিকে এমন সহজ ভঙ্গিমায় পরিবেশন করতে হবে যাতে দর্শকরা একঘেয়েমি বোধ না করেন।)

স্তানিস—'এটা আপনার নিজস্ব মত। কিন্তু আমি তা বলতে চাইছি না।

আমার মতে ঐ অভিনয়ের স্টাইল একটা স্টককোম্পানী' জাতীয় হওয়া উচিত।'

কিন্তু এ বিষয়েও ওঁরা একমত হতে পারেন নি।

নিজস্ব ধ্যানধারণায় ওঁরা নাটকটিকে রূপ দিতে চেয়েছেন। তবে দু'জনেই একমত হয়েছেন অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সংলাপ বলা অথবা চলাফেরা করার ব্যাপারে। এবং ওরা স্বীকার করেছেন যে, কোনো অভিনেতার পক্ষে মঞ্চের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে অভিব্যক্তির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ-ছাড়া দু'জন অভিনেতাকে কোনোরকম movement ছাড়াই সংলাপ বলানো বেশ কঠিন এবং দুষ্কর।

অভিনেতাদের উচিত দর্শকরা যাতে সংলাপের রস উপলব্ধি করতে পারেন সেইজন্য খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা। যখন মনে হবে কোনো সংলাপ দাঁড়িয়ে বলতে হ'লে অবস্থা অনুকূলে থাকে না তখন নির্দ্বিধায় আসনে বসা উচিত। স্বভাবতই দ্বিতীয়টি অনেক আরামদায়ক। ক্রেগের মতে সেক্সপীয়রের নাটক দর্শকদের বোঝাতে হ'লে বেশী Pose বা Movement-এর প্রয়োজন অনাবশ্যক। আবশ্যক যেটা সেটা হ'ল সহজভাবে বলা।

অনুশীলনের একমাত্র অর্থ হ'ল, যে-চরিত্রটিকে অভিনেতা রূপ দিতে চান সেটাকে ভাল করে বোঝা। চরিত্রটিকে নেড়েচেড়ে তাকে সব রকম কোণ থেকে দেখে তার সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনাই অনুশীলন। অবশ্য অভিনেতা যতই চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হোন না কেন, তাঁর তৃতীয় একটা সত্তা থাকবে যা তাঁকে তাঁর এবং চরিত্রটির মধ্যে পার্থক্যটি সম্পর্কে সচেতন করবে। অর্থাৎ যখন তিনি অভিনয় করবেন তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেলে চরিত্রটি অতি নাটকীয় হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অনুশীলনের মাধ্যমে এই অতিনাটকীয়তা দূর করতে হবে। এই সঙ্গে অভিনেতার অনুভূত-অভিজ্ঞতা চরিত্রটিকে রক্তমাংসের করে তোলার জন্যে অত্যন্ত আবশ্যক।

অনুশীলনের একটি সুনিয়ন্ত্রিত নীতির প্রয়োজনীয়তা সর্বকালের নাট্য-বিশেষজ্ঞেরা অনুমোদন করেছেন। একটির পর একটি স্তর পেরিয়ে ক্রমশ

নাটকটিকে পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই অসংবদ্ধ অনুশীলন ব্যবস্থার চাইতে শ্রেয়তর। এবং যা শ্রেয় তা আমাদের প্রিয় হ'তে বাধা নেই। আমরা ফসল চাই কিন্তু যে পদ্ধতিতে যত ভাল ফসল আসবে সেই পদ্ধতিটাই আমাদের কাম্য। শ্রম এবং বুদ্ধির সঙ্গে যদি সেই প্রকরণ বা পদ্ধতিতে বোধির সংযোজন ঘটে তাহ'লেই সম্পূর্ণতার আসরে ঘাটতি পড়ে না।

'রিহার্সাল প্রসিডিওর এ্যাণ্ড ওমেশ্যন'
অনুসরণে

নাট্যশিল্পে অভিনবত্ব

মূল রচনা : রবার্ট এডমণ্ড জোন্স

অনুসরণে : কিরণ মৈত্র

রঙ্গমঞ্চের কর্মিদের কাছে, বিশেষ করে পরিচালকের কাছে একটি সমস্যা চিরন্তন। প্রায় সকলেই কমবেশি পরিমাণে এই সমস্যায় চিন্তিত। সমস্যাটি হচ্ছে এই যে, অভিনীতব্য নাটকটি দর্শকদের মধ্যে কিভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে—কিভাবে নাটকটি দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হবে ?

কোনো নাটক অভিনয় করতে গেলে এই ভাবনাটিই মনকে প্রথমে আচ্ছন্ন করে। আর এই ভাবনার পথ ধরেই আসে নানা বিচিত্র উপায়। কারণ, মূল নাটকের ঘটনাকে দর্শকদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা এবং নাটকের অগ্রগমণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারাই সার্থক নাট্য প্রযোজনার দৃষ্টান্ত। অতএব নাটককে সার্থক করতে গিয়ে নাট্য পরিচালককে তাই ভাবতে হয়। সার্থক নাট্য প্রযোজনার জন্য যে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্যে নাট্য জগতে কয়েকটি মাত্র পদ্ধতিই চালু রয়েছে। পরিচালকরা এই এক একটি পদ্ধতির সাহায্যে নাটককে প্রাণবন্ত করে তোলেন। পদ্ধতি যতই থাকুক না কেন, এঁদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই—গণ্ডগোল হচ্ছে কোন পদ্ধতিকে

গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে। বস্তুনিষ্ঠ বাস্তববাদিতা, সরলীকরণ, ভঙ্গিমা প্রভৃতি বহু রীতিরই উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু পরিচালকরা এসব ক্ষেত্রে যে কোনো একটি পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেন এবং তারই সাহায্যে মঞ্চের উপর তিনি নাটককে সজীব করে তুলতে সচেষ্ট হন। এখানে আরো একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। নাটকটি সজীব হয়ে উঠবে কিসের সাহায্যে? এ কথার উত্তরে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, নাটকটি সজীব হয়ে উঠবে অভিনেতাদের অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁদের বাচনভঙ্গি, চলাফেরা, অভিব্যক্তি সব কিছু দিয়ে অভিনেতা চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন। নাটকের মূল বক্তব্য, সংঘাত সব কিছুই নাট্যকার কোনো গল্পকারের মতন সরাসরি নিজে বলতে পারেন না, নাটকের পাত্রপাত্রীদের মাধ্যমেই তাকে প্রকাশ করতে হয়। অতএব অভিনেতারা যদি সার্থকভাবে চরিত্রগুলিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে না পারেন তবে নাটকটি মাঠে মারা যাবে। তাই পরিচালক প্রচলিত পদ্ধতির মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করেন এবং অভিনেতাদেরও সেই ভাবে নির্দেশ দেন। মূল নাটকটি পরিচালক কর্তৃক পঠিত হবার পর পরিচালক চিন্তা করেন কিভাবে এবং কেমন করে এই নাটককে রসস্থ ও প্রাণবন্ত করে তোলা যাবে। তখন তিনি যে পদ্ধতিটিকে তার উদ্দেশ্য সাধনের সহজ সহায়ক বলে ভাবেন তাকেই গ্রহণ করেন।

আসলে প্রচলিত প্রত্যেকটি পদ্ধতিই অভিনেতাদের সহায়ক তথা প্রেরণার উৎস। এর যে কোন একটিকে গ্রহণ করেই সার্থক নাট্য প্রযোজনার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যায়। পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী অভিনেতারা মঞ্চের ওপর অভিনয় করেন। পরিচালকের নজর রাখা উচিত যে, অভিনেতাদের অভিব্যক্তি পরিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, যথেষ্ট ব্যাঞ্জনাময় হয়ে উঠছে কিনা। যে কোনো পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক, অভিনেতারা যে কোনো ফ্যাশানেই অভিনয় করুন না কেন মূলকথা তাঁদের অভিব্যক্তি যেন নাটকের মূল বক্তব্যকে তথা চরিত্রকে সজীব করে তুলতে সাহায্য করে। এমন দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর যে সমসাময়িক কালের হয়েও একই চরিত্র চারজন অভিনেতা চাররকম ভাবে অভিনয় করে প্রচুর যশ পেয়েছেন।

কিন্তু এখানেই নাট্যপ্রযোজক বা পরিচালকের কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি হতে পারে না। অভিনবত্ব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক শিল্পীর তথা পরিচালকের কাছে সহজাত। অতএব কোনো নাটক মঞ্চে উপস্থিত করতে গিয়ে তার প্রথম দৃষ্টি থাকে নাটকের সামগ্রিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কোনো নতুনতর ফ্যাশন চালু করা। নাট্যশিল্পে এই ফ্যাশন চালু করার পদ্ধতি আজকের নয়। রবার্ট এডমণ্ড জোন্সের ভাবনার শরিক হয়ে একথা অনায়াসেই বলা চলে যে নতুন পরিচালক যে কোনো ফ্যাশনই গ্রহণ করুন না কেন, সেটা সার্থক হয়ে উঠবে তার সার্থক প্রয়োগে এবং নাটকটির সামগ্রিক উৎকর্ষতায়। কেবল ফ্যাশন সর্বস্ব হ'লেই চলবে না। আজকের নাটকের জন্যে যে নতুন রীতিটি গৃহীত হ'ল, সেটা যদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তবে কালক্রমে সেটাই একটি বিশিষ্ট ফ্যাশন হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে এই বিশেষ ফ্যাশানের যিনি প্রবর্ত্তক তার নামও। কিন্তু কেন এই ফ্যাশনের প্রয়োজনীয়তা?

প্রশ্নটা সরাসরি করা হ'লেও জবাব কিন্তু সরাসরি দেওয়া যাবে না। কারণ, এই প্রশ্নের যে জবাব তার পথ ধরেই আসবে আজকের আলোচনার আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় বস্তু। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে আমরা এবার মূল প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে তৈরী হই। যেমন তেমন ভাবে একটি নাট্যপ্রযোজনা কোনো সৃষ্টিশীল পরিচালকের যেমন কাম্য নয়, তেমনি নয় অন্যান্য শিল্পী এবং দর্শকেরও। বিশেষ কোনো পদ্ধতি, বিশেষ কোনো রীতি নাটকের ক্ষেত্রে পরিচালক আমদানী করতে চান তার প্রধান কারণ অভিনবত্ব সৃষ্টির ব্যাকুল ইচ্ছা। এই প্রবল ইচ্ছাই যুগে যুগে রঙ্গমঞ্চে বহু নতুনতর ভাবনার আবির্ভাব ঘটিয়েছে।

নাটকের মাধ্যমে সাধারণতঃ আমাদের জীবনকে প্রতিফলিত করা হয়, দেখানো হয় যুগ চিন্তাকে, যুগ সমস্যাকে। মানুষের এই জীবনকে চলচ্চিত্র যতখানি সামগ্রিক ভাবে দেখাতে পারে, নাটক ঠিক ততখানি পারে না। কারণ চলচ্চিত্রের মতন সুযোগ বা বহুবিধ সুবিধা তার ভাগ্যে নেই। অতএব এই নাটককে আকর্ষণীয় করে তুলতে, (বিশেষ করে আজকের যুগে) নাটকের মাধ্যমে যুগ ও জীবন সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দিতে হ'লে নাট্য পরিচালক যে আঙ্গিকের সাহায্য নেন, যেভাবে দৃশ্যসজ্জার নির্দেশ দেন বা পাত্র পাত্রীদের

অভিনয় করতে বলেন সেটা যাতে অভিনব হয় এটাই পরিচালকের একমাত্র কাম্য হওয়া প্রয়োজন। রবার্ট এডমণ্ড জোন্সের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা চলে যে, এটি সবকালে এবং সকল যুগেই অভিনন্দন যোগ্য। নাট্যপ্রযোজক, পরিচালক, দৃশ্য রচয়িতা, আলোক সম্পাতকারী, সকলের সম্পর্কেই একথা বলা চলে যে, তাঁরা যে ভাবে খুশি নিজেদের দক্ষতাকে প্রকাশ করুন, নাটককে এগিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু যাই করুন না কেন সেটা যেন অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। কারণ, একই রীতি পদ্ধতির বারংবার ব্যবহার যেমন কোনো শিল্পীর পছন্দ নয় তেমনি নয় কোনো শিল্প রসিকেরও।

প্রযোজক এবং পরিচালক উভয়েরই লক্ষ্য রাখা উচিত দৃশ্য রচয়িতা মঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় কোন রঙয়ের ব্যবহার কতটা করলেন, কিংবা দৃশ্যপটটি কতটা বাস্তব সম্মত হ'ল, বা কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তিনি একটি বিশাল কারখানা বা বন্দরের সেট তৈরী করলেন সেটা বড় কথা নয়, বড কথা হচ্ছে উক্ত দৃশ্যপটটি দর্শকদের কাছে অভিনবত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছে কিনা। বিশাল একটি কর্মব্যস্ত বন্দরের দৃশ্য দেখে যদি দর্শকদের হঠাৎ মনে পড়ে যায় দুই কি তিন বছর আগে দেখা অমুক থিয়েটারের অনুরূপ কোনো দৃশ্যপটের কথা, কিংবা দৃশ্যপটটি যদি দর্শকদের কাছে অভিনব বলে মনে না হয় তবে ঐ দৃশ্যপটের আর.বিশেষ কি মূল্য আছে? একথা শুধু দৃশ্যপটের ব্যাপারেই নয়, সমগ্র নাটকের প্রযোজনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর কোনো একটি অংশ যদি বড় হয়ে ওঠে, যেমন আলোকসম্পাত বা দৃশ্যপট, যা নাকি মূল নাটকের সঙ্গে সমতা রক্ষা না করে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তার অতি স্পষ্টতার ফলে মূল নাটক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে তার প্রশংসা করা যাবে না। এ জাতীয় অভ্যাস পরিচালক বা প্রযোজকের থাকা ক্ষতিকর। অতএব দৃশ্যপট, আলোক, সঙ্গীতাংশ, অভিনয় সব কিছুই অভিনব হবে কিন্তু সবাই যেন একই মাত্রায় থাকে। কবিতায় ছন্দহীন পঙ্‌ক্তি যেমন বিসদৃশ্য এবং পরিত্যাজ্য অনুরূপভাবে নাটকেও মাত্রাতিরিক্ত কোনো অঙ্গের ব্যবহার বিসদৃশ্য। অভিনয় সম্পর্কেও সেই একই কথা বলতে পারি। পাত্রপাত্রীরা যেমন ভাবে অভিনয় করছেন সেটা যদি খুবই চিরাচরিত বলে

মেন হয়, তবে নাটকের আকর্ষণ অনেকখানিই কমে যায়। এসব ক্ষেত্রে পরিচালক যদি বিশেষ কিছু ফ্যাশনের প্রবর্ত্তন করতে পারেন যা অভিনব তবে নাটকের আকর্ষণই শুধু বাড়বে না, সেই সঙ্গে পরিচালকও বিশেষভাবে অভিনন্দিত হবেন। কিন্তু অভিনবত্বের আমদানী করতে গিয়ে যদি পরিচালক উৎকট অবাস্তব কিছু করে বসেন তবে কে আর তাঁকে বাহবা দিতে এগিয়ে আসবে? যে কোনো ফ্যাশনই গ্রহণ করা হোক না কেন তা যেন শিল্পের পথ ধরে আসে। কারণ শিল্পের ব্যাপারে অশৈল্পিক কোনো কিছু কারোই বাঞ্ছনীয় নয়।

অভিনয়ের সময় নাটকের পাত্রপাত্রীরা মঞ্চের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে মঞ্চে আসছেন আবার নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে চলে যাচ্ছেন এ দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু একদা দেখলাম নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্তে নায়ক দর্শকদের মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠল, তারপর ছুটতে ছুটতে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়াল। এই বিশেষ নির্দেশনাটি প্রথম রজনীতে আমাদের বিস্মিত করেছিল। পরে এটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই ফ্যাশানটি আজ আর আমাদের পুর্বের মত চমকিত করে না কিন্তু এর যে অভিনবত্ব তার মূল্য আজও রয়েছ। অবশ্য বুদ্ধিমান পরিচালক নিশ্চয়ই অভিনবত্ব সৃষ্টির জন্য এই ব্যবহৃত বিশেষ ফ্যাশনটির কাছে হাত পেতে দাঁড়াবেন না। কারণ, ওটির মধ্যে আজ আর কোনো নতুনত্ব নেই। ঠিক এমনই কথা বলা চলে আলোক, সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতি প্রসঙ্গে।

এতক্ষণ ধরে আমার এতকথা বলার একটিই উদ্দেশ্য যে, পরিচালক যেমন ভাবে খুশি নাটক করুন, যে ফ্যাশনে খুশি চালু করুন, কিন্তু যাই করুন না কেন তা যেন অভিনবত্বের দাবী রাখতে পারে। তা যদি পারে তবেই তিনি সার্থক নাট্য নির্দেশনার দৃষ্টান্ত যেমন উপস্থিত করতে পারবেন, তেমনি পারবেন সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে। আজকের দিনে এইরূপ বৈশিষ্ট্যময় নাট্য প্রযোজনাই আমাদের কাম্য।

'ফ্যাশন ইন দি থিয়েটার'

অনুসরণে:

ভবিষ্যতের প্রযোজনা নির্দেশনা

মূল রচনা : এ্যাডল্ফ আপিয়া

অনুসরণে : দুর্গা গোস্বামী

[১৯২১ সালের ডিসেম্বরে Appia'র একটি অপ্রকাশিত বক্তৃতার ফরাসী পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে]

নাটক যখন সম্পূর্ণ হ'ল এর পরিবেশের উপাদান কে বা কি ? নিশ্চয়ই অভিনেতৃবৃন্দ। অভিনেতা ছাড়া নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না, কেননা অভিনয় সমবায় বা যৌথ শিল্পসৃষ্টি, সঙ্গীতকার বা বাদ্যকার-এর মতন একক শিল্পসৃষ্টি নয়। তাই নাটক তার সম্পূর্ণতা গ্রহণে অনেকের প্রয়োজন স্বীকার করে। নতুবা বইএর আলমারীতে সাহিত্যাকারে শোভাবর্দ্ধন করা ছাড়া এর আর কোনো পথ নেই। নাটকের বহিঃপ্রকাশের প্রাথমিক বাহন হচ্ছে অভিনেতৃবৃন্দ। কারণ যে স্থানের কোনো আকার বা চরিত্রচিত্রণ নেই অভিনেতা সেখানে ত্রিমাত্রিক উপাদান নিয়ে হাজির হ'চ্ছে—কেননা সেই শূন্যে মাটির পুতুলের মত প্রয়োজনমত যে কোনো আকারে আকারিত হয়ে স্বস্ব চরিত্রের প্রকাশে কিছুটা স্থান অধিকার করছে।

কিন্তু অভিনেতা কোনো নিশ্চল মূর্তি নয়। সে জীবিত এবং চলাফেরার মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকাশ করে। শুধুমাত্র আকারেই নয়, চলাফেরার

জন্যও সে অনেকটা স্থান অধিকার করে। সীমাহীন স্থল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এক সীমায়িত স্থানকে নিজের চলাফেরা বা অঙ্গ পরিচালনার ক্ষেত্র হিসাবে সে গ্রহণ করে নিয়েছে। অর্থাৎ খানিকটা জায়গাকে সে সীমায়িত করে অবস্থা বা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সেই সামান্যতম জায়গাটুকু থেকেও যদি তাকে তুলে নেওয়া হয় তবে সেই স্থান মহাশূন্যে মিলিয়ে গিয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ এটাই প্রতিপাদ্য হয় যে শরীর বা কোনো বস্তুর অস্তিত্বই কেবলমাত্র এলাকার সৃষ্টি করে এবং তখনই সেটা স্থল হিসাবে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে ধরা দিতে পারে।

এইভাবেই কাল বা সময়ের ওপরও আমরা প্রভুত্ব করতে চাই। যেমন শরীরের চলাফেরা করার গতিরও রকমফের আছে—কেননা আমরা বলে থাকি অমুক জোরে বা আস্তে চলছে। অতএব স্থানকে সীমায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে সময়কেও সীমায়িত করা প্রয়োজন। কিন্তু এর সমস্তটাই প্রয়োজনও খেয়ালমাফিক। কারণ যেখানে চলাফেরাও কোনো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটছে না সময়টাও সেখানে কোনো সীমার মধ্যে ধরা পড়তে পারে না। অতএব নির্দেশক এই সময়কে বেঁধে দেবার অধিকারী। নির্দেশক আবার সেই অধিকার লাভ করেছে নাটকের বিষয়বস্তু ও ঘটনা থেকে। নির্দেশকের হাতে অভিনেতৃবৃন্দ হোচ্ছেন স্থানের দিকনির্ণয় যন্ত্র এবং কালের ঘড়ি।

এইসবের মধ্যে থেকে আমরা প্রথমে তিনটি উপাদানের সৃষ্টি দেখতে পেলাম—নাট্যকার, অভিনেতা ও দৃশ্যে রূপান্তরিত স্থান। সময় বা কালকে এখন ধরা হ'চ্ছে না। অবশ্য নাট্যকারের নির্দেশমত অভিনেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যদি দৃশ্যের অবতারণা ঘটে তাহ'লে কাল বা সময়ের ব্যাপারটাও নাট্যকারের হাতে থেকে যাচ্ছে। কেননা অভিনীত চরিত্রের বাঁচার কাল, তৎকালীন বয়স এবং দৃশ্যগত সময় - সবটাই নাট্যকারের নির্দেশ অনুযায়ী ঘটে। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নাট্যপরিবেশনে যা কিছু বিপর্যয় ঘটে তা শুধু আমাদের অজ্ঞতার জন্যেই।

এবার ক্রমানুসারে গোড়া থেকেই ধরা যাক। প্রথমে নাট্যকার আর তার নাটক। নাটকের একটি দৈর্ঘ আছে এবং সেটা নাতিদীর্ঘ কয়েকটি

খণ্ডের সমষ্টি। এখন প্রশ্ন ওঠে নাটকটি কত সময় অভিনীত হবে তার সঠিক নির্দেশনামা দেবার কোনো উপায় কি নাট্যকারের আছে? উত্তরে বলা যায়—"নেই"। কথাবার্তার সময় বেঁধে নাটক লেখা সম্ভব নয়। কখনো ধীরে, কখনো ক্ষিপ্র গতিতে আবার কখনো বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বাক্যগুলি বলা হয়। অতএব এগুলি বিচার করে সময় বেঁধে দেওয়া নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ অতি ধীর গতিতে বললে ঘটনার সঙ্গতি ব্যাহত হয়, অতি ক্ষীপ্র গতিতে বোললে কথাগুলির অর্থ বুঝতে অসুবিধে ঘটে—আবার এ দু'য়ের মাঝখানের ব্যবধানটা যথেষ্ট প্রশস্ত। নাট্যকার শুধু লিখে দিতে পারেন "ধীর গতিতে", "ক্ষিপ্র গতিতে", "আস্তে" বা "উঁচু স্বরে" প্রভৃতি। কিন্তু কতখানি ধীরগতিতে, কতখানি ক্ষীপ্রগতিতে, কতটা আস্তে বা কতটা উঁচুস্বরে তা লেখা তার সাধ্যের বাইরে। অতএব এগুলো নাট্যরচনার মধ্যে আসে না। উপরন্তু অভিনেতার আয়ত্বের মধ্যেও যে সময়টা সব সময় থাকে, তাও নয়।

অতএব লিখিত শব্দও সময়-সূচীর নির্দেশ দেয় না—মোটামুটিভাবে অভিনেতার ইচ্ছার ওপরেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এথেকে বোঝা যায়, সময়সূচীর দায়িত্ব সম্পূর্ণ ঘাড়ে নিয়ে অভিনেতা মঞ্চে অবতীর্ণ হন—অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে। আধুনিক মঞ্চেও এই ইচ্ছাধীনতা বিদ্যমান। নির্দেশক, মঞ্চ নির্দেশক, আলোকশিল্পী এবং অন্যান্য মঞ্চস্থাপত্য শিল্পীরা সকলেই একটা "ধরে নেওয়া যাক" পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে যান। অন্যান্য শিল্পকর্মে এই আদর্শ একেবারে অচল। যদিও নাট্যকারের ইচ্ছাই আদর্শ নীতি হওয়া উচিত—কিন্তু আমরা জানি যে, সব-কটা গ্রন্থিই তাঁর আয়ত্বের মধ্যে নয়।

নাট্যকলা শিল্প হিসাবে অত্যন্ত জটিল বললে আপত্তি হ'তে পারে কিন্তু নির্দ্বিধায়ই তা বলা চলে। যেমন অন্য কোনো শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলে এটা বোঝার সুবিধে হতে পারে। যদি সঙ্গীত শিল্পকে আমরা উদাহরণ স্বরূপ ধরি, তা হ'লে দেখা যায় যে একজন সঙ্গীতশিল্পী গান বেঁধেছেন ও সুর দিয়েছেন—অর্থাৎ স্বরলিপি তৈরী করে দিয়েছেন। এখন মঞ্চের বাঁধা নিষেধগুলো তাঁর কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করবে না—কিন্তু গলার স্বর

বা বাদ্যযন্ত্র তাকে কিছু অসুবিধায় ফেলতে পারে। আবার নাটকের মত পরস্পরের কথাবার্তায় পারস্পরিক উত্তর প্রত্যুত্তরের যে তাল বা ফাঁক সেরকম কোনো বাঁধায় তাঁর গানের ক্রমবিকাশ আক্রান্ত হ'চ্ছে না। বাদ্যযন্ত্রগুলো গানকে অনুসরণ করছে বলে সেগুলো কাউকে নির্দেশ দিতে পারছে না। সুরকার এখানে কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর রচিত গানের কথা ও তার সুরই পরিবেশিত হবে। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছাধীনেই পরিবেশিত হবে। কিন্তু নাট্যকারের সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছাধীনেই পরিবেশনের অবকাশ নেই। কেননা অভিনেতার ক্ষমতা আছে কোথাও বা বর্জন, কোথাও বা অনুপ্রবেশ করানোর। কিন্তু কেন? গানের কথা ও স্বরলিপির মতই নাট্যকারও তো নাটকে শব্দ-যোজনা ক'রেছেন ও বলার ভঙ্গীর নির্দেশ দিয়েছেন এবং সঙ্গীতকার ও নাট্যকার দু'জনেই তো কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন। তাহ'লে তফাৎটা কোথায়?

আমরা আর এক ধাপ এগিয়ে যাই। সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার ব্যক্তিটি মারা গেলেন কিন্তু পরবর্তী সঙ্গীত পরিচালক তাঁর লেখা গান ও সুরের হুবহু পরিবেশন যখন করতে পারেন—তখন নাট্যনির্দেশক নাট্যকারের রচিত নাটকের বক্তব্য ও সুরকে হুবহু নাট্যকারের ইচ্ছানুযায়ী কেন পরিবেশন করতে পারবেন না? তার কারণ গানের কথা ও সুরের যে লিপি রয়েছে তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণ করলেই হুবহু সঙ্গীত রচয়িতার ইচ্ছানুযায়ী ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিবেশন করা যাবে। একই গান একই সুরে গীত হ'লে—প্রতি বারেই তার পরিবেশনের সময়ের কোনো পার্থক্য হবে না। এই যে নির্দ্দিষ্ট পথে—নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিবেশিত হ'চ্ছে—সেখানেই সঙ্গীতশিল্পের সার্থকতা সম্পূর্ণ। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে ও রকম কোনো নির্দ্দিষ্ট পথ বা সময়ের পরিমাপ নেই। যার জন্যে নাট্য-পরিবেশনে সঙ্গীত-রচয়িতার মতন নাট্যকারের মত এবং পথকে হুবহু পরিবেশনার সম্ভাবনা থাকে না।

নাট্যকারের সব চেয়ে বড় নির্দেশনামা কি? উত্তরে কেউ কেউ বলতে পারেন, তাঁর রচিত নাটকের নাম। কিন্তু নাটকের নির্দেশ হ'তে পারে কি কখনও সম্পূর্ণ? যদি নাট্য নির্দেশক বা অভিনেতা

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে কিছু ভুল করেন বা নাটকের নায়ক অভিনয় ক্ষমতার বলিষ্ঠতা না থাকার দরুন যে ভুল করেন বা দৃশ্যাঙ্কন প্রণালীতে কিছু একটা থাকে বা আবাহনসূচীতে কিছু ত্রুটি থাকে—নাটকের লিখিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কি তা সংশোধিত হবে? নাট্য পরিবেশনে বহুবিধ সমস্যা, বহু ভাবে বহু বারে দেখা দেয়। প্রথম দিনের ত্রুটি দ্বিতীয় দিনে থাকে না। আবার দ্বিতীয় দিনের নির্ভুলতা—তৃতীয় দিনের ত্রুটি হয়ে দেখা দেয়। যেমন কোনোদিন হয়ত অভিনেতা "কিউ" হারিয়ে ফেলে সংলাপ বোললেন, কোনোদিন হয়ত আবহসঙ্গীতের ঠিক অংশটা অভিনাংশের ঠিক জায়গায় সন্নিবেশিত হ'ল না, কোনোদিন হয়ত দৃশ্য শেষের আলোটা ঠিক সময়ে নিভ্‌লো না, আবার কোনোদিন হয়ত দৃশ্য শেষের অনেক আগেই আলোটা নিভে গেল, এবং কোনোদিন হয়ত দৃশ্যের গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গীমার অনেক পরে গুলির শব্দ পেছন থেকে বেরোলো এ রকমের বহু সমস্যা, বহু ত্রুটি প্রতিদিন আবিষ্কৃত হ'চ্ছে। এভাবে সময়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিখুঁতভাবে নাট্য পরিবেশন করার সুযোগ নিয়ম করে আসে না। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে, সঙ্গীত-রচয়িতা ও নাট্যকারের লিখিত বর্ণ ও চিহ্নের মধ্যে অনেক তফাৎ। এই তফাৎটাকে একই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা চলে না। অথচ দু'জনেই শিল্পসৃষ্টির গৌরবের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন, করতেও পারেন। ঐ দাবী কি ন্যায়সঙ্গত?

শিল্পসৃষ্টি কি? কতকগুলি উপাদানে গঠিত শিল্পীর চেতনালব্ধ কর্ম। শিল্পীর নিজস্ব চিন্তাকে প্রয়োজনীয় কতকগুলি উপাদানের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশের নামই শিল্পসৃষ্টি। সেই সৃষ্টিই তাঁর চিন্তার মূল্য নির্দ্ধারণ করে। শিল্পীর কাজ হ'চ্ছে কোনো প্রেরণা বা উপলব্ধি থেকে শিল্পসৃষ্টি করা। যদি এই সৃষ্টিতে শ্রম বণ্টনের প্রয়োজন হয় সেটা হবে বাইরের, অন্তরের নয়। শিল্পসৃষ্টির সবকিছুর প্রভুত্ব করবে শিল্পী নিজে। শিল্পী যদি সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি না করেন, যদি তা অপরের চিন্তা বা কর্ম থেকে ধার নেন, তা হ'লে তাকে শিল্প আখ্যা দেওয়া যাবে না। সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন পর্যন্তও তাঁর কর্মের ওপর প্রভুত্ব করেন কিন্তু নাট্যরচয়িতা তা পারেন

না। কেন না দর্শকদের সামনে যে নাট্যপরিবেশন হয়, তার সমস্তটাই নাট্যকারের নয়। অতএব যেহেতু তিনি তাঁর কর্মের সবকিছুর ওপর প্রভুত্ব করেন না সেহেতু তিনি শিল্পী নন্। তাঁর যত প্রভাবই থাকুক সমস্তটাই নাটকের বই-এর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্থান কাল ও সময় কোনোটাই তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে থাকে না। অবশ্য নাটকের পরিপূরক হিসাবে থাকে। নাটক মহলার সময় নাট্যকারের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করার মত। চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে আলাপের সময় তাঁদের প্রশংসা করার সময় নাট্যকারের মুখের ওপর যে ব্যথার ছাপ ফুটে ওঠে তা লক্ষণীয়।

আমরা এখন, ও সমস্যার জটিল স্তরে না এসে ঠিক আরম্ভে পৌছেছি। যদি নাটক পরিবেশনা শিল্পকর্ম না হয় তবে এ নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। নাট্য পরিবেশনা শিল্পকর্মের আখ্যা না পাওয়ার সমস্যাটা কোথায়? কিভাবে নাট্যকারকে শিল্পী করা যাবে এবং যেহেতু তিনি শিল্পীর সম্পূর্ণতা লাভে অক্ষম অতএব কে তাকে শিল্পী হ'তে সাহায্য কোরবে?

আমরা এই সমস্যার সহজ উত্তর দিতে পারি, যদি নাট্যকারের কাজটাকে "পুস্তকাকারে নাটক" ও "মঞ্চে নাটক" এই দু'ভাগে ভাগ করে না নি। যদিও ভাগ না করে একক কর্ম হিসাবে কল্পনা করা শক্ত, তাহ'লেও আমরা তা পারি। কেননা যদি কণ্ঠসঙ্গীত, বাদ্যসঙ্গীত একই শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয় আমরাই বা কেন মঞ্চে নাটক পরিবেশনার কাজটাকে একক শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রহণ করব না?

মঞ্চে সঙ্গীতের প্রভাব কতখানি? মঞ্চের গতির মাধ্যম হিসাবে সঙ্গীতের প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গীত কি অভিনেতাদের চলাফেরার গতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলে? সেটাই সমস্যা। অভিনেতার চলাফেরার মাধ্যমে সেই চরিত্রের মনের গতি লক্ষিত হয়। অঙ্গচালনার নানান্ ভঙ্গী অভিনেতা আহরণ করে, নানা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে এবং সেই সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগায় নানা চরিত্রাভিনয়ের সময়। কথাও অবশ্য চরিত্রচিত্রণের আর একটি বড় মাধ্যম। কিন্তু 'ভালবাসা' শব্দটি কখনই ভালবাসলে যে অনুভূতি হয় তাকে বহন করে আনে না। সারাজীবন এই "ভালবাসা" শব্দটি উচ্চারণ

না করেও আমরা ভালবাসা দিতে পারি, ভালবাসা পেতে পারি। অতএব কথার প্রয়োজনীয়তা চরিত্রচিত্রণে কতটুকু? কথার চেয়ে তার বলার ভঙ্গিমাটিই হল আসল। যে ভঙ্গিমায় কথা বলা হয় সেই ভঙ্গিমাটুকুই মনের ভিতরে প্রবেশ করে। যেমন ছুরিবিদ্ধ করার কাজটা যদিও প্রমাণ করে ছুরিটা শরীরের মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করেছে কিন্তু কতখানি ঘৃণা, দ্বেষ বা হিংসা রয়েছে ছুরিবিদ্ধ করার কাজে, সেটা প্রমাণ করে না। আমাদের বাইরের কাজের সঙ্গে মনের সম্যক ভাব ফুটে ওঠে না। অবশ্য যদিও মনের কথায় নির্দেশ তাতে থাকে। সঙ্গীত ছাড়া নাটক পরিবেশন একটা অদ্ভুত কল্পনা।

সময় বা কালের ওপর প্রভুত্ব করতে পারার অধিকার সঙ্গীতের আছে। তা না হ'লে সময় বা কালের যে প্রভাব আমাদের ওপর বর্তায় সেই রকম উপাদানের তীব্রতাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে সঙ্গীতকে। তা ছাড়ার যুক্তি আমরাই দিতে পারি। কারণ আমরাই যে শিল্পের সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ সঙ্গীতের সৃষ্টি এবং উৎকর্ষ আমাদের দ্বারাই ঘটেছে। সেই সঙ্গীতকে আমরা কি অগ্রাহ্য করতে পারি? আমাদের মন থেকে মনের গভীরে কোনো ভাবকে পৌঁছে দেবার ভার সঙ্গীতের। উচ্চারিত-শব্দ বা ভঙ্গিমার চেয়েও মনের গভীরতা স্পর্শ করার ক্ষমতা সঙ্গীতেরই বেশি। নাট্যকার তার বক্তব্য বলতে যতখানি সময় নেন, সঙ্গীত অতটা সময় না নিয়েও গভীরভাবে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতশিল্পীর প্রকাশের মাধ্যম এটাই। কিন্তু যেই স্বরলিপিসহ মুহূর্তে সঙ্গীত লিখিতভাবে উপস্থিত হ'ল অমনি সঙ্গীতশিল্পীর দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয়ে গেল। শ্রোতাদের কাছে সঙ্গীত বহন ক'রে আনে তার আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতিকৃতি ও গভীরতা। তাই নাটকাভিনয়ের যে অংশে বিরক্তির উদ্রেক করে সেখানে সঙ্গীত সাহায্য করে তাকে সুন্দরতর ও মর্মগ্রাহী করতে। মঞ্চ ও নাটকের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করে দেয় আবহ সঙ্গীত। এছাড়া নাটকীয় ঘটনাগুলোকে মর্মগ্রাহী করতে সঙ্গীত পেছন থেকে অনেক সাহায্য করে। তাতে করে নাটকীয় পরিবেশের মূল্যায়ণ বৃদ্ধি পায়। অভিনেতার অভিনয়ের পেছনে যন্ত্রসঙ্গীতের যে উন্মাদনা থাকে—দু'য়ে মিলে

দর্শকমনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে রাখে। অভিনেতা বিশ্লেষণ করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে যখন বাক্যের টুকরোগুলো দর্শকের সামনে বলতে থাকেন সেই সঙ্গে সঙ্গীত ফাঁকে ফাঁকে বা কখনও একসঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে দর্শকমনের গভীর তল ছুঁতে ছুঁতে এগিয়ে যায়। অতএব সঙ্গীত নাটকের এমন একটি অংশ জুড়ে থাকে যে, নাট্যসৃষ্টির অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—কারণ দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সমতা রক্ষার একমাত্র উপাদান সে নিজে।

নাট্য প্রযোজনার ব্যাপারে ক্রমানুসারে এর বিভিন্ন অঙ্গের স্থান ছিল এরূপ—নাট্যকার, অভিনেতা ও দৃশ্য রূপায়িত স্থান। এখন সঙ্গীত এল চতুর্থ উপাদান হিসাবে। বস্তুতঃ সময়কে জয় করার জন্যে সঙ্গীত তার স্থান করে নিল নাট্যকার ও অভিনেতার মাঝখানে।

তাই আসলে একমাত্র সঙ্গীত দর্শক সমক্ষে যা পরিবেশন করতো নাটক তার সম্ভার নিয়ে এগিয়ে এল সেই কাজ করতে। আর সম্পূর্ণ সামনে এসে পড়ল অভিনেতৃবৃন্দ। আঁকা ছবি একসময় যে শিহরণ জাগিয়ে তুলতো—নকল জীবন অর্থাৎ অভিনেতারা সেই প্রশংসার অনেকটা অংশ গ্রহণে এগিয়ে এল। তারপর বহুদিন গেল এবং দেখা গেল সঙ্গীত নাটকে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। অভিনেতার প্রাধান্য বাড়ানোর জন্যে দৃশ্যের প্রাধান্য কমানো হোল বটে কিন্তু দেখা গেল, অপর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে সঙ্গীত। নাট্যকার নির্দেশক বন্ধুত্ব স্থাপন করল যন্ত্রের সঙ্গে অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে। তখন সঙ্গীত হয়ে উঠল একটি বিশেষ উপাদান, নাট্যকর্মের একটি বিশেষ কর্মরূপে। নাটকাভিনয়ের সময় তীব্র ঘটনাগুলি যখন ঘটে, তখন কি দর্শকের মনে আলোড়ন তোলে না সঙ্গীতের ধাক্কা? সত্য কি তখন সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় না দর্শকের মনে? অভিনেতার সবরকম আবরণের উন্মোচন হয়ে দর্শকমন কি ঘন আবেশে মূর্ত হয়ে ওঠে না?

সঙ্গীত যেন বলছে, "আমাকে প্রকাশের যদিও কম সময় তোমরা দিয়েছ তবুও আমি আরো বলতে পারি, আরো বোঝাতে পারি।" তাই যখন কথার সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা হ'ল, দেখা গেল কত বলিষ্ঠ কত প্রাঞ্জল হয়েছে

তার প্রকাশভঙ্গিমা। সঙ্গীত সর্বদাই সত্যকে প্রকাশ করে। তাই সে যখন মিথ্যার আশ্রয় নেয় সে কথা সে আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু শব্দ বা বাক্য? সে কি তাই? যে দৃশ্যে সঙ্গীত আছে তা সে যে রকমই হোক, তার প্রকাশ হয় সুন্দর। তবে এর ব্যবহারের মধ্যে থাকা চাই সততা; দর্শকমনের ওপর অবিচার করা কখনও উচিত না। প্রয়োজনের জন্যই সঙ্গীতের ব্যবহার হওয়া উচিত। কাব্যনাট্যে যে একটানা সঙ্গীতের ব্যবহার হয়, তাতে আসে দর্শকের ক্লান্তি তবুও আমরা আশ্চর্য সঙ্গীত চাই। এর থেকেই প্রমাণ হয় আমাদের মনে সে কতখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে। কারণ আমরা জানি, অভিনেতার বক্তব্যের ভেতরকার সুরটিকে সঙ্গীত আমাদের মনের অনেক গভীরে পৌছে দেয়। এর টুকরো টুকরো সুর অভিনেতাকে নতুন নতুন প্রকাশ ভঙ্গিমায় সাহায্য করে। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে মিতালি করাই নিখুঁত পদক্ষেপ। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীত ছাড়া যদি কোন দৃশ্যের মহলা হয়ে থাকে, পরবর্তীকালে সঙ্গীতসহ মহলায় সে দৃশ্যের অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন হ'বে এবং পুর্বতন মহলাগুলোকে ছেলেমানুষী বলে মনে হ'বে অবশ্যই।

সঙ্গীতবিহীন নাটক হয়ত অনেক দিন বেঁচে রইল—হয়ত' বা চিরকাল বেঁচে রইল এবং যতদিন সে ঐ পুরনো ঐতিহ্য বহন করে বাঁচল সে হয়ত নতুন নতুন উপাদানগুলোকে গ্রহণ করল বা করল না। কিন্তু সঙ্গীতের স্পর্শ না এলে নাট্যসৃষ্টিকে শিল্প আখ্যা দেওয়া যাবে না। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সঙ্গীত ছাড়া সফল নাট্যসৃষ্টি সম্ভব নয়—কিন্তু সে সাফল্যটা আকস্মিক

এখন আমরা দু'টি সিদ্ধান্তে পৌছেছি; প্রথমটা নাটকের উৎপত্তি অর্থাৎ নাট্যকার। এবং দ্বিতীয়টা পরিবেশনের রূপ অর্থাৎ অভিনেতা। যদি নাট্যকারকে শিল্পী হ'তে হয় তাঁকে সঙ্গীতজ্ঞ হতে হবে, আর অভিনেতাকে যদি নির্দিষ্ট স্থানকে তার চলাফেরার প্রকৃত ক্ষেত্র তৈরী করতে হয় তাবে নাট্যকারের কাছ থেকে সঙ্গীতের ইঙ্গিত জানতে হবে। অতএব একথা বলা যায়, সে ক্ষেত্রটি (আলোসহ) স্বতঃপ্রকাশিত হবে অর্থাৎ জীবন্ত হবে যখন

এখানে অভিনেতা পদক্ষেপ করবে। এই সকল নীতির কথাই চিন্তনীয় অবশ্য নিজ নিজ ভঙ্গীতে। এখন এই নীতিগুলোকে সর্ব্বজনীয় আখ্যা দেওয়া যায়। যাদের কাছে অবশ্য সঙ্গীত গোষ্ঠীভুক্ত শিল্প তাঁরা অখুশী হবেন। কিন্তু যাঁরা জানেন যে সঙ্গীত হচ্ছে মানুষের শরীরের শিরায় অনুরনিত—সৃষ্টির মূর্চ্ছনা, পৃথিবীর প্রকাশের সুর, তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন। বিজ্ঞানের ভুল হয় না—তার নিয়মগুলো আমাদের বুঝতে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা যারা এই নিয়মকে না মানি—তারাই ভুল করি। নাট্যকলায় আমরা বহুদিন ভুলপথে চলেছি। আমরা সেগুলোকেই বড় করে দেখেছি, যেগুলোর সঙ্গে নাটকের যোগ নেই। এবং বস্তুতঃ বহুদিন নাটক আমাদের আলমারীর শোভাবর্দ্ধনই করে এসেছে। অতএব আমাদের এই নতুন প্রচেষ্টা, নতুন চিন্তাধারাকে পত্রিকা মারফৎ জনসমক্ষে হাজির করা দরকার—নতুন নতুন রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করা দরকার। আমাদের নাটক পড়ে বই বন্ধ করে নতুনভাবে চিন্তা করার দরকার।

'সঙ্গীতসহ নাটক'—এর অর্থ এই নয় যে নাট্যকল্পনার উৎস হবে সঙ্গীতের ধ্বনি। তবে নাটকের মর্মবাণীর সঙ্গে সঙ্গীতের রেশ একাত্ম হয়ে থাকবে। নাট্যোপলব্ধির অভ্যন্তরে সে বাসা বাঁধবে। অর্থাৎ নাটকের ভেতরকার লুকনো সুরটাকে সে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে। একটি কঠিন নাটকীয় স্তরে সে আত্মগোপন করে থাকবে। অতি বড় ভাস্করের হাতে হাতুড়ি এবং ছেনি না থাকলে সে যেমন সুন্দর প্রস্তরকেও রূপ দিতে পারে না তেমনি শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর প্রাথমিক উৎসাহ প্রধান। যদি সে তার অনুভূতিকে ত্রিমাত্রিক আকারে প্রকাশে অক্ষম হয়—সে কেবলমাত্র পটুয়া বা খোদাইকার হতে পারে, তার উৎস ত্রিমাত্রিক আকারে রূপ নেয় না। যদি নাট্যশিল্পীর স্বভাব বা চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতকে অক্ষতভাবে প্রকাশের জ্ঞান থাকে—তাহ'লে শুধুমাত্র কথা ছাড়াও সে নাটকীয় কয়েকটি ঘটনার কথা চিন্তা করবে। আবার সে যদি তা প্রকাশে বিশ্বাসী হয়, তবে সমস্ত নাটকীয় দর্শন অন্য রূপ নিয়ে হাজির হবে।

এবার আমরা অভিনেতার কথা আলোচনা করব। আমরা জানি যে

সঙ্গীতের সাহায্য থাকলে অভিনেতা তার ভঙ্গিমাকে যতটা সম্ভব শুদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং চরিত্রচিত্রণে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। অতি সহজে, শিখতে পারার ওপর অভিনেতার মূল্য নিরূপিত হয়। আবার সঙ্গীত তার রূপ পালটে দেয়। শিল্পের শর্তগুলোর প্রতি সে প্রথমে বশ্যতা স্বীকার করে সেগুলোকে গ্রহণ করে। এইভাবে তার স্বকীয় সৌন্দর্যের গোপনদ্বারকে সে উন্মুক্ত করে। তারপর প্রশংসনীয় স্বীয় ধারনাগুলোকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে থাকে। এবং সেই রূপটার ওপর প্রভুত্ব করে। এরপর আসে সেই রূপকে নানান সম্ভারে সাজানোর ব্যাপার। আমাদের শেষ সমস্যা অভিনেতার মাধ্যমে টুকরো টুকরো সঙ্গীতের সুর দিয়ে অভিনয়-ক্ষেত্রকে সজীব করা।

এবার আসে মঞ্চের কথা। মঞ্চের সামনেটা—যা দর্শকের দিকে সামগ্রিক দৃশ্যের উচ্চতার অর্দ্ধেক। যার ফলে মঞ্চের মেঝেটাকে দেখে মনে হয় যেন দু'পাশে—অল্পবিস্তর শূন্য জায়গার মধ্যে সেটা ঝুলছে। আজ সকলেই বলে থাকে, মঞ্চ হচ্ছে পৃথিবী। সঠিকভাবে বললে বলা চলে এটি সম্পূর্ণ অংশের একটি অংশ। দৃশ্যগুলি পর্দায় আঁকা হয় এবং আশে-পাশে টুকরো দেওয়াল আঁকা পর্দা, দরজা-জানালা আঁকা পর্দা দিয়ে মোটা-মুটি একটা কল্পনায় আনা হয়। এক দৃশ্যকে সরিয়ে আবার অন্য দৃশ্য তৈরী হয়। ড্রপসিন দু'পাশে এমনভাবে লাগান আছে যে, যে কোনো মুহূর্তে সেটাকে দর্শকদের সামনে ফেলে দিয়ে দৃশ্যটিকে ঢাকা যায়। মেঝের একটা মাপ আছে—তা আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। কারণ সেখানে দৃশ্য সাজানো বা টানাটানি করার জায়গা থাকা চাই। কতকগুলি মঞ্চ আবার এমনভাবে মেঝে তৈরী করে যে সেগুলিকে নামানো বা ওঠানো যায়। কতকগুলি মঞ্চ আবার ঘূর্ণায়মান। এর ওপর দৃশ্য সাজানো থাকে এবং সেগুলো ঘুরে ফিরে প্রয়োজন মত দর্শকদের সামনে আসে। এভাবে ছবির বইএর মত দৃশ্যগুলি দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়। বর্তমানে আঁকা দৃশ্যের যুগে মঞ্চের যথেষ্ট বিস্তৃতি প্রয়োজন। যা হোক মঞ্চটাকে একটা খাঁচার মতো লাগে। ত্রিমাত্রিক আকৃতিতে গড়া অভিনেতারা তার মধ্যেই চলাফেরা করে।

এভাবে অসম্ভব মিথ্যে কতকগুলো আঁকা দৃশ্যের মধ্যে বাক্য বিশ্লেষণ করে প্রকাশভঙ্গিমার সাহায্যে অভিনেতাকে আবহাওয়া সৃষ্টি করে যেতে হয়।

এবার আলোর কথা। মঞ্চের অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর প্রয়োজন। দৃশ্য বলতে আলোছায়ার মিশ্রণে যে ছবি আঁকা থাকে সেগুলোকে প্রকটিত করার জন্যে চাই আলো। আঁকা দৃশ্যে দু'রকম আলোর সাহায্য লাগে— প্রথমটা দৃশ্যে আঁকা থাকে দ্বিতীয়টা তার ওপর ফেলা হয়। দৃশ্যে আঁকা কোনো সূর্যের আলো নিজেই উদ্ভাসিত হয় না—যদি না আলোর সাহায্যে সেই জায়গাটাকে আলোকিত করা হয়। জীবন্ত সচল মূর্তিগুলিকে এরূপ আবহাওয়া দিতে হয়। অভিনেতাকে আলোকস্নাত করানো হয়, যদিও তার জন্যই শুধু আলোর প্রয়োজন হয় না। তাকে দেখা গেলেই হ'ল। মঞ্চের সব দিকেই আলোর প্রয়োজন এবং এমন কি মেঝেও বাদ পড়ে না। সেজন্যই পাদপ্রদীপে আলোর প্রয়োজন। অবশ্য অভিনেতাও এ আলোর সাহায্য পায়। এইভাবে মঞ্চকে আলোকিত করার জন্যে আলাদা আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। কখনও দৃশ্যের পর্দার পেছন থেকেও আলো ফেলা হয় এবং পর্দাটিকেও তদনরূপ প্রয়োজনে পাতলা করা হয়। যেমন কোনও আগ্নেয়গিরির দৃশ্যে অগ্নুৎপাত, অগ্নিশিখা প্রভৃতি দেখানোর জন্যে এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই গেল আলোর কথা। এবার আসে আলোর রং। ভাল ভাল রঙ্গমঞ্চে শিল্পাকে দিয়ে গীলোটিনের সাহায্যে তিন চার রকমের রঙ্ দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করা হয়।

এইভাবে অভিনয়ে নানারকম মঞ্চের সাজসরঞ্জাম লাগে। অতএব সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে নানারকমের উপাদান প্রয়োজন কেননা যখন মঞ্চের দৃশ্য শূন্য থাকে অর্থাৎ কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী সেখানে থাকেনা—সেই দৃশ্যের প্রভাবও দর্শক-মনকে আকৃষ্ট করে। দৃশ্যে আঁকা ছবি যেন আলোর সাহায্যে এমন একটা কল্পনা সৃষ্টি করতে পারে, যাতে দর্শক মনে করবে যেন সত্যি। অভিনেতাশূন্য দৃশ্য দেখে যেন মনে না হয় সমতলভূমির ওপর লম্বাভাবে কতকগুলি আঁকা কাপড় ঝুলছে। যতরকমের আধুনিক কায়দায় ঘরের রং করা যায়, সে সকলই যেন দৃশ্যে ব্যবহার হয়। কেননা যে দৃশ্যে যে ধরণের

চরিত্র যাতায়াত করছে তাদের কাপড় চোপড় বা ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দৃশ্যের ছবি করা দরকার -- মনে যেন না হয় যে দৃশ্যটি অভিনীত ঘটনার অঙ্গ নয়। দর্শকমন কিন্তু তাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়েই ওগুলির বিচার করে।

এই অসামঞ্জস্য বোধের বিরুদ্ধেই প্রথম আমরা সংস্কারের কথা ভাবলাম। যদি শুধু অভিনেতাকেই আলোয় আনা হ'ত তবে দৃশ্যগুলো স্বস্ব প্রকাশ থেকে বঞ্চিত হ'ত। মেঝের আলোরও সেই অবস্থাই ঘটত। অভিনেতার স্বার্থ দেখতে গেলে মঞ্চশিল্পীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। আবার অভিনেতাকেও উপেক্ষা করা চলে না। অতএব এই উভয়সঙ্কটের হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে? সমস্ত সমস্যাটা এখন এভাবে আসে—হয় অভিনেতা নয় চিত্রশিল্পী? আমাদের বর্তমান সংস্কারের ভাবনা সেখানেই—আমরা অভিনেতার স্বার্থ বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ না করে দৃশ্যের সব কিছুকেই কিভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরবো।

যাঁরা বাস্তববাদী নাট্যপরিবেশনে বিশ্বাসী, তাঁরা এই আদর্শের কথা শুনে বিস্মিত হবেন। ঘরের সামান্য আসবাবপত্রের মাঝখানে অভিনীত চরিত্রগুলির চলাফেরাতেই তারা খুশী এবং মুখাবয়বের কোনো প্রকাশ ভঙ্গিমার ওপর তাদের কোনো ঝোক নেই। ভালকথা, সমস্ত নাটকীয় ঘটনাই কি দরজা জানলায় আবদ্ধ কোনো ঘেরা জায়গায় ঘটার পক্ষে যথেষ্ট? হয়ত নাটকে একটা বাগানের দৃশ্য আছে। অবশ্য বলা যেতে পারে মঞ্চের ওপর কি গাছপালা পোঁতা সম্ভব?

অভিনেতাই সব এ অতি সত্য কথা—নাটক কথাবার্তার আদান-প্রদানে গড়ে ওঠে এবং তাদের সেই কথাবার্তা শুনতে পাওয়া ও অভিনেতাদের দেখতে পাওয়াই যথেষ্ট। তাহ'লে মঞ্চের প্রয়োজন কি এবং দর্শকদের বসবার জায়গা আলাদা করার অর্থ কি? ভালভাবে সাজিয়ে অনেক আলো দিয়ে একটা বড় ঘরেই তো নাটকাভিনয় করা চলত। এতে খরচও কম হ'ত এবং পাড়ায় পাড়ায় রঙ্গালয়ও স্থাপন করা যেত। আসল কথা সেখানে নয়। কারণ নাটককে আমরা শিল্প হিসাবে বেছে নিয়েছি। আর সেই শিল্পসৃষ্টিতেই আমরা মনোনিবেশ করেছি। ভবিষ্যতে হয়ত

অন্য অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু শিল্প হিসাবে নাটককে সৃষ্টি করতে হলে—হলঘর ও রঙ্গালয়ের মধ্যে পার্থক্য একটা রাখতেই হবে। ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, বেশীর ভাগ লোকই এই পার্থক্যের পক্ষে। কেননা আমাদের মনের গতি এবং প্রবৃত্তি এত জটিল যে শুধুমাত্র কথাবার্তার আকারে নাটককে সীমাবদ্ধ রাখতে বেশীরভাগ লোকই চাইবে না। যেমন দৃশ্যটাকে সবাই চাইবে ঠিক ঠিক ভাবে তার সামনে আসুক এবং মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করুক। কথা ছাড়াও অপর অনেকগুলি এমন উপাদান চাই যাতে করে মনের নিগূঢ় ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ হবে। জীবনের প্রকাশ কেবলমাত্র কথায় নয়। তাই নাট্যশিল্পের মাধ্যমে জীবন সম্পূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হোক। অবশ্য একথা স্বীকার্য, বাস্তবানুগ নাটক দৃশ্যের সমস্যার সম্মুখীন হয় না তবে সেই চিন্তার স্থান অনেক গভীরে এবং উঁচুতে।

আধুনিক সংস্কারের প্রধান সমস্যা আলোকশিল্পে। অবশ্য বর্তমান সকল ব্যবস্থাকে চালু রেখেই তা এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন পাদপ্রদীপের আলোর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে ছবির জমিটাকে অর্থাৎ অভিনেতা অধিকৃত এলাকাকে দৃষ্টির সামনে আনা। ঐ আলো অভিনেতাদের মুখাবয়বের চিহ্নগুলোকে স্পষ্ট করে। আমরাও সন্তুষ্ট হই। কিন্তু অভিনয় শুধুমাত্র মুখাবয়বের ওপরেই সীমাবদ্ধ নয়, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনায়ও অভিনয় আছে। এই স্বাভাবিক চলাফেরাটাও আমরা নিখুঁতভাবে দেখতে চাই। তাই অভিনেতাকে তার প্রত্যেকটি অবস্থায় দৃশ্যমান করার একান্ত প্রয়োজন আছে।

অভিনেতাকে যতই পরিষ্কার করে দেখানো যাবে দর্শকদের কাছে, ততই অভিনীত চরিত্রের প্রকাশিত রূপ দর্শকমনের ওপর তার ছাপকে প্রকট করবে। আর অভিনেতাও পাবে উত্তরমেলার আনন্দ। অতএব অন্ধকার আর কিছুই আমাদের সামনে থাকবে না—না চরিত্রের, না মঞ্চের। কিন্তু তবুও আর এক সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। ঐসব আলোর মাঝখানে অভিনেতাদের দেখলে মনে হয় যেন মাটি আর আকাশের মাঝখানে তারা ঝুলছে। তাই প্রয়োজন আছে দৃশ্যটিকেও আলোকিত করে দর্শকদের সামনে আনার।

কেননা ত্রিমাত্রিক প্রকাশই অভিনেতার পূর্ণ প্রকাশ। অতএব দৃশ্যকে আলোকিত করার একান্ত প্রয়োজন।

এরপর আসে আর একটি সমস্যা। সম্পূর্ণ আলোটা কিন্তু সামঞ্জস্য ও তাল রেখে আসা উচিত। যেমন অভিনেতা তার মুখাবয়বকে চিত্রায়িত করেছে অতএব তার প্রতিটি রেখার মঙ্কোপটন ও বিকোটন দর্শক-চক্ষুর কাছে পরিষ্কাররূপে যেন ধরা পড়ে। আবার বেশী আলো ফেললে হয়ত ব অভিনেতা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। সেজন্যে পরিমিত আলোকসম্পাতে তার ঐ মুখাবয়বের প্রতিটি চিহ্নকে আমাদের দর্শকের সামনে আনা উচিত।

অর্থাৎ আমরা কিছুই ছাড়তে রাজি না। পাদপ্রদীপের আলো সম্পর্কে একটা উদাহরণ আছে। কিছু লোক বলতে শুরু করল যে, কিছুক্ষণ নাটক দেখার পর আর দেখার প্রয়োজন হয় না—শুনে গেলেই চলে। দেখতে পাচ্ছি না বলা নাকি ছেলেমানুষী। তখন আস্তে আস্তে ঐ আলোর প্রচলন কমিয়ে ফেলা হ'ল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চতুর্দিক থেকে অভিযোগ আসতে লাগল যে, তাঁরা নাকি দেখতে পান না। আবার ঐ আলোর প্রচলন হ'ল। সেই সময় অবশ্য দৃশাঙ্কন শিল্পীরা খুব সুবিধে পেয়েছিল। কারণ দৃশ্যগুলোও খুব স্পষ্টভাবে লোকের চোখে ধরা পড়ত না। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের সমস্যা অনেক বেশী। আলোর প্রাচুর্যের জন্যে তাদের আঁকা ছবির কোথায় রেখা দেখা গেলে চলবে না—রং-এর সঙ্গে রং মিশিয়ে রেখাগুলোকে একেবারে মিলিয়ে দিতে হবে। অতএব আলোকসম্পাতই এনেছে দৃশ্যাঙ্কনের আমূল সংস্কার অবশ্য তা অভিনেতাদেরই সুবিধার্থে। অভিনেতার দায়িত্ব থেকেই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের যুগ প্রবর্তিত হয়েছে। আমরা যদিও এখনো অন্ধকারে হাতরাচ্ছি কিন্তু আমরা একটা শক্ত মাটি খুঁজে পেয়েছি। কায়দাকানুনের যদিও কিছু ঘাটতি এখনো আছে, তবুও আদর্শের মধ্যে কোনো গলদ নেই। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি Pitoeff, Gordon Craig, Stanislavaski ও Copeauর মত বলিষ্ঠ চিন্তানায়কদের গৌরবময় চেষ্টার মধ্যে।

কিন্তু মাটি যদিও শক্ত এর ক্ষেত্র অতি বিশাল। আর সেজন্যেই নাট্য-নির্দেশকের ভুল করার শেষ হচ্ছে না। জর্ম্যানদের ভাষায় যদিও "বাচ্চাকে

স্নান করিয়ে সব শোধন করে নেওয়া হ'য়েছে" তবুও অনেক অনেক গলদ এখনো আছে। এটা অবশ্য ভাল। হঠাৎ কিছু করে ফেলার চেয়ে ধীরে ধীরে সাবধানতার সঙ্গে করা উচিত। এটা খুবই লক্ষ্যের বিষয় যে মূকাভিনয়, নৃত্যাভিনয় এবং নাট্যাভিনয় প্রভৃতিকে নিয়ে আন্দোলনের এক নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে। নৃত্যে বা মূকাভিনয়ে বাক্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সঙ্গীতের সাহায্যে ও দেহ মাত্রকে নির্ভর করে জীবনকে প্রকাশ করতে হ'চ্ছে। আর মঞ্চাভিনয়ে বাক্যের মাধ্যমে তা করতে হ'চ্ছে। প্রথমটায় সঙ্গীতই প্রধান, অন্যটায় বাক্যের সাহায্যে নাটকীয় ঘটনাই প্রধান। এই দুই প্রধান উপাদানই প্রধান প্রধান ক্রম হিসাবে স্বীকৃত। আবার আমরা যদি Pitoeff এর পেছনে যেতে শুরু করে Valkyrie র নাট্যপরিবেশনার যুগে চলে যাই, আমরা দেখব যে, অতি আধুনিকতা থেকে আমরা অতি স্থূল নিয়মতান্ত্রিকতায় নিমজ্জিত হয়ে গেছি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনাই মুখ্য এবং নাটকে মুহূর্তকে-গুলো গৌণ হয়ে পড়েছে। সেখান থেকে শিক্ষণীয় কিছু নেই। এখন যেমন শক্তিতে অদম্য ও গুণে অপূর্ব একটি প্রধান মৌলিক উপাদান হিসাবে সঙ্গীতের স্বীকৃতি হয়েছে তখন তা ছিল না। এজন্য অভিনেতারাও তাদের কথা-বার্তা বলার ব্যাপারেও অপর একটা শক্তির অধিকারী হ'তে পারতেন না। তাই শরীর চালনার মধ্যেই অভিব্যক্তি সামায়িত থাকত। বর্তমানে যেমন নাটকীয় উপাদান সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে উৎসাহের অখণ্ড উৎসরূপে আমাদের সামনে হাজির হয় তখন Wagner এবং তাঁর অনুসরণকারীদের ছেড়ে দিলে দেখা যেত কাব্যনাট্যও আমাদের আশা পূরণ করতে পারছে না।

সঙ্গীতবিহীন শারীরিক অনুভূতিকে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। একে শিল্প বা কলাবিদ্যা বলা চলে না। কারণ আমরা জানি সঙ্গীত-ছাড়া পথ নেই। অতএব আমরা যদি আর একবার সঙ্গীত ও জীবন্ত দেহের মুখোমুখি দাঁড়াই—তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ সপ্রশংস উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখি—আমরা সেই সিদ্ধান্তেই আসব যাতে করে পরস্পরের ঐতিহ্য বজায় রেখে একই সুরে গাঁথতে পারি যার গুরুত্বপূর্ণ ও সুখী ভবিষ্যত আমাদের ন্যায় অন্যায়ের বিচারবস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

কাজের নামে অকাজ

মূল রচনা : জর্জ ডিভাইন
অনুসরণে : শংকরদাস বাগ্‌চি

মঞ্চের ওপর যা কিছু পরিবেশিত হচ্ছে তা নাট্য-সম্মত না হ'লে সেখান থেকে কিছু পাওয়া বা না-পাওয়া দুই-ই সমান। যে কোনো নৈতিক বা নৈসর্গিক ভাব তোমার মনে থাকুক না কেন—কিছু উত্তেজনাপুর্ণ সত্য সৃষ্টি করার দরকার। যদি কোনো অভিনেতাকে পরিচালক বলেন যে মহলার আগে প্রত্যেকদিন সকালে আধ ঘণ্টা ধরে পা দু'টো ওপরে ও মাথা নীচু করে থাকতে হবে এবং তা থেকে যদি নির্দেশক বা অভিনেতা কিছু লাভ করেন—তাতেও যথেষ্ট লাভ। সাধারণতঃ দু' রকমে পরিচালনা হয়ে থাকে। একরকম হচ্ছে—Peter Brook, Tony Guthries ও John Littlewood-এর মত প্রতিভাধরদের নির্দেশনায় নাটক পরিবেশন। অবশ্য এঁদের নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকে এঁদের ব্যক্তিত্বের একটা পুরো ছাপ থাকে। কিন্তু Royal Court-এর নাট্য পরিবেশনে এ-ধরনের প্রতিভাধরের ছাপ থাকে না। আমি যদি সব নাটকগুলোর প্রযোজনা করতাম আর বলতে পারতাম "ঠিক আছে। এই ভাবেই আমরা নাটক প্রযোজনা করে থাকি।" তাহলে টিকিট ঘরের বিক্রীটা হয়ত বাড়ত।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এই ধরনের পরিচালনা নাট্যকারের পক্ষে খুব লাভজনক নয়। আমরা তাই অন্য আদর্শে বিশ্বাসী। যে আদর্শের মাধ্যমে প্রতিটি লোকের কাছ থেকে যা কিছু ভাল সব একত্রিত করে নাট্য-পরিবেশনের সম্পূর্ণতা লাভ করা হয়। যেন এটা একটা বিদ্যালয়। এখানে নানান মত নিয়ে নানা প্রতিভা জড়ো হয়েছেন—যেমন Tony Richardson, Bill Gaskill, John Dexter, Lindsay Anderson প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতের লোক। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই নাট্যকারের প্রতি বিশ্বাসভাজন।

অবশ্য আমি এ-কথা বলব না যে, নাট্যকারের প্রভুত্ব নির্দেশক মেনে নেবেন। সেটা বললে খুব বাড়াবাড়ি করা হয়। নাট্যকার যা লিখেছেন—সেটা মঞ্চে রূপায়িত হ'তে এসে যে অর্থ প্রকাশ করে—নাট্যকার যে ঠিক সেই অর্থে লিখেছেন বলে আমি মনে করি না। নাট্যকার বুঝতেই পারেন না অভিনেতারা প্রত্যেকেই নাটকটা পড়বার চেষ্টা করেন না। যদিও নাটকের লেখা অংশের অর্থ সকলেই বোঝে, তবুও একজনকে অর্থটা আবিষ্কার করে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে হবে আর সকলের সামনে। অবশ্য নাট্যকারের মূলগত ভাবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে। সেই একজনই হচ্ছেন নির্দেশক। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে মূল বক্তব্যকে ঠিক রেখে একই বৃত্তের মধ্যে সকলের চিন্তাধারাকে একত্রিত করা। নাট্যপরিবেশনটা যে অভিনেতাদের নিজস্ব কাজ এটা বোধ করানোর দায়িত্ব কিন্তু নির্দেশকের—কেননা তিনি প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর আর তাদের সঙ্গে থাকছেন না। পাচ বছর আগে এমন একটা সময় ছিল যখন আমি ষ্টার্টফোর্ড, ভিক প্রভৃতি দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তখন নির্দেশকের ওপর অভিনেতাদের প্রচুর আস্থা ছিল। যে সমস্ত চরিত্রে তারা অভিনয় করত, সে সম্বন্ধে সব কিছুই নির্দেশকের কাছ থেকে জানবার আশা তারা রাখত। কিন্তু আমি মনে করি ঐ কাজটা তাদের নিজেদের করা উচিত। বর্তমানে এখানকার অভিনেতাদের আমি সমসময়েই বলি, "তোমাদের কাজ কিন্তু আমি করে দেব না—আমি অবশ্য সম্ভাব্য সকল বিষয়ে সাহায্য করব। আমি চালনা করব, নির্বাচন করে দেব, নাটকের বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেব, এবং চরিত্রগুলির মধ্যে

পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দেব—কারণ আমার সম্যক জ্ঞান আছে। কিন্তু চরিত্রের ভেতরকার মানুষটাকে তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে।" যদি এইভাবে বলা যায়—তবেই অভিনেতারা নিজ নিজ চিন্তাকর্মে মনোযোগী হয়। আমার মনে হয়, অল্পবয়সী অভিনেতারা এইভাবে ভাবতে ভালবাসে। অবশ্য আমি যখন থিয়েটারে ঢুকেছিলাম—তখনকার যুবকদের চেয়েও এখনকার যুবকরা সাধারণভাবে বেশী আগ্রহশীল ও থিয়েটার সম্বন্ধে অনেক খোঁজ রাখে এবং জানেও। আমাদের সময়ে যুবকরা টাকা ছাড়া আর কিছুই জানত না। তাই টাকার অঙ্কে নিজেদের মূল্যায়ণ করাতে এমন অভ্যেস করে ফেলেছিল যে থিয়েটারের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করত প্রাপ্ত টাকার ভিত্তিতে।

যেখানে সেখানে নাটক করে বেড়াচ্ছি এতেই নির্দেশক হওয়ার সার্থকতা নেই। নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা বা দল গঠন করে কাজের অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত। আমাদের প্রকৃতিই তাই করে। নাট্যকার বা অভিনেতার কাছে ঐ ধরনের কাজের আশা করা উচিত নয়। নির্দেশক তৈরী করার কাজই আমি পছন্দ করি। দু'তিনজনকে একসঙ্গে রাখি সহকারী হিসেবে দু'তিন মাসের জন্যে—তারপর একমাস কারখানায় পাঠাই—আর একমাস office-এ রাখি। কেননা তাদের ব্যবসা ও মঞ্চব্যবস্থাও জানতে হবে। আমার মনে হয় অভিনেতা থেকেই নির্দেশক হওয়া ভাল—কারণ তাতে নির্দেশক অভিনেতাদের সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন। কেউ কেউ নির্দেশক হতে চান, এই আশায় যে, নির্দেশক হ'লে সে একজন শ্রেয়তর ব্যক্তি হতে পারবে এবং অনেক কিছু কল্পনা টল্পনার অধিকারী হবেন। কিন্তু আমার মতে সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু কল্পনা আছে। তবে সেই কল্পনাগুলোকে নাট্যপরিবেশনে কাজে লাগানোই আসল কথা। আমি অবশ্য আমার সহকারীদের-সব রকম শিল্প শেখার উৎসাহ দিই। কারণ—কি নাট্যকার, কি নির্দেশক, কি অভিনেতা—আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না। আমি তাদের রঙ্গালয়ের বাইরে অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে বলি। শুধুমাত্র রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত থাকলে চলবে না। সবকিছু ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে হবে—

অনেক পড়াশুনো করতে হবে—কারণ—আমাদের জানতে হবে পৃথিবীতে কি কি ঘটছে।

আমার মনে হয় আমাদের Royal court এর প্রাথমিক সমাচার দেওয়া হয়েছে। এখন সকলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এই প্রশ্ন নিয়ে—"আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী কি?"

এর উত্তর খুব সোজা নয়। কেননা অনেক কিছুই করার আছে, অনেক কিছুই জানার আছে। যেমন প্রথমেই ভাবার আছে রঙ্গগৃহকে আরও কত সুন্দরভাবে নির্মাণ করে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত গড়ে তোলা যায়। আমাদের পুরনো রঙ্গালয়গুলো (কয়েকটি ছাড়া) পুরাতনের ভগ্নাবশেষ রূপে খাড়া হয়ে আছে। বিরাট বিরাট গৃহ—নানারকম পুরনো মূর্তি প্রভৃতি। আজকালকার লোকের কাছে এগুলোর কোনো অর্থ-ই নেই। রঙ্গালয় গৃহ আর ধনীদের গৃহগুলির সঙ্গে যদি কোনো পার্থক্য না থাকে—তাহ'লে বিশেষ অর্থে যেখানে আমার আকর্ষণটা মানুষ হারিয়ে ফেলে। আমার ইচ্ছে সব কিছু ভেঙ্গে নতুনভাবে একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে রঙ্গালয়গুলো তৈরী করা। আমি চাই রঙ্গালয়গৃহটি মুক্ত জায়গায় অনেক বড় করে তৈরী হবে, যাতে করে বেশী লোক সেখানে ধরবে—কম খরচায় অনেক লোক সেখানে যেতে পারবে। তাহ'লে নাট্যশালার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যাবে। আর্থিক দিকটা ভাল হ'লে নাটক নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজও চালানো যাবে। অনেক লোকের কাছে আমরা হাজির হতে পারব নাটক নিয়ে। শ্রমজীবী, ব্যবসাদার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের কর্মীরা—সকলেই আসবে নাটক দেখতে। বর্তমান থিয়েটারে যুবক দর্শকদের অভাব ঘুচে যাবে। এমনকি স্কুলের সঙ্গে আমি সবেমাত্র যোগসাজস করেছি। ভবিষ্যতে বোধহয় ছাত্রদেরও নাটক দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারব।

গত কয়েকটি সপ্তাহে আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্কুল থেকে বয়স্ক ছাত্রেরা শিক্ষক ছাড়া নাট্যমঞ্চে এসেছে—পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে। তাদেরকে অন্যান্য থিয়েটারেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে—মঞ্চশিল্প বোঝানো হয়েছে—স্কুল দেখানো হয়েছে, কারখানা দেখানো হয়েছে—মহলা

দেখানো হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে তারা নাটকের যাবতীয় ব্যাপার বুঝেছে। অনেকে প্রচুর উৎসাহিত হয়েছে—আবার কেউ কেউ বলেছে যে, নাট্যশিল্প সম্বন্ধে তাদের ধারণা পাল্টে গেছে। একজন ছাত্র বলে গেল যে, নাট্যশালা থেকে সে একটা সমাজজীবনের সুন্দর কল্পনা নিয়ে গেল যে কি করে এতগুলো লোক একসঙ্গে একই আদর্শের পেছনে নিজেদের যুক্ত রেখেছে।

কয়েকমাস আগে Helen Weigel এর সঙ্গে এ-নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল। বর্তমানে আমি চেষ্টা করছি একটা করে সপ্তাহ এইভাবে জনসংযোগের জন্যে ব্যবস্থা করব। যদি এক বছরে আমরা অন্তত পাঁচ'শ জন দর্শনপ্রার্থী পাই—তাতেই অনেক কাজ হবে। এখন আমরা ভাবছি, যদি এমন একটা দল করা যায়—যারা স্কুলে স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের বোঝাবে কিভাবে থিয়েটার হয় বা করা যায়। কষ্টসাধ্য হ'লেও এ কাজ আমাদের করতেই হবে। কেন না মধ্যবয়সী দর্শকেরা নাটক দেখতে আসেন যদি নাটক সফলতা লাভ করে। কিন্তু যদি নাটককে জীবনের অংশরূপে ধরা যায়—যদি আলোচনা বা সমালোচনার মাধ্যমে নাটককে সফল সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এই অল্পবয়সী ছাত্রদের মধ্যে এর রস পরিবেশন করতে হবে।

তাহ'লেই অভিনেতা উৎকর্ষ লাভ করবে। যেমন Albert Finney'র কথা ধরা যাক। সে ভাল অভিনেতা গান জানে, নাচ জানে, মূকাভিনয় জানে এবং দৈহিক ক্রীড়ানিপুণ; যদি এই ধরনের কয়েকজনকে তৈরী করতে পার এবং জনপ্রিয় রঙ্গালয়ে তাদের জড়ো করতে পার—বর্তমান অবস্থার সবটাই পাল্টে যাবে। যদিও পরিকল্পনাটা পুরাতন তবুও কি যায় আসে? এটা তো এতদিন করা উচিত ছিল। এখন থেকে শুরু করতেই বা দোষ কি? আমাদের থিয়েটারে যদি সম্ভব হয় একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত করার আয়োজন আমি করছি। যদি টাকার যোগাড় হয়, পার্টটাইম হিসাবে আমি সকলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। যদিও অনেকদিন ধরে এই কল্পনাটা আমার মনে বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু এটার বাস্তবরূপ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি জানি এসব কাজ নির্দেশকের। ১৯৬০ সালে সমস্ত দেশে নাটকের ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন পরীক্ষা হয়েছে এটা অবশ্য অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত।

অবশ্য কতখানি সাফল্যের দিকে এগিয়েছে—সেটা না ভেবে এটা বলা যায় যে ক্ষেত্রটা অনেক বেড়েছে। বর্তমানে অন্তত ভাল নাটক দেখার দর্শকের সংখ্যা বেড়েছে। নাট্যকারও কিছু উৎকর্ষ লাভ করছে—অবশ্য সেটা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। 'Look back in Anger"-এর মতই Jolus Osborneএর "Luther" নাটকটি সাড়া জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস তবে দু'টোর সাড়া জাগানোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। পোষাকের স্বাভাবিকতার মধ্যেও আন্দোলন এসেছে। বর্তমানে নাট্যকারদের ক্ষেত্রটাও অনেক বেড়েছে।

আমেরিকার কোনো এক সভায় আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "Royal court"এ আপনি যে কাজ করেছেন—তার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় কাজটাকে চারটিমাত্র শব্দে বলতে পারেন? Tony Richardsonকে আমি ঠিক সেই প্রশ্নই করেছিলাম। আমরা সত্যি কি কিছু করেছি? তিনি বলেছিলেন, "করেছি—অকৃতকার্যের অধিকারী হয়েছি।" সেই উত্তরই আমি আমেরিকায় দিয়েছিলাম।

'প্লাইস্ টু প্লে'

অনুসরণে

হাসিকান্না হীরাপান্না

মূল রচনা : মর্টন ইক্লিস

অনুসরণে : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। প্রখ্যাতা অভিনেত্রী বিয়াট্রিস লিলিকে রিহার্সাল দেওয়াচ্ছিলেন নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা নোয়েল কাওয়ার্ড। তারই একটা চমৎকার বিবরণ এই রচনার উৎস। সূত্রধার।

অর্কেস্ট্রা আর স্টেজের মাঝখানের এবড়ো খেবড়ো র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে দৌড়ে এলেন নোয়েল কাওয়ার্ড। স্টেজের ওপর প্রখর আলো। চোখ বাঁচাবার জন্যে একটা হাত তুলে ধরলেন উঁচুতে। তারপর জনহীন প্রেক্ষা-গৃহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাঁদিকে বসেছিলেন পিয়ানো-বাজিয়ে। মাঝপথে বাজনা থামিয়ে চুপ করে গেলেন।

স্টেজের ওপর কয়েকটা কাঠের চেয়ার। আর পেছনের দেওয়ালে স্তূপীকৃত কয়েকটা সেট। আটজন আর্টিস্ট ফেনট্রট্ নাচছিলেন। তাঁরা থেমে গিয়ে কাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আরো কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন এই অভিনেতা-নাট্যকার-পরিচালক মানুষটি। তারপর হঠাৎ বোঁ করে একপাক ঘুরে গেলেন পিয়ানো-বাজিয়ের সামনে। তুড়ি মেরে বললেন "পেয়েছি, ঠিক আছে। স্টার্ট কর তো। দেখ, সবাই লক্ষ্য কর।"
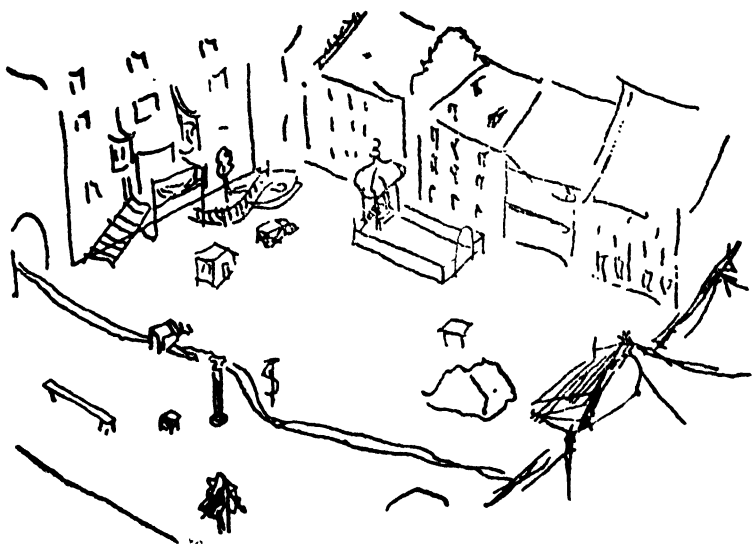
মিস্ট্রি পারফরমেন্স এর একটি মঞ্চায়োজন

নাটকের নাম 'দ্য পার্টি'জ ওভার নাউ' (বাংলায় বলা যেতে পারে 'ভাঙল মিলনমেলা')। তার প্রথম গানের প্রথম চরণে পিয়ানোর সুর ভেঙে পড়ল। কাওয়ার্ডের সারা শরীর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। তিনি কোরাসের ওই আটজন আর্টিস্টকে নির্দেশনা দেবার জন্যে নেচে চললেন। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার। দু'জন দু'জন আর্টিস্টের জন্যে আলাদা আলাদা করে। কাদের জন্যে কখন নাচছেন তা বোঝাবার জন্যে হাত তোলা হচ্ছিল এক একবার। এমনি করে দু'জনের এক একটা দলের জন্যে তিনবার করে। তার মানে তিন চারে বারোবার। তারপর থামলেন। থেমেই বললেন, "এবার আসুন দেখি ভাই, পুরোটা হয়ে যাক একবার দেখি।"

বলেই আবার নিজে শুরু করলেন কোরাসের সঙ্গে। এখন আর তিনি ওদের সঙ্গে সমান তালে নাচছেন না। আস্তে আস্তে প্রায় হাঁটার মত করে মিশে গেছেন দলটাতে। কিন্তু টেম্পো ঠিক আছে, তাল ঠিক আছে, সারা শরীরে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে সেই উদ্দাম তরঙ্গ, চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

সেই আশ্চর্য আবেগ। চারটে দল। একটার সামনে গিয়ে একপ্রস্থ নাচের পরেই তাদের সঙ্গে হাল্কা করে নাচছেন পুরো স্টেজটা; একেবারে উইংস্ অবধি। একটা দলকে সরিয়ে দিয়েই, পড়ছেন আরেকটা দলকে নিয়ে, স্টেজ থেকে তাদের বের করে দেবার সময় কায়দাটা নিজেই ঘুরিয়ে নিচ্ছেন খানিকটা। এমনি করে পুরো দলটা বেরিয়ে গেল উইংস্ দিয়ে, পিয়ানো বেজেই চলেছে, নির্ভুল তালে নেচে চলেছেন কাওয়ার্ড। সে একটা দেখবার জিনিস। কী নিখুঁত, কী অসাধারণ! তিনি হাততালি দিয়ে উঠতেই বাজনাটা থেমে গেল। আর্টিস্টরা স্টেজে ঢুকলেন আবার। পরিচালক ওদের সবাইকে এনট্র্যান্সের গোড়ার জায়গায় নিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে। স্টেজ ম্যানেজারকে ডেকে কী একটা যেন বললেন।

"আরেকবার হয়ে যাক দেখি ভাই"—বাঁদিকে এসে দাঁড়ালেন পরিচালক। হাতের ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন ব্যাণ্ড-লীডার। পিয়ানো বেজে উঠল। দু'জন আর্টিস্ট এগিয়ে এলেন মঞ্চে।

"না, না, থামো থামো। বাজনাটা তো বেতাল হয়ে গেল। শোন, শুনে নাও আবার," বলেই কাওয়ার্ড প্রথম লাইনটা গুন গুন করে উঠলেন। হাত-দু'টো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলেন সামনে। বললেন, "হয়েছে? নাও, এবার দেখা যাক।"

উনি হাত তুলতেই পিয়ানো নতুন উৎসাহে বেজে উঠল আবার। আট-জন আর্টিস্টই একে একে এগিয়ে এলেন। নাচ চলল। এবার আর কোথাও কোনো ছেদ পড়ছে না।

একপাশে পরিচালক দাঁড়িয়ে। পায়ে টোকা মেরে তাল রেখে যাচ্ছেন। গানের তালে তাঁর শরীর দুলছে, হাত দুলছে। মনে হচ্ছে তিনি যেন সবার অজান্তে, নিজের অজান্তে অন্যমনে চলে গেছেন আর এক জগতে। যেই শেষ দু'টো লাইন দু'বার হ'য়ে গেল অমনি তিনি যেন আর এক মানুষ। গট্‌গট্ করে এগিয়ে এলেন স্টেজের মাঝখানে। গান গাওয়ার মত করে নরম মিষ্টি ভারী গলায় যেন খুব স্নেহ করে বললেন "বাঃ, বেশ হয়েছে। এখন পুরো জিনিসটার চেহারা পাওয়া যাচ্ছে খানিকটা। আরেকবার গোড়া থেকে হোক তা'হলে।"

স্টেজ আর অর্কেস্ট্রার মাঝখানের র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে ফিরতে ফিরতে শিস্ দিয়ে উঠলেন একবার। তারপর অডিটোরিয়ামের অন্ধকারে বসেছিলেন বিয়াট্রিস্ লিলি……তাঁর দিকে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন একটা হাসির কথা বলে উঠলেন…মঞ্চের তীব্র আলোতে তাঁর দীর্ঘ চেহারার সিলুয়েট দেখে মনে হ'ল যেন এই একটা মানুষ একাই স্টোকওস্কি আর বেনি গুডম্যানের একটা আশ্চর্য সমন্বয়। তারপর রিহার্সাল চলতে থাকল। বারবার; অজস্রবার। একই রকম করে। মনে হ'ল এর যেন আর শেষ নেই। অথচ সবাই জানে আসল নাটকে এ অংশটা অভিনীত হ'তে লাগবে বড় জোর এক মিনিট কি আরো কম।

মিউজিক বক্স থিয়েটারে এ-রিহার্সাল চলেছিল এক সপ্তাহের মতন। এর মধ্যে প্রায় সবাই পুরো ব্যাপারটাকে আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। এক আধজনের এখনও একটু আধটু গণ্ডগোল রয়েছে। অবিশ্যি এক নাটকটা বিরাট বিপুল কিছু নয়। সব মিলিয়ে আঠারো জন মেয়ে, আট থেকে দশজন ছেলে। তার মধ্যে ছ থেকে আটজনের পার্ট খানিকটা বড়। আর সবচেয়ে বড় পার্ট নায়িকার।

নোয়েল কাওয়ার্ড যখন রিহার্সাল করেন তখন সবাইকে হাজির থাকতে হবেই। বড় পার্ট ছোট পার্ট ভেদ নেই। আমেরিকান স্টেজে এ-ধরনের রিহার্সাল নিতান্তই ব্যতিক্রম। সাধারণত যা হয়, তা হল টুকরো টুকরো রিহার্সাল করে শেষটায় সব এনে জড়ো করে ফেলা। কাওয়ার্ডের কথা হ'ল, "যার যখন পার্ট নেই তাকে তখন বাকী রিহার্সালটা দেখতে হবেই। তা নইলে পুরো বইটার আইডিয়া পাবে কোত্থেকে? হ'লই বা একটা ছোটখাটো প্রোডাকশন—কাওয়ার্ড প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী, প্রতিটি দৃশ্যের জন্যে এমন অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওঁর চেয়ে অনেক ছোটখাটো ডিরেক্টর এর চেয়ে অনেক কম চেষ্টায় বাজীমাৎ করার ফিকির খোঁজেন সব দেশেই।

কাওয়ার্ড একটা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন: আমি নিজে অভিনয় করি আর না-ই করি আমার নামের সঙ্গে যে প্রোডাকশন জড়ানো, তাকে শতকরা একশ

ভাগ নিখুঁত হ'তে হবে। যত জ্ঞানই থাক, যত নাট্যচেতনাই থাক একই জিনিসকে বারবার রিহার্স করতে হবে। এর জন্যে দিন-রাত মানলে চলবে না, খিদে-তেষ্টা -ক্লান্তি মানলে চলবে না। তিনি পুরো ব্যাপারটাকে গোড়াতেই ধাতস্থ করে নিয়েছেন। সব কাজ তাঁর জানা। সব কিছুতেই তাঁর নিজের স্টাইলটা সব সময়েই চেনা যায়। গান, নাচ—ট্যাপ্স থেকে ব্যালে অবধি—সব তাঁর আশ্চর্যরকম আয়ত্বে বাঁধা। এক কুমারী লিলির পার্টটা ছাড়া সব পার্টই তিনি নিজে করে দেখাচ্ছেন। দলের মধ্যে এক অদম্য উৎসাহ আর শিল্পবোধ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন কাওয়ার্ড। সবাইকে নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন। অথচ তাঁর স্বভাবজাত ধৈর্য আর মিষ্টি স্বভাবের ঘাটতি ঘটছে না কোথাও। এত বাঁধাধরা ছকের মধ্যেও কিন্তু তিনি কোথাও কোন শিল্পীর স্বকীয় বৈশিষ্টকে একটুও নষ্ট করছেন না একবারও।

'ভাঙল মিলনমেলা' বইয়ের শিশুশিল্পী দু'জন বাচ্চা ছেলে হিউ ও বাফা এবং মেয়ে পেম্পী গান ধরল "রাতের পালা ফুরালো, ফুরালো আবার ভোরে।" কাওয়ার্ড আবার স্টেজে উঠে এসে ওদের দু'জনের চারপাশে হাল্কা করে ট্যাপ্স নাচ নেচে চললেন, যাতে তালটা কিছুতেই গুলিয়ে না যায়।

"এক মিনিট", সবাইকে থামিয়ে দিয়ে পিয়ানো-বাডিয়ের দিকে ফিরলেন কাওয়াড। বললেন, "অত টানছ কেন? অতটা বিলম্বিত হ'লে তো পুরো ব্যাপারটাই ঝুলে যাবে। আবার বাজাও। আরেকবার শোনা যাক।"

আবার গান শুরু হ'ল। আবার থামিয়ে দিলেন সবাইকে। বললেন, "শোন হিউ, বিং ক্রসবীর স্টাইলে 'হায়রে শেষ প্রহরের গান হায়রে!' গেয়ে সিনটা ডুবিও না বাবা। ওটা হবে—" বলে খুব স্পষ্ট করে জোর দিয়ে গাইলেন, "হায়রে! শেষ প্রহরের গান! হায়রে!' বুঝলে, কী বললাম? প্রত্যেকটা শব্দ কেটে কেটে মানে বুঝে গাইতে হবে। কেমন?"

হিউ গাইল।

"বাঃ বেশ হয়েছে। নাও, আবার গোড়া থেকে ধর। আরেকটা কথা। সবাই একটু মন লাগিয়ে শোনো। গাইবার সময় কথাগুলো যেন জড়িয়ে না যায়। আর যাই হোক শোনাতে হবে তো! যেমন ধর পেম্পী। তুমি

'দিশেহারা' নাটকটাতে যে গানটা গাও 'সে-যদি-জানত-সবই, আমি-বলতাম-না' এটা হবে 'সে যদি জানত সবই আমি বলতাম,'·· থামো···'না', তারপর আরো স্পষ্ট করে, 'সে যদি কাঁদতো পথে—চলতাম না, আমি চলতাম না।' মানে, সব কথা ক-টা শোনানো চাই। আমি বোধ হয় একটু বেশী খুঁত খুঁত করছি। কিন্তু এগুলো যে নেহাৎই জরুরী। ঠিক আছে। তাহ'লে আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাক, কেমন?"

এবার তিনি ওদের সঙ্গে তাল দিয়ে গানটা গাইতে লাগলেন। প্রথমে হিউর সঙ্গে, তারপর পেম্পীর সঙ্গে। তারপর তিনজনেই একসঙ্গে নাচতে লাগলেন। সামনে কাওয়ার্ড নাচছেন। প্রত্যেকটা অঙ্গভঙ্গী একটু বড় করে তালটা একটু জোরে দিয়ে, ঝোঁকগুলো একটু বেশী বেশী করে যাতে ছেলে-মেয়ে দু'টো একেকটা ঠিক মতন ধরতে পারে। বললেন "পেম্পী, তোমরা দু'জন আরেকটু কড়া করে নাচতে চাও কি? 'না, না, আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি পার তো বোধ হয় ভালোই হয়, আরেকটু লাইফ্ পাবে সিনটা।"

কালো স্কার্ট, লাল জামা আর পেছনে ছোট্ট পর্দার ট্রেল দেওয়া সবুজ টুপী পরে স্টেজে ঢুকছেন নায়িকা মিস্ লিলি। তাঁর কিউ এসে গেছে। "ঠিক আছে, চলে এসো ডিকি"—হাত নেড়ে কাওয়ার্ড হিউ আর পেম্পীকে স্টেজ থেকে আস্তে আস্তে সরে যেতে নির্দেশ দিলেন—রিচার্ড হাইড আর একটি মেয়ে এসে অসমাপ্ত গানটির শেষ কলিগুলি আরেকটু চড়া পর্দায় গেয়ে উঠল। "চমৎকার চমৎকার!" কাওয়ার্ড আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। "এবার এসো, লিলি, এসো।"

স্টেজের একপাশে পাশাপাশি দু'টো চেয়ার। তার মাঝখানের ফাঁকটাকে দরজা বলে ধরে নিতে হবে রিহার্সালে। সেই পথ দিয়ে ঢুকলেন মিস্ লিলি। যাঁর বাড়ীতে পার্টি হচ্ছিল তাঁকে বললেন, 'দারুণ দারুণ হয়েছে আজকের সম্মেলন। এই একত্র চেতন, এই মেলামেশা।' তিনিই হচ্ছেন আজকের পার্টির 'প্রথমা ও শেষতমা'। কাওয়ার্ড ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "আরেকটু চটপট কর লিলি। বাজনাটা শুনছ না? তোমার গানের কিউ এসে গেল বলে।" মিস্ লিলি চট করে এগিয়ে এলেন, একবার এদিক তারপর ওদিকে

চোখ বুলিয়ে নিলেন। একবার হাত দু'টো ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর ডেকে উঠলেন 'ট্যাক্সি!' বলেই কী হাসি! ঘুমচোখে ক্লান্ত এক ট্যাক্সি ড্রাইভার পা টেনে টেনে এগিয়ে এল। সে এসে মিস্ লিলির ওপর খিঁচিয়ে উঠল, 'এত চ্যাঁচিয়ে ডাকার কী আছে!' মহিলাটি বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে একটা আশ্চর্য ভঙ্গীতে অল্প হাসলেন, গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠলেন একটা গান—একটা বর্ণনার গঠন। যে মিলনবেলায় তিনি এতকাল বিভোর ছিলেন তার বর্ণনা। নানা দেশের নানা জগতের লোকেরা মিলেছিলেন বাড়ীতে, মনে হচ্ছিল যেন; 'এ এক আশ্চর্য বিস্ময়!'

তারপর অল্প নীরবতা। নায়িকার কাঁধ নেচে উঠল। চোখের পাতা বন্য ঔজ্জ্বল্যে শক্ত হয়ে এলো। সারা দেহে এক হাস্যকর ভঙ্গিমা এলো চকিতে। বললেন:

'মন যেন আদিম ·····জাপান!'

'জাপান' শব্দটা এলো যেন বিস্ময়ের হঠাৎ ঝলমলানিতে, মুহূর্তে সারা শরীর সহজ হয়ে এলো, হি হি করে হেসে উঠলেন মিস্ লিলি। গেয়ে উঠলেন,

'হায় ভালো লাগা ক্ষণগুলি ···

ট্যাক্সি ড্রাইভারের গলা জড়িয়ে মদির ভঙ্গীতে টেনে নিয়ে চললেন স্টেজের বাইরে, হাসতে হাসতে কী যেন বলতে বলতে যখন উইংসের কাছে চলে এসেছেন, তখন সবে একটা হাত তুললেন শূন্যে, কাঁধটা পিছিয়ে এলো, শোনা গেল:

'মনগুলি হায়রে,'···

আড়াচোখে একটু তাকালেন, দর্শকদের দিকে চকিতের জন্যে একটা ভাব-গর্ভ চাউনি। হাতটা নেমে এলো কোমরে।

'স্বপ্ন মিলনমেলা'···

হাত তুলে রকেটের মতো শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন দেহটাকে। একটা দীর্ঘশ্বাসের মত নরম সুরে বেরিয়ে এলো শেষ চরণের ভগ্নাংশটুকু।

'···স্বপ্ন!'

তারপর স্টেজ শূন্য। সৃষ্টির আদিতে মহাকাশের মতো প্রাণ আর গান নিয়ে উন্মত্ত আবেগে শূণ্যতায় কাঁপতে লাগল যেন।

"বাঃ, বেশ হয়েছে লিলি। এবার তাহ'লে আবার গোড়া থেকে হয়ে যাক। দেখা যাক সবাই কিরকম মনে রাখতে পেরেছ, কী বল?" কাওয়ার্ড বললেন। মঞ্চ থেকে নেমে ছুটে চলে গেলেন হলের শেষ প্রান্তে। বললেন, "আচ্ছা ভাই, সবাই একটু কষ্ট করে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে নাচবেন? নইলে মনে হচ্ছে সিনটা পেছনের দিকে হেলে গিয়ে ঝুলছে। একেবারেই কোনো টেম্পো পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝলে, কী বলছি?" এইবার নিজে অর্কেস্ট্রার লীডারের ব্যাটনটা তুলে নিলেন। আবার সিনটা শুরু হ'ল। মনে হ'ল উনি নিজের হাতে ব্যাটন দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সিনটা। পুরো সিনটাতে 'লাইফ' এলো এবার। একটা আত্মিক দোলা অনুভব করা গেল, এবং ছন্দও। এই প্রথম বোধ হয় ঐরকম একটা গানের ঐসব 'সেন্টিমেন্টাল' লাইনের মধ্যে একটা সত্যিকারের সৌন্দর্য অনুভব করা গেল। মাথার ওপর ব্যাটন-তাড়িত হাওয়ায় কাওয়ার্ডের গলা ভেসে এলো, "ব্যস্, ব্যস। সিনটাকে ঠিক টেনে নিয়ে যাও, ঢুলিও না। বাস্, ঠিক আছে। কিন্তু ডিকি..." স্টেজের কাছে ছুটে এলেন আবার, পিয়ানোর কাছে। বললেন, "ডিকি; এটাতো একটা 'ট্র্যাজিক মোমেন্ট'। তোমার 'রিফ্রেন'টা শুনতে দারুণ লাগছে বটে, কিন্তু নাটকের সাথে কোনো যোগ নেই। এটা বরং ছেড়েই দাও, কেমন?" ডিকির মনেও খটকা ছিল, ধরিয়ে দিতেই যেন বাঁচলেন। 'রিফ্রেন'টা বাদ গেল।

এরপর স্টেজপ্রপ্‌স্ দেখতে হবে ডিরেকটারকে। "ড্রেসিং টেব্‌লটাকে আপ্‌স্টেজে রাখতে হবে টনি, আরেকটু কোণ করে। যাতে এর সামনে সামনে লিলি বসলে সবাই যেন ওর মুখটা দেখতে পায়। ঠিক আছে, শুরু কর তাহলে।"...

আবার শুরু হ'ল। নায়িকার তিন প্রণয়ী নায়িকার জন্যে অপেক্ষা করছে ড্রেসিংরুমে। ওরা সবাই নানা মণিমুক্তার হার দুল আর নানান গয়না এনেছে। সেগুলো দেখাচ্ছে নায়িকার ঝিকে।

"আরে, হচ্ছে কী?" হাততালি দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে কাওয়ার্ড

এগিয়ে এলেন। "না, না, না। যা বলছ তার থেকে গলাটা আরো চড়াতে হবে ভাই। ঐ যে ওখানে যারা বসে থাকবেন (ব্যালকণির দিকে আঙুল দেখালেন) ওদের সব শোনাতে হবে তো? আর বোস্টনে অডিটোরিয়াম তো এর চেয়েও বড়। নাও, আবার বল। আরো উঁচু পর্দায় কথা বল, আরও ধারালো করে। একবার বলে দেখ, যদি গণ্ডগোল হয় আমি বলে দেব।

এবার যা হ'ল তার নাম চিৎকার।

"শোন শোন," কাওয়ার্ড ও আবার বলতে লাগলেন, "এটা হচ্ছে ভালো ভাষায় স্বরক্ষেপনের ব্যাপার। এ তো হট্টগোল হচ্ছে। যখন স্টেজে কথা বলতে হবে তখন সাধারণ জীবনে যতটা জোরে কথা বলে থাকি তার চেয়ে উঁচু পর্দায় বলতে হবে। তা বলে চ্যাঁচাতে হবে নাকি? শোন, আমি বলে দেখাচ্ছি।" ..

তিনি বলতে লাগলেন। ঠিক ঐ লাইনগুলোই, যেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। মনে হ'ল না কোথাও গলা চড়ালেন। অথচ শেষতম আসন থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল শব্দগুলো।

"বুঝলে কী বলতে চাইছি? ঠিক আছে?" হাততালি দিয়ে পাশে সরে গেলেন নির্দেশক। সিনটা এগিয়ে চলল। এবার সিনটাতে অনেকটা ধার এলো।

"টেম্পোটা ঝুলিও না ভাই।" কাওয়ার্ডের চিৎকার শোনা গেল। আর উত্তেজিত করতালি—"আর তালটা যেন গুলিয়ে না যায়।"

নেপথ্যে উত্তুঙ্গ কলরবের মধ্যে দিয়ে মিস্ লিলি ঢুকলেন মঞ্চে। বললেন, "দরজা বন্ধ কর, ডেইজি, দরজা···বন্ধ···কর।" এই দুঃসহ কলরব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলেন নায়িকা।

'কী হয়েছে, কী হয়েছে, সোনা?' একজন প্রেমিক প্রশ্ন করলেন।

'না···কিছু না।' নায়িকা উত্তর দিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর ক্লান্ত ক্ষীণ, বেদনাহত। নিদারুণ যন্ত্রণার নির্ভুল ভঙ্গীতে তাঁর সারা শরীর ভেঙে পড়ল চেয়ারে।

"ওয়াণ্ডারফুল! লিলি! তুলনা নেই!"—নির্দেশক চিৎকার করে উঠলেন।

একে একে প্রেমিকেরা তাদের উপহার এগিয়ে দিতে লাগলেন। নায়িকা অভিনীত-আনন্দের অস্ফুট ধ্বনিতে একে একে গ্রহণ করতে লাগলেন সেই সব মৃত রত্নরাজি। সেই মুক্তোর মালা, 'যা আমার মায়ের গলায় শোভিত হয়েছে একদা'। কিন্তু সুখ নেই। একটা মুক্তোকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ঠোঁট দিয়ে চেটে পাশে নামিয়ে রাখলেন নায়িকা। বললেন, 'এটা চমৎকার তো?'

সিনটা এগিয়ে চলল। কখনো নির্দেশককে অনুপ্রাণিত করছেন নায়িকা, কখনো নায়িকাকে উদ্বুদ্ধ করছেন নির্দেশক। শেষটায় যখন অজস্র ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে নায়িকার মুখ নেমে এল বুকে, মনে হ'ল মুখটা সোজা করে তোলবার ক্ষমতাই নেই তার, মনে হ'ল সমগ্র 'জীবনের' ঋণ তাঁকে এই 'জীবন' দিয়েই শোধ দিতে হবে।

তখনও তাঁর একটা হাত রয়ে গিয়েছিল টেবিলে আয়নার পাশে। একজন প্রেমিক মুখ নামিয়ে আনল তার ওপর। আরেকজন এগিয়ে এল।

'দাঁড়াও', নায়িকা বললেন।

'দেখবে?'

নায়িকা পুরো হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বাহুটা দু'লে উঠল। লোকটা মুখ নামিয়ে আনল। সমস্ত হাতটা ধপ্ করে পড়ে গেল টেবিলে।

"চমৎকার।" কাওয়ার্ড চিৎকার করে উঠলেন। ছুটে গেলেন নায়িকার পাশে। প্রেমিকের পার্টটা নিজে করে দেখিয়ে দিলেন, প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কেমন হবে, একেবারে বিশদভাবে।

"তুমি যে ক্রমশ একটা ঠাট্টার পাত্র হয়ে উঠছ, সেটা সম্পর্কে তোমার কোনো বোধই নেই তোমার৹বোঝাতে হবে," প্রেমিকটিকে বললেন, "ঠিক আছে?"

সিনটা চলতে থাকল। এবার মিস লিলি হাতটা ফেলেই সারা শরীরটাকে উল্টোদিকে ঝাঁকিয়ে দিলেন, মনে হ'ল, চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যাবেন বুঝি।

আবার হাত তুলে ধরলেন। তৃতীয় জন এগিয়ে এলেন। এবার নায়িকা শূন্যেই হাতটা রেখে দিলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর যেন হাতটা ভাসতে ভাসতে এসে টেবিলে বসল।

যারা রিহার্সাল দেখছিলেন সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। কাওয়ার্ড বললেন, "বাঃ ভালই হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে লিলি, জায়গাটা একটু বেশী কমিকাল হয়ে যাচ্ছে·· এক কাজ কর, আমি ভাবছিলুম এ রকম যদি করা যায়...তুমি হাতটা তুললে তো? ও হাতেই রয়েছে এক মুঠো মুক্তো···তুমি শূন্য থেকেই মুক্তোগুলো অন্য হাতে ফিরিয়ে নাও · ওদিকে ওর মুখটা নাবুক···আমরা এখানে মিউজিকটা একটু পাল্টে নিচ্ছি কেমন?···অবিশ্যি এ জায়গাটায় এমনিতেই দর্শকেরা খুব হৈ হৈ করে উঠবে, আর উঠলেই তখন একটু বাড়াবাড়ি করার ঝোঁক পেয়ে বসবে তোমাকে, তবু রিহার্সালে যতটা বেঁধে ফেলা যায় ততই ভালো কেমন!"

মিস লিলি যখন তাঁর অসাধারণ ভঙ্গীতে রিহার্সাল করে চলেন, নির্দেশক থেকে শুরু করে সবচেয়ে ছোট্ট পার্টের আর্টিষ্ট পর্যন্ত সবাই যখন তাঁর শৈল্পিক বৈশিষ্টে আশ্চর্য, উদ্দীপ্ত—বারবার করে এক একটা জায়গা রিহার্সালে যখন তাকে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত বা বিষণ্ণ মনে হয় না তখন যে কোনো দর্শকের কাছেই সে এক একক অভিজ্ঞতা। আর্টিষ্টের নিখুঁত সময় জ্ঞান, গতিভঙ্গীতে দৈহিক কুশলতা আর বারবার রিহার্সাল করে সমস্ত বিষয়টা ছকে নেওয়ার মধ্যেই যে নাট্যাভিনয়ের সাফল্য এ-সম্পর্কে যে কেউ নিঃসংশয় হয়ে যাবেন এরকম রিহার্সাল দেখলে।

নাট্যপ্রযোজনার আলোচনা প্রসঙ্গে কাওয়ার্ড তার দলের সবাইকে বলেছেন: মঞ্চের ওপর আর্টিষ্টকে স্বচ্ছন্দগতি মনে হবে তখনই, যখন বারবার বহুবার অসংখ্যবার তিনি একই জিনিস রিহার্স করেছেন। পাশের চরিত্রটির পাশে যেতে হ'লে ক-পা হাঁটতে হবে ঠিক করে নিয়ে যতবার রিহার্সাল হবে ততবারই ঠিক অত পা-ই হাঁটতে হবে। একটা জিনিসকে বারবার রিহার্স করে ছকে বেঁধে না নিয়ে যদি অভিনয় চলতে চলতে ষ্টেজের ওপর কোনো আর্টিষ্ট কিছু বানাতে যান তাহ'লে তা আকস্মিকভাবে ভালো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু

়রাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভালো হ'লে তো ভালোই, কিন্তু যদি
়রাপ হয় তার দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ ঐ আর্টিষ্টের একার ওপর। সে ক্ষেত্রে তাঁর
কানো কৈফিয়ৎ নেই। তিনি কেন রিহার্সালে পুরো জিনিসটাকে বসিয়ে
নন নি?"

'নোয়েল কাওয়ার্ড রিহার্সেস বিয়াচিত্রে লিলি
ফ্রম সেট টু নিউলিন'
অনুসরণে

মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চস্থাপত্য

চতুর্থ পর্ব ॥

মঞ্চ ও দৃশ্যপট, দৃশ্য ও তার তাৎপর্য, মঞ্চস্থপতির মঞ্চসজ্জা, গর্ডন ক্রেগ : মঞ্চবিপ্লব, মঞ্চে আলোক সম্পাতের ক্রিয়াকাণ্ড
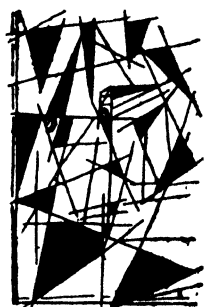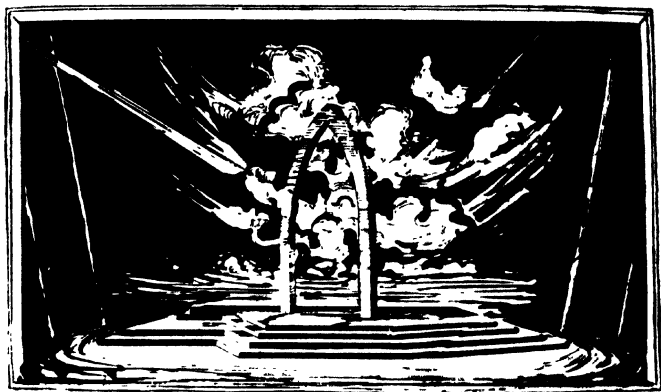
২৭টি বিভিন্ন কোণ থেকে আলোক সম্পাতে অভিনব মঞ্চমায়ার সৃষ্টি

রবার্ট এডমণ্ড জোনস অঙ্কিত 'ম্যাকবেথ' নাটকের একটি দৃশ্যের স্কেচ।

এডল্ফ্ আপিয়া অঙ্কিত ওয়েগনারের একটি নাটকের এক দৃশ্যের একটি স্কেচ
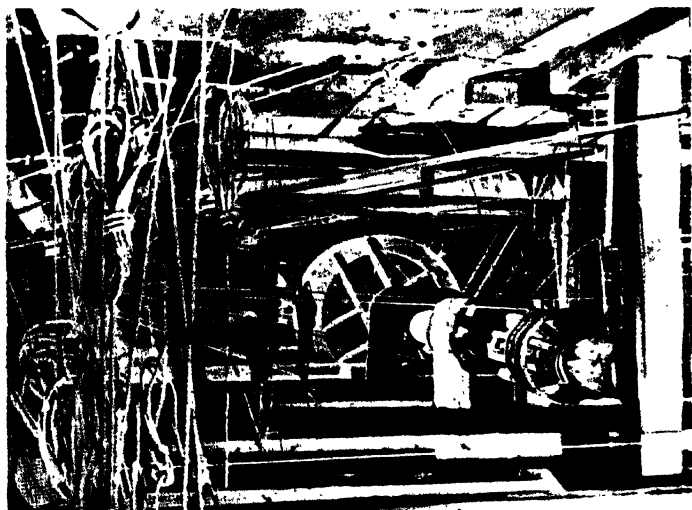
১৭৬৬ সালের মঞ্চের ভেতরকার যাবতীয় যন্ত্রের জড়াজড়ি।

মঞ্চ ও দৃশ্যপট

মূল রচনা : রিচার্ড পিলব্রাউ

অনুসরণে : সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

নাটক দৃশ্যকাব্য। মঞ্চ নাটকের আত্মা, দৃশ্যপট নাটকের ভাষা। মঞ্চ আত্মাকে ধারণ করে আছে আর দৃশ্যপট ভাষাকে প্রকাশ করছে। ভাব হচ্ছে এর নাট্যবস্তু। বাইরের এই আত্মা ও ভাষা এবং ভিতরের এই ভাব-সম্পদ নিয়েই সমগ্র নাট্যচেতনার জন্ম। বিবর্তন ও আবর্তনের মধ্য দিয়ে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ অতিক্রম করে আজ ১৯৬৫ সালেও নাট্যচেতনার পদসঞ্চার নব নব উদ্ভাবনী সৃষ্টির জন্য কখনও উন্মুখ আবার কখনও বা বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তবু এর বিরাম নেই। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এই পদসঞ্চার 'আপনাকে' প্রকাশ করেছে। খাত বদল হয়েছে, ধারার ধ্বনিও বদলে গিয়েছে। রঙ এক নেই যেমন তেমনি রেখাতেও গরমিল। এই বিচিত্র পথগামী নাট্য-প্রযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চ ও দৃশ্যপটের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা রিচার্ড পিলব্রাও-এর Stages and scenery প্রবন্ধের আলোকে আজকের এই বিচারের অবতারণা।

আজকের প্রযোজনা, অভিনয়, পরিচালনা, মঞ্চ, অঙ্গ স্থাপনা এবং সর্বোপরি নাটকের উপস্থাপনার মধ্যেও চাকচিক্য আছে, অভিনবত্ব আছে, কিন্তু একের

সঙ্গে অপরের মিল নেই। প্রত্যেকটির চিন্তাধারা, বৈশিষ্ট্য ও সামগ্রিক উপস্থাপনার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু ঐক্য নেই। ছত্রভঙ্গ জনতার মত যে যার জগতের মধ্যে সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আঙ্গিকে, অভিনয়ে, নাট্যপরিচালনায়, মঞ্চস্থাপত্যে এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন জনতার ভূমিকা গ্রহণ করেও এরা দর্শক-সমুদ্র থেকে প্রশংসার মুক্তো পাচ্ছে। কিন্তু এর কোনো ঐকতান নেই। নেই কোনো harmony—যে harmony'র মধ্য থেকে আজকের দর্শকসমাজ একটি 'unity'কে খুঁজে পাবে। কারণ "unity stands where unification meets"—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নাট্যচেতনার মধ্যে আজ এই 'unification' নেই। যার জন্য জনতার মুখ চিনতে পারা যায়, কিন্তু চরিত্র চিনতে পারা যায় না।

রিচার্ড পিলব্রাও মনে করেন যে আজকের এই আধুনিকতম প্রচেষ্টার মধ্যেও মঞ্চমুগ্ধ মন অতীত-মুক্ত হ'তে পারে নি। নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয়ের দ্রুত পদক্ষেপের মধ্যে ভাল ও মন্দের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে দর্শককুল এক দুর্বোধ্যতার সম্মুখীন হয়েছে। যদি প্রত্যহ কোনো মানুষকে নব নব আস্বাদনের জন্য নতুন নতুন মিষ্টান্ন বিতরণ করা যায়, তাহলে গ্রহীতা বিস্মিত হবে সন্দেহ নেই কিন্তু মিষ্টান্নের ভালমন্দের মান নির্ণয়ে সে অপারগ হবে। তাই আজ "নতুন" আর "অভিনব" সম্পদ অত্যুজ্জ্বল স্পট লাইটের মত আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে গ্রহণ করছি।

মঞ্চ স্থপতির সমস্যা :

মঞ্চস্থপতির সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে রিচার্ড পিলব্রাও বৃটেনের কথা আলোচনা করেছেন। আজও নাকি বৃটেনে এমন একটিও মঞ্চ নেই, যা আধুনিকতম যন্ত্রের দ্বারা নির্মিত একটি সুন্দর মঞ্চ বা থিয়েটার রূপে পরিগণিত হ'তে পারে। বৃটেনের আধুনিক মঞ্চগুলির সাজ-সরঞ্জাম অতীতাশ্রয়ী ও প্রাচীন, বিগত একশ বছরের মধ্যেও কোনো নতুন এবং নব আঙ্গিকসম্পন্ন প্লে-হাউস তৈরী হয় নি। কয়েকটির কথা বাদ দিয়ে বলা চলে,

১৯২০ সালের পর থেকে যে সব মঞ্চ বৃটেনে নির্মিত হয়েছে সেগুলি পূর্বের তুলনায় অপটু ও অসম্পূর্ণ।

স্ট্রাটফোর্ডের সেই সুবিখ্যাত শেকসপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটারের নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ ত্রুটি ছিল। সেটি হ'ল এর ওয়াগন স্টেজ। অর্থাৎ মঞ্চের দৃশ্যপট-গুলো ওয়াগনের দ্বারা বহন করা হত। কিন্তু সেদিন এই ত্রুটি খুব বড় করে দেখা দেয় নি, যা আজ দেখা দিয়েছে। মঞ্চকে পটু ও দক্ষ হ'তে হ'লে সাজসরঞ্জামকেও আধুনিক করে তুলতে হবে। সুদক্ষ নাবিকের অভিনয়, জীর্ণ জাহাজের মধ্যে ফুটে উঠতে পারে না। জাহাজের জীর্ণতাই সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দেয়; নাবিক নয়। ১৯৩০ সালের আধুনিকতা নিশ্চয়ই ১৯৬০ সালের আধুনিকতা হ'তে পারে না। যদি হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে ১৯৩০ এর আধুনিকতা যেখানে ছিল ১৯৬০ এর আধুনিকতা স্থবির হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বৃটেনের মঞ্চগুলোতে এই স্থবিরত্ব আজও বড়ো হয়ে রয়েছে।
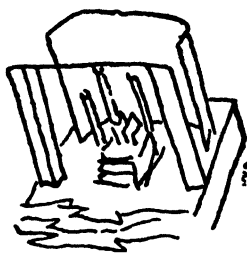
কেম্ব্রিজ ফেষ্টিভাল থিয়েটার দৃশ্য সজ্জার ২টি ডায়াগ্রাম স্কেচ

লণ্ডনের আধুনিকতম পেশাদারী Royal থিয়েটারেও এই স্থবিরত্ব আজও বাসা বেঁধে আছে। অতএব অভিনব প্রযোজনা, নতুন নাট্যপরিচালনা, অভিনয়, আঙ্গিক তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন মঞ্চের দেহাভ্যন্তরের অস্থি মেদ মজ্জা, রক্ত-সঞ্চালন আধুনিক প্রবাহে বাহিত হবে। কারণ মঞ্চের নবীনতা ও নাটকের আধুনিকতা বহুলপরি নির্ভরশীল মঞ্চস্থপতির ওপর। মঞ্চস্থাপত্যে যদি আধুনিকতার প্রাণসঞ্চার না হ'ল তা হ'লে নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয়কলার ওপর বর্তমানোপযোগী অঙ্গরাগ কিরূপে সম্ভব হবে?

মঞ্চের রূপ :

মঞ্চের রূপাস্তিতির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। আকৃতিগত

ভাবে এগুলো মুক্ত, অথবা গোল কিংবা ত্রিকোণবিশিষ্ট অথবা সাধারণ মঞ্চ বা একাধিক মঞ্চ বিশিষ্টও হ'তে পারে। মঞ্চের আকৃতিতে মতভেদ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মঞ্চ, নাট্যবস্তুর খোরাক জোগাতে কোনোরূপ কার্পণ্য করবে না। আমাদের রন্ধনশালা কেমন হবে তা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন—আহার্য খাদ্যবস্তু ভালভাবে রান্না হ'লেই আমরা সন্তুষ্ট হ'তে পারি। মঞ্চ প্রয়োগকলার সেই অভিনয় রন্ধনশালা। যেখানে দর্শক-চিত্তের আহার প্রস্তুত হবে। সেই আহার্যে দর্শকের আস্বাদ পরিতৃপ্ত হবে।

প্রথমতঃ মঞ্চকে অভিনয়োপযোগী হতে হবে। এবং মঞ্চ যাতে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটি আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি দর্শক যেখানেই আসন গ্রহণ করুন না কেন তাঁরা যেন ভালভাবে দেখতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ অনেক নাটক ভাল হলেও প্রশংসা লাভ করতে পারে না। তাই নাটকের ধ্বনি, তাল তরঙ্গ, নানা শব্দ যেন প্রতিটি দর্শক শুনতে পায়, তার প্রতি সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সর্বোপরি মঞ্চকে প্রশস্ত, বাস্তবানুগ এবং নিপুণ হ'তে হবে।

আজ মঞ্চস্থাপত্যে ও মঞ্চ রূপাকৃতির ক্ষেত্রে মঞ্চকর্মীদের মধ্যে এক নব প্রচেষ্টার আশ্বাস ও ইচ্ছা দানা বেঁধে উঠেছে। এই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার নেপথ্যে যে অভিনব ইঙ্গিত আছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পদসঞ্চার যদি নবপ্রয়াসী হয়, ইচ্ছা যদি নতুন সৃষ্টির জন্য অদম্য হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে মঞ্চকর্মীদের আঙ্গিক-কর্ম যে শিল্পজ্ঞনোচিত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে হবে।

আঙ্গিকগতভাবে মঞ্চপ্রয়োগকলায় অতীতচারী হ'য়ে লাভ নেই। বিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে মঞ্চ-প্রয়োগের ভাষাকে আজকের ভাষা করতে হবে। এই শতাব্দীরও কিছু দেবার আছে—এবং বিংশ শতাব্দীর দর্শককুল নিশ্চয় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর মঞ্চের খোরাক চাইবে না। বিশ শতকের মঞ্চের নিকট তারও কিছু নেবার আছে।

আর মঞ্চেরও কিছু দেবার আছে। আজ এই যুগে দর্শক ও মঞ্চের মধ্যে সেই wide scope টুকুকে সচল ও প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন।

লুই জুভেত্ অঙ্কিত একটি স্টেজ ড্রইং

ধরা যাক দু'শত বছরের কোনো এক বর্ষীয়ান ব্যক্তি দু'শো বছর আগের একটি নাটকে না য় ক-না য়ি কা র উদ্যানের দৃশ্যে যে বৃক্ষ যে পুষ্প দেখেছিল আজ এতদিন পরে সেই জীবিত ব্যক্তিটিকে ঐ একই নাটক দেখাতে গেলে সে হয়তো তৃপ্ত হ'তে পারে কিন্তু তার জিজ্ঞাসা কিছু থাকবে। দেহগতভাবে মানুষটি বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু দু'শত বছর ধরে তার নাট্য চেতনাটিকে আমরাই মৃত, স্থবির করে দেব, যদি না কিছু নতুন সৃষ্টি করতে পারি। বিংশ শতাব্দীর মঞ্চ সেই নতুন উদ্যান সৃষ্টি করবে। যদি না করতে পারে তা হ'লে আমরা আমাদের আগামী যুগের জন্য কোনো মঞ্চ কারুকৃতি রেখে যেতে পারব না?
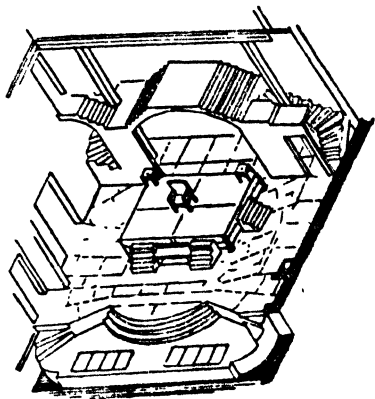
দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে মঞ্চ যে একটি প্রত্যক্ষ সেতু রচনা করে এ-কথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য। অতএব এই সত্যকে কেন্দ্রস্থ করে মঞ্চপ্রয়োগ আপনাকে প্রকাশিত করবে। মঞ্চের কোন রূপটি প্রয়োগনৈপুণ্যে সার্থকতর হয়ে দর্শককুলের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে তা বড় সমস্যা নয়। সমস্যা, কিভাবে মঞ্চ দর্শকসমাজের সঙ্গে অভিনেতা তথা সমগ্র নাটকের নিগূঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারবে।

এই মনঃসংযোগকে অক্ষুন্ন রাখতে সে মঞ্চ "Picture frame" অথবা "multiform" হ'লেও হ'তে পারে। শেষোক্ত থিয়েটারের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। এবং এতে মঞ্চের ব্যয় বহুল পরিমাণে

বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা হয়ত জীবন ও মানের দিক দিয়ে ব্যয়হীনতার পরিচয় দেব। আজকের জীবন ও শিল্পকে উৎকৃষ্ট মঞ্চস্থাপত্যে উপস্থাপিত করতে গিয়ে কপর্দকহীন হলে চলবে না। জরাজীর্ণ পাকশালায় শতাধিক ব্যক্তির রন্ধনের আয়োজন করতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতামাত্র।

মঞ্চ নাট্যকারের যজ্ঞশালা। সেই যজ্ঞশালার প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে নাট্যকারকে নাটক প্রস্তুত করতে হয়। মঞ্চ যে কোনো রূপাকৃতি নিয়েই গঠিত হোক না কেন, পূর্বের মত মঞ্চের আধুনিকতম রূপ নাট্যকারের সৃষ্টির পথে যেন কোনো প্রকার অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

ইদানীংকালের বার্লিন International Theatre-এর মঞ্চশিল্পী Micheal St. Denis এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হয়ত আগামী কালে এমন সময় আসবে, যেদিন এমন একটি মুক্ত রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবে যার দর্শক অভিনেতার মধ্যে আর কোনো ব্যবধান থাকবে না। নাট্যগৃহের দেওয়াল বলেও আর কিছু থাকবে না। গৃহ এবং মঞ্চ এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। শুধু আলোকসম্পাতের দ্বারা দর্শক গৃহ এবং অভিনেতার গৃহ চিহ্নিত হবে। "Arena" থিয়েটার স্বল্পব্যয়ে গঠিত হ'তে পারে। যেখানে অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য থাকবে না। ১৯৬০ সালে এই "arena" থিয়েটার বৃটেনে একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু "proscenium arch" থিয়েটার অতিরিক্ত ব্যয়বহুল। মঞ্চনির্মাণের ক্ষেত্রে জার্মানী ও বৃটেনে ব্যয়ের অঙ্কের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

নাট্য-আঙ্গিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক Walter Murnh স্বয়ংসম্পূর্ণ মঞ্চ নির্মাণের জন্য একটি নিখুঁত ও সুবিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এই নিপুণ পরিকল্পনার মধ্যে অধ্যাপক Murnh দেখিয়েছেন যে, মঞ্চের কারুশিল্পীরা কিভাবে কাজ করবে। মঞ্চের আলো ও যন্ত্রের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং মঞ্চের মধ্যে অভিনেতার গতিবিধি, দৃশ্যপট সংস্থাপনা ও দর্শককুলের আসন কিরূপে নির্দ্ধারিত হবে তাও তিনি তাঁর পরিকল্পনায় সুন্দরভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মঞ্চের কারুকর্ম :

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডে এবং বিশেষ করে জার্মানীতে মঞ্চ কারুকর্মের নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। ইংলণ্ডে বর্তমানে মঞ্চ কারুকৃতির মধ্যে যে সাফল্য আসছে তার মধ্যে নবীনতার প্রাধান্যই
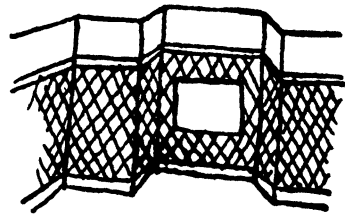
একটি দৃশ্যের একাংশের স্কেচ

সর্বাধিক। এই নব্য মঞ্চ কারুকৃতির জন্য যাঁরা মুখ্যত প্রধান তাঁদের মধ্যে Motleys, Leslie Hurry, Pemberton, Hutchinson Scott হলেন প্রধানতম। এঁদের দৃশ্য-অঙ্কনের মধ্যে যে মহতী সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, রিচার্ড পিলব্রাও তাঁকে অভিনন্দিত না করে পারেন নি।

সাম্প্রতিককালের ইংলণ্ড মঞ্চ-কারুকৃতির মধ্যে নবতর আঙ্গিক, অভিনব উপাদান এবং ইঙ্গিতময়তাকে প্রধান উপজীব্য করে তুলেছে। দৃশ্যপটের চিত্রময়তার অতি বাস্তবতার পরিবর্তে এই ইঙ্গিতময়তার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে একটি "উজ্জ্বল ভাবীকাল"কে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দ্বিতীয়তঃ দৃশ্য সংস্থাপনার মধ্যে কোনো সম্পদকে দর্শকের নিকট স্পষ্টতর করে তুলবার জন্য সামগ্রিক রূপারূপের পরিবর্তে, ক্ষুদ্র আংশিকের মধ্যে সেই সামগ্রিককে বাঁধবার প্রচেষ্টা, মঞ্চজগতের আর এক শুভসূচনা। আমাদের সেই হিন্দুদর্শনের কথা "ভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন"—"Part of a whole"—কিংবা 'fragment'এর ভেতর থেকে যদি সেই পরিপূর্ণ রূপকল্প দর্শকের চেতনায় চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে যায়, তাহ'লে মঞ্চস্থাপত্যের এক সুদূর-প্রসারী সাফল্য ধ্বনিত হয়।

তৃতীয়তঃ একদিকে দৃশ্য প্রয়োগনৈপুণ্যে যেমন Symbolism-এর দ্বারা দর্শকসমাজের হৃদয়রাজ্যে নাটককে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি দৃশ্য চিত্রকল্পের মধ্যে যে রূপতান্ত্রিকতার সৃষ্টি হচ্ছে তা দর্শকের কাছে 'abstract' বলে বোধ হচ্ছে। এটা দৃশ্য-যোজনার একটি কাব্যগত বৈশিষ্ট্য। দৃশ্যের রূপজ দর্শন, ভাবজ দর্শনে পরিণত হয়েছে। 'Art

of vality' অথবা 'Art of poetry'র জগতে abstraction' যেখানে মানুষের আত্মাকে বিমুগ্ধ করে, একা করে ভাবায়, সেখানে 'abstraction'এর নাম 'দুর্বোধ্যতা'—হায়, তাকে 'দুর্গমতা' বলা যেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য এবং চিত্রে এই 'দুর্গমতা' একটি দর্শনের দিক। আজ মঞ্চকলায় সেই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। এই দুর্গম "abstraction"-এর মধ্যে দর্শকবৃন্দের অনুসন্ধিৎসা, অনুভাবনা, কৌতূহল, চিন্তার তরঙ্গস্রোতে স্নান করে আত্মমগ্ন হতে চলেছে। অধ্যাত্মবোধের দিকে, ভাবমুগ্ধতার দিকে দর্শকের ইন্দ্রিয়শক্তি যাতে সমাহিত হ'তে পারে ইদানীংকালের মঞ্চকারুকর্ম সেই ব্রত পালনে অঙ্গীকৃত।

এই প্রসঙ্গে "A man for all seasons" (Motley) কিংবা "The Duchess of Malfi (Leslie Hurry) অথবা "Oliver "নাটকের মঞ্চস্থপতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংলণ্ডে ইদানীংকালে কাঠ, কাপড় বা সিল্কের কাপড অথবা 'চিত্র-রেখাহীন' একরঙ বস্ত্রের দ্বারা নাটকের দৃশ্যপট রচনা করা হচ্ছে। আর এই জাতীয় সামান্য দৃশ্যপটকে অসামান্য, গভীর, রহস্যময় এবং অনুসন্ধানী করে তুলেছে সাম্প্রতিককালের আলোকসম্পাত। নির্বাক মৌন নাটকের দৃশ্যপটকে জীবনময় ও ভাষাময় করে তুলেছে আলোর বিচিত্র প্রতিফলন। নাটকের ভাষাকে সঞ্জীবিত ক'রে আলো দর্শকের মানসে 'নিবৃত্তি' পরিবেশন করছে। এই নিবৃত্তি অনুসন্ধান এবং জিজ্ঞাসার। প্রশ্নের এবং কৌতূহলের।

দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রের বদলে শুধুমাত্র টেলিভিসনের back projection screen এর অনুসরণে নাটকের পটকে আরও পটিয়সী করা যেতে পারে। অথবা মসৃণ কাচময় কিংবা এ্যালুমিনিয়ম বা ইস্পাতের পাতলা পাতের দ্বারাও দৃশ্যপট রচনা করা যেতে পারে। সম্প্রতি জার্মানীতে সুচিত্রিত fibre glare এর সাহায্যে দৃশ্যপট রচনা করার আর এক মহতী প্রয়াস দেখা দিয়েছে। উপরন্তু একে transparent করে fibre glare-এর দৃশ্য-চিত্রকে এমন আঙ্গিকে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে সামনে থেকে বা সামনে পেছনে

এর উপর অতি সহজেই আলোর প্রতিফলন সহজতর হয়। আমেরিকাতে একজাতীয় মিশ্রিত রাসায়নিক ধাতু-পদার্থের দ্বারা মঞ্চের দৃশ্যচিত্র রচিত হচ্ছে।

মঞ্চস্থাপত্যে আলোর ভূমিকা:

অন্ধকার গুহাগিরি, সুবিস্তৃত পর্বতের পটভূমি, সবুজ শ্যামল প্রান্তদেশ অথবা নদী-নির্ঝর বা সুবিশাল সমুদ্রকে আলো যেমন তাদের রূপায়ণ ঘটায়, মঞ্চের স্থপতিতে আলোর প্রতিফলন, তেমনি নাট্যচেতনার রূপায়ণ ঘটায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে নানা যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে মঞ্চের জীবনে আলোর ভূমিকা আরও গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠেছে।

মঞ্চে আলোক সম্পাতের কেন্দ্রীকরণ নাটকের আর এক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়।

আমেরিকার মঞ্চ-কারুকর্মীগণ নাটকের আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশনামা পেশ করেছেন।

প্রথমতঃ সমগ্র মঞ্চকে প্রতিফলিত না করে বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য সম্পদগুলির উপর আলোক প্রতিফলিত করতে হবে। নাটকের পাত্রপাত্রী-গণ এই বিশেষ সম্পদগুলির মধ্যে প্রধানতম। নাটক ও মঞ্চকৃতি যদি দ্রষ্টব্য না হতে পারে তাহ'লে নাটকের আবেদন অনেক কমে যাবে। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাট্যচেতনাকে আরও গভীরতর ও ব্যাপক করে তুলতে আলো অপেক্ষা অনেক সময় অস্পষ্ট ছায়ান্ধকারেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ আলোকসম্পাত মঞ্চসম্পদকে যেমন একদিকে পরিস্ফুট করে তোলে, তেমনি অন্যদিকে সেই সম্পদকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তাকে আকৃতি দান করে। যেমন পরিবর্তনকালে চন্দ্রের আত্মপ্রকাশ।

তৃতীয়তঃ আলোর বিচিত্র প্রতিফলনের দ্বারা মঞ্চের রূপ ও চিত্রময়তার সৃষ্টি। আলো রেখাঙ্কে নানা রঙের বিচ্ছুরিত রূপ মঞ্চকে গৌরবান্বিত করে তুলতে পারে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপ এমন কি প্রতিটি নিশ্বাস-গ্রহণকে

আলো বাঙ্‌ময় করে দর্শকের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারে। অভিনেতার সুচিন্তিত অভিনয়, শিল্পদক্ষতাকে আলোকসম্পাত যেমন সত্যতর করতে সাহায্য করে, তেমনি মঞ্চ প্রয়োগকলাকেও আলো বিচিত্র রঙের পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে তার অভিব্যক্তিকে আরও দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করে তুলতে পারে।

আলোকসম্পাতের যান্ত্রিকতা :

সাম্প্রতিককালের নাট্য ও মঞ্চশিল্পে আলোকের জন্যে নিখুঁত "control board"—প্রয়োজন।

এই 'control board' হচ্ছে আলো বিস্তারণের রাজধানী। আগে মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র এই 'control board'-এ নিযুক্ত থাকত। কিন্তু আজ ছাত্রসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হয়েছে তেমনি অতিরিক্ত মানুষেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই "dimmer" চালনা এবং "control board" পরিচালনার প্রসঙ্গে রিচার্ড পিলব্রাও কয়েকটি মন্তব্য করেছেন :

প্রথমতঃ নাটকের আলোকসম্পাতের ইলেকট্রিক সাজিগুলি এমনভাবে সুগ্রথিত থাকবে যাতে এক থেকে তিনশটি সাজিকে সুস্পষ্ট এবং দ্রুত উপায়ে চালনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ প্রচণ্ড আলোর দাবি মেটাতে গিয়ে যদি আলোক-কর্মীর শক্তি ও দক্ষতা আয়ত্বাধীন হয়ে পড়ে তা হ'লে সেটা নাটকের পক্ষে হানিকর হবে। বিপুল ভোজের আয়োজন করে সংখ্যাতীতভাবে লোক খাওয়াতে গিয়ে পাচক যদি আপনার সামর্থ্যের প্রান্তদেশে এসে পড়ে তা হ'লে ভোজ ও ভোজন মাঠে মারা যাবে।

তৃতীয়তঃ আলোকশিল্পী এমন এক উৎকেন্দ্র থেকে তার আলো নৈপুণ্যকে পরিচালিত করবেন, যাতে তিনি সমগ্র নাট্যবস্তু ও মঞ্চস্থপতির প্রাণ সম্পদটিকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

চতুর্থতঃ নাট্য মহড়ার সময় আলোকসম্পাত এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ

করবে যাতে অতি সহজেই এবং স্বল্পায়াসে সেই নাট্যবস্তুর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধিত হয়ে যায়।

মঞ্চের যন্ত্রশিল্প :

আজকের যন্ত্র মঞ্চকে শিল্পত্ব দান করছে। মঞ্চের শিল্পময়তা তাই অনেক অনেকখানি যন্ত্রনির্ভরশীল। যন্ত্র যেখানে মঞ্চের শিল্প এবং সুষমা সেইখানেই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। "Machinery is the intellect of stage"—যন্ত্র আজকের মঞ্চের বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু যদি যন্ত্রও নাট্যশিল্পের মধ্যে খাদ্য-খাদক-সম্পর্ক এনে ফেলে, তা হ'লে নাট্যশিল্প শরাহত পক্ষীর মতন তার গান ও ভাষাকে হারিয়ে ফেলবে। নাট্যসম্পদরূপী সেই অনুপম পক্ষীকে যন্ত্র যদি খাঁচায় আবদ্ধ করে ফেলে, তা হ'লে খাঁচা বাঁচতে পারে কিন্তু শিল্প বাঁচতে পারে না। যন্ত্রশিল্প বন্দী করবে না, মঞ্চ ও নাটককে অসীম আনন্দলোকের পথে মুক্তি দেবে।

মঞ্চের যন্ত্রশিল্প প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্যকে সাধিত করে।

প্রথমতঃ মঞ্চে এক নবতর মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে যখন "Oliver" অথবা "Cinderella" অভিনীত হয় তখন দর্শককুল বিমুগ্ধভাবে নাটক আলোচনা করেন।

দ্বিতীয়তঃ ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ার দ্বারা দ্রুত মঞ্চদৃশ্যের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। ঝুলুনো দৃশ্য-পট অথবা পূর্বের সেই "wagon stage"-এর পরিবর্তে এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নাটককে সৌন্দর্যদান করতে পারে।

সর্বোপরি আধুনিকতম মঞ্চস্থাপত্যে "multi form theatre" একটি অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মঞ্চ-দর্শকের সম্পর্ক, নাট্যগৃহের আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই "multi form theatre" যে প্রভূত অগ্রগতির নজির স্থাপন করেছে, তা অবিসংবাদিতভাবে প্রশংসার যোগ্য।

বৃটেন অপেক্ষা জার্মানীর মঞ্চশিল্পে যন্ত্রময়তার যে অগ্রগতি ঘোষিত হয়েছে, তাতে জার্মানীর রঙ্গমঞ্চে একটি সপ্তাহে ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন নাট্য প্রযোজনা আজ আর অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। জার্মানীর নাট্যগৃহগুলি

দ্বিমঞ্চ ও একগৃহ বিশিষ্ট। দ্বৈত মঞ্চকে এক একটি নাট্যগৃহ তার একই অঙ্গে ধারণ করে আছে। তাই এই আঙ্গিক ও ভঙ্গিমা নাট্যজগতের শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ভূমিকার অবতারণা করে। একই গৃহে দ্বি-মঞ্চ বিশিষ্ট রঙ্গশালায় জার্মানীর মঞ্চকর্মীগণ এমনভাবে কাজ করেন যাতে তাঁরা নাট্যপরিচালকের মানসটি এবং তাঁর মানসের অভীপ্সাটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। জার্মানীর এই দ্বি-মঞ্চ বিশিষ্ট নাট্যশালা হয়তো নতুন নাটক সৃষ্টি করতে পারে নি, কিন্তু এই নবতর প্লে হাউসগুলি আধুনিক যন্ত্রের দ্বারা এমনভাবে সুসজ্জিত যে, অতি সহজেই দর্শকবৃন্দ এই জাতীয় মঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই পশ্চিম জার্মানীর এই সকল মঞ্চগুলিতে দর্শক সংখ্যার গড় শতকরা ৯৮ ভাগ। আজ জার্মান সরকার যেভাবে এই মঞ্চশিল্পের অগ্রগতির জন্য অকৃপণ, বৃটেনের রঙ্গমঞ্চগুলিতে সেইরূপ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নেই।

নাটক যেখানে জনজীবনের দৈনন্দিন সহচর, জনমানসের উপর যেখানে নাটকের এক অপরিহার্য প্রভাব, সেখানে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ যদি উপেক্ষিত ও অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে থাকে, তা হ'লে দেশ ও জাতির পক্ষে এটা এক লজ্জার কারণ হবে।

'স্টেজেস এ্যাণ্ড সিনারী'
অনুসরণে

দৃশ্য ও তার তাৎপর্য

মূল রচনা : আরভিং পিচেল
অনুসরণে : ছন্দা ভট্টাচার্য

একটা বিশেষ গোষ্ঠীক চরিত্রের হৃদয় ও আত্মার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নাটককে দেখতে চেয়েছেন আরভিং পিচেল আমিও দেখতে চাই। সত্যিকারের নাটকের গৌরব সেখানেই যেখানে তার অঙ্গসৌন্দর্যের চেয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত সত্যের মূল্য বেশী। ঠিক সেইভাবেই নাটক তার স্বাভাবিক স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে—সময় ও স্থানকে বিশেষের অতিরিক্ত নির্বিশেষ করে তুলবে। মানবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপলব্ধি কেবল প্রচ্ছদের উপর অঙ্কিত কতগুলি দৃশ্যের আঁচড়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না।

বর্তমানে নাটকের মঞ্চ-নির্দেশনার পদ্ধতি অনেক সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের যা অপ্রত্যক্ষ, সেই বিরাট সত্যের দিকটি তা গথিক সৌন্দর্যই হোক, জাতির নবজাগরণই হোক কিংবা আকাশ ছোঁয়া অসীমের সংকেত-বহই হোক—নাটকের অন্তর্নিহিত অনির্দিষ্ট সত্যটিকে আমরা স্পষ্টভাবে চাই।

আজকাল প্রচুর নাটকই তো লেখা হচ্ছে। গ্রীসের ক্লাসিক-সাহিত্য, ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের-সাহিত্য, ফ্রান্স, জার্মান, আমেরিকা জাপানের এবং বিভিন্ন দেশের বড় সাহিত্যই সে মূল বিন্দুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত

হ'চ্ছে। কিন্তু তাদের বোঝানো উচিত যে, মঞ্চসজ্জা বা দৃশ্যসজ্জা কেবল এক অন্ধকারময় পটভূমিকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠুক না কেন তাতে দর্শকদের কিছু
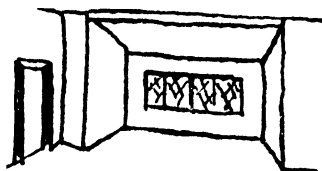
একটি দৃশ্যের একাংশের স্কেচ

এসে যায় না। মানুষ অনন্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকুক—বিভিন্ন চরিত্রের মুখপাত্র হ'য়ে সে একাই দাঁড়াক মঞ্চের ওপর—বৃত্তের চারপাশে থাক অসংখ্য দর্শক ; কিন্তু বৃত্তের মধ্যবর্তী বিন্দু অর্থাৎ নাটকের মানবিক আবেদনের দিকেই সকলের যেন দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে।

প্রযোজক হিসেবে আমি একটা নাটকের বিষয়বস্তুকে নাট্যকারের অন্তরের আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই ভাবি। এবং তারই প্রকাশ কালিতে, কলমে, কাগজে এবং সর্বশেষে অভিনেতা, দৃশ্য, আলোকসজ্জা, শব্দ সংযোজনার দ্বারা দর্শকের কাছে সেই আলোড়নকে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে দেখি। আমি যদি এইভাবে অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের মনের সংযোগের সেতুবন্ধন করতে পারি, তবেই খুশী হ'তাম। দৃশ্য দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের উপর—সেই ফুটপাথের উপর দিয়েই চলতে হবে আমাদের উড়বার ইচ্ছা থাকলেও। কিন্তু দর্শকের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের মনের ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে একাত্ম ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেই হ'বে আমাদের।
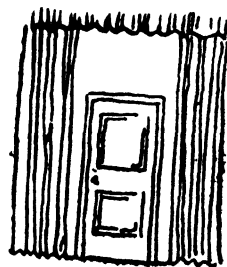
মঞ্চে পর্দা ব্যবহারের একটি স্কেচ

নাটকে আমরা শুধু দৃশ্যকেই দেখবো না—দৃশ্যকে নাটকের একটা প্রধান অঙ্গ মনে করব। নাটকের তাগিদেই দৃশ্য আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নাটকের মহড়ার সঙ্গেই আমাদের সে দৃশ্য কল্পনার সাহায্যে
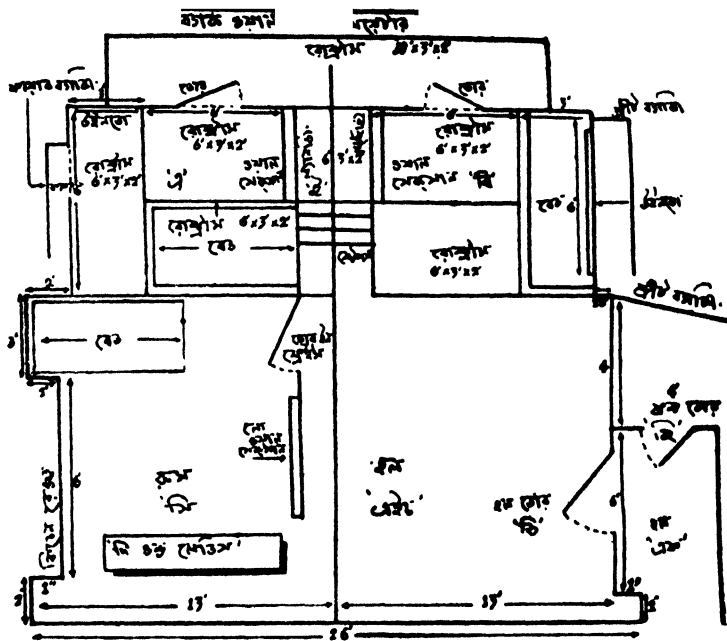
গ'ড়ে তুলতে হ'বে। নাটকই আমাদের কাছে প্রধান, দৃশ্য তার অনুগামী— তাই নাটকের প্রায় দুই সপ্তাহ ব্যাপী মহড়ার পর আমরা নাটকের চাহিদা অনুযায়ী মঞ্চ সংস্থাপনার নির্দেশ দেব। নির্মিত একটি দৃশ্য আমাদের সামনে খাড়া করা থাকবে। কোনো শিল্পীকে প্রথমে দৃশ্যটির একটি রঙীন স্কেচ তৈরী ক'রতে বলবো, তা সম্ভব না হ'লে একটা অসন্তোষজনক দৃশ্যের আলোকচিত্রই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। এইভাবে আমাদের মঞ্চ নির্দেশনা, আলোকসজ্জা, রঙীন চিত্রপট ও চরিত্রের মানবিকতার সঙ্গে একাকার হ'য়ে তা সার্থক হ'য়ে উঠবে।

'সিন এণ্ড এ্যাকসন'
অনুসরণে

মঞ্চস্থপতির মঞ্চসজ্জা

মূল রচনা : ডোনাল্ড ম্যাকলিন্ড
অনুসরণে : চারু খান

আমাদের আজকের নাট্যভাবনায় সমগ্র অংশ জুড়ে যে প্রভাব ছড়িয়ে যদিও আমাদের অতীত ঐতিহ্য তাঁর গভীর ব্যাপ্তি ও অনন্য শিল্প সুষমায় মণ্ডিত তথাপি আমরা সেই কালজয়ী শিল্পশৈলীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে বর্তমান সমাজ মানসের পরিপ্রেক্ষিতে সেই শিল্পচিন্তাকে উজ্জীবিত করতে পারি নি।

এদেশের নাট্যচিন্তায় ইয়োরোপীয় ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। কি নাটক, অভিনয়, প্রয়োগ কৌশল বা সঙ্গীত আলোক সর্বত্রই। নাট্য আন্দোলন, অনুশীলন তা পেশাদার, অপেশাদার, পরীক্ষামূলক যাই হোক না কেন তবুও আজকাল নাট্যচর্চার জোয়ার ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বাংলা-দেশের দুকূল প্লাবিত করে চলেছে। এসময়ে যদি কেউ নাটকের প্রয়োগ-শৈলী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তবে স্বভাবতই ইয়োরোপীয় নাট্য প্রযোজনার কথাই মনে হয়। এখন ওদেশের নাটকে মঞ্চস্থাপত্য ও আলোকসম্পাত পদ্ধতি যে উচ্চ মানের আসন গ্রহণ করেছে তার একটু পরম্পরাগত আলোচনা করা দরকার।
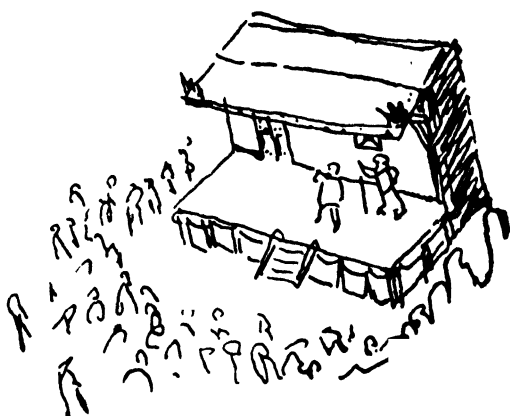
গ্রীসের 'মাইম' স্টেজ

সেই কোন সুদূর অতীতে খৃষ্টতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত নাটক অভিনয়েরও আগে, যখন শুধুমাত্র প্রমোদ উপকরণ হিসেবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ত, সেই সময় উৎসব-প্রাঙ্গন-সজ্জায় যে শিল্পদৃষ্টি অংশ গ্রহণ করেছিল তার ক্রমবিবর্তন-মান গতি আধুনিক মঞ্চরূপায়ন পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে।

কোন যুদ্ধ বা বীরত্বের পরিচয় জ্ঞাপক এই রক্তক্ষয়ী অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যেই সেদিন ভবিষ্যতকালের মঞ্চকলার উৎকর্ষের বীজ গুপ্ত ছিল। দীর্ঘকাল এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রান্তে আপন আড়ম্বর ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে এই ধরনের প্রতিযোগিতাস্থল রাজন্যবর্গের আনুকূল্য ও অর্থ ব্যয়ে একদিন মঞ্চের উৎকর্ষতায় স্থান লাভ করল।

এই রক্তক্ষয়ী প্রমোদ-অনুষ্ঠানে রাজা প্রথম রিচার্ডের মৃত্যুর পর এ ধরনের অনুষ্ঠানে যবনিকা ঘটেছিল। আইনগতরূপে নিষিদ্ধ হ'ল এই টুর্নামেণ্ট। কিন্তু এই রক্তক্ষয়ী বীভৎসতার মধ্য থেকে সভ্য মানুষ তার সুকুমার রূপটিকেই বেছে নিতে পারল।

এবার শুরু হ'ল গীর্জার অভিনয়। খৃষ্টধর্মের যাজকগণ নিয়ন্ত্রিত ঊর্ধ্বতন ধর্মীয় পুরুষ ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় চার্চ থিয়েটারে, গীর্জায় বা গীর্জা

সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রভু খৃষ্টের জীবন বা দর্শন প্রচারমূলক নাটকের অভিনয় করতে আরম্ভ করেছিলেন।

অতীতের সেই টুর্নামেণ্ট থেকে গৃহীত বিচিত্র রঙ-বেরঙের কাপড় ও ঝালর সুশোভিত অঙ্গন এখানে রূপ নিয়েছিল প্রসেনিয়াম আর্চ ও রঙীন পর্দা-শোভিত রঙ্গালয়ে। নাটকের প্রযোজকরা তখন এর উৎকর্ষতার জন্যে মঞ্চের কাজে কারিগর বা কলাকুশলী নিয়োগ করতে শুরু করেন।

এইভাবে দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হ'ল। ইয়োরোপের দিকে দিকে তখন অবিশ্রান্ত নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এই মধ্যযুগে জন্ম নিয়েছিল এলিজাবেথিয়ান ও জাকোবিয়ান থিয়েটার। এই সকল মঞ্চে অভিনীত নাটকে তখনও সেই অতীতের কাহিনী, রাজকীয় মাহাত্ম্য, রাজন্যবর্গের উপাখ্যান বিধৃত হত। কিন্তু নাট্য প্রয়োগে শুধুমাত্র কারিগরেরাই অংশ নিলেন না; এলেন দক্ষ চিত্রকরেরাও। এবার নাটক অভিনয়ে দেখা গেল চিত্রিত পশ্চাৎপট। দর্শক আসনের সামনে রয়েছে সেই পুরনো যুগের প্রসেনিয়াম আর্চ, রঙীন ঝালর ইত্যাদি। কিন্তু এযে কল্পনাতীত! নাটকে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে মিল রেখে দর্শকের সামনে মেলে ধরা এই স্থায়ী বাস্তব দৃশ্যপট, যেন নাটকের শোভা বহুদূর ব্যাপ্ত করেছে। রসিক দর্শকগণ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

প্রতিটি নাটকেই থাকত একটি করে পশ্চাতের দৃশ্যপট। অপরিবর্তিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

এইরূপ বিচিত্র মঞ্চসজ্জায় মধ্যযুগের নাট্যচর্চা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চললো। মধ্যযুগের এই রত্নময় দিনগুলিতে যখন নাট্যকলার অবিশ্রান্ত চর্চা চলছে, তখন আনুমানিক ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম সাধারণের জন্য স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল তখন পথ নাটকের অভিনয়, মুক্তাঙ্গন মঞ্চ প্রভৃতি। নাটকের প্রযোজনায় ক্রমশঃ একটি বিশেষ আসন অধিকার করতে লাগল বাস্তব দৃশ্য, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি। বিভিন্ন মঞ্চের এবং অভিনয় দলের প্রযোজকেরা চিত্রকরের আশ্রয়ে নাট্যপ্রযোজনার বাস্তব পটভূমি নির্মাণের প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

দেশ থেকে দেশান্তরে তখন বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে সংস্কৃতিরও আদান-প্রদান চলছিল। রেনেসাঁযুগের খ্যাতকীর্তি শিল্পীরাও তখন মঞ্চের প্রভাবকে কিছুতেই এড়িয়ে উঠতে পারেন নি।
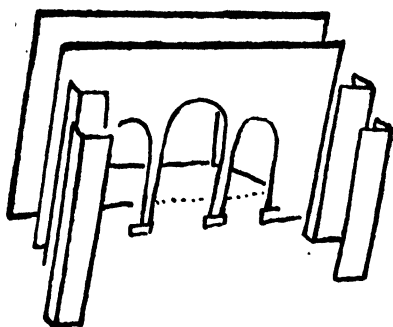
দি স্কারলেট পিমপার্নেল, দ্বিতীয় অঙ্কের সেটিং ডায়াগ্রাম

ক্রমে নাটকে অঙ্কিত দৃশ্যপট ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্থাপত্য কর্ম, চিত্রিত রঙিন কাচের কাজ, ভাস্কর্য, রকমারী পর্দা, নানাভাবে নাটকে সংযোজিত হ'তে থাকল। এই সঙ্গে পট পরিবর্তন প্রথার প্রচলনও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই যে আজকের দ্বিমাত্রিক পশ্চাতপটের মাধ্যমে যে বাস্তব দৃশ্যের মায়া-ময়তা সৃষ্টি হয় এরও সূত্রপাত ঘটেছিল সেদিনেরই মঞ্চে। বেন জনসন তার সহকারী ইয়াগো জোনসকে সঙ্গে নিয়ে সেই ষোড়শ শতকের মঞ্চে নাট্য-প্রযোজনায় স্বল্পালোকিত গ্যাস ও মোমের আলোয় আজকের রূঢ় বাস্তবতাকে মঞ্চে কল্পনার পশ্চাতপট হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র।

এরপর কত যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে এসেছি আমরা। পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে কত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, রাজনৈতিক আলোড়ন। কিন্তু মঞ্চ তার আপন গতিতে নিরন্তর বয়ে চলেছে আপন প্রাণ প্রবাহে সে থামে না, থামবে না।

বাইরের জগতের উত্থান-পতন মানব সমাজকে অচঞ্চল রাখতে পারে নি। শিল্পীসত্তা বারে বারে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিল্পচেতনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিচিত্র সব শিল্পশৈলী।

রেনেসাঁ যুগ থেকে আরম্ভ করে অধুনা বিমূর্ত রচনাশৈলী পর্যন্ত যে সামগ্রিক পরীক্ষানিরীক্ষার পালা চলছে, এর স্পর্শ মঞ্চও এড়িয়ে যেতে পারে নি। ফরাসী দেশের চিত্রশিল্পের ভাঙা-গড়ার চর্চায় যে সব মতবাদ

জন্ম নেয় সেই ধারা মঞ্চে প্রত্যক্ষ করবার মানসে মঞ্চে অভিনীত নাটকের শিল্পনির্দেশকরা অতীতের চিত্রিত পশ্চাৎপট, বাস্তব দৃশ্যসমন্বিত সেট ইত্যাদি বর্জন করে সমকালীন নাটকের প্রযোজনায় ব্যবহার করলেন সাদা, কালো বা যে কোনো একটিমাত্র রংএর পশ্চাৎপট। কেবলমাত্র আলোকরশ্মির সাহায্যে বিচিত্র বর্ণময় প্যাটার্ন রচনা করে নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মুড সৃষ্টি করতে লাগলেন। এই ব্যবস্থায় সবাই যে খুশী হলেন তা নয়। তবে সমগ্র মঞ্চজগৎ জুড়ে একটা সাড়া পড়ে গেল।

নাটকের প্রযোজনায় আধুনিক চিত্রচর্চায় যে সকল পরীক্ষা ঘটে থাকে সেই সব রীতি মঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় পরিস্ফুট হ'ল। বিভিন্ন শিল্পশৈলীর চিত্রকরেরা তাঁদের চিন্তা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন নাটকে ব্যবহার করলেন এই সব শিল্পশৈলী। মঞ্চেও দেখা গেল বিচিত্র সব বিমূর্তবাদ।

মঞ্চে অভিনীত নাটকে প্রত্যক্ষ করা গেল একসপ্রেসনইজম, ফডইজম, কিউবিজম ইত্যাদি প্রথায় চিত্রিত দৃশ্যপট বা বিমূর্ত প্রথায় নির্মিত সেট।

আধুনিক যুগের নাটক আধুনিক মঞ্চসজ্জায় কখনও নিরাভরণ কখনও বা সেই আদিম যুগের কল্পনা থেকে আহরণ করা বিরুদ্ধ সব রঙের সমাবেশেও গভীর ঘন রেখায় প্রোজ্জ্বল।

অবিশ্রান্ত আমাদের কল্পনা ছুটে চলেছে নতুনকে আবিষ্কারের নেশায়। আমাদের কল্পনায় আমরা নিজেরাই বিস্মিত হয়েছি। সমগ্র জীবনকে, কঠিন বাস্তবতাকে আমরা মঞ্চে প্রত্যক্ষ করেও তৃপ্তি পাই নি। নিরন্তর আমরা তবু ছুটে চলেছি।

এই পৃথিবীর মঞ্চে এসেছেন অনেক মহান নাট্যকার, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, স্থপতি, ভাস্কর, কারুশিল্পী, অনেক স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যাপ্ত, সঙ্কুচিত অনেক ভাবনাই আমরা মঞ্চের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেছি। সত্য, অর্ধ-সত্য, বিকৃত নেতৃত্ব, অপার নাট্যচিন্তা দ্বিধা দ্বন্দ্ব পেরিয়ে আজও আমরা ছুটে চলেছি তবু অমৃতময় রূপলোকের সন্ধানে। এই জীবন যতদিন আছে, জগৎ যতদিন আছে ততদিনই আমাদের ছুটতে হবে। কারণ শিল্পের কখনও শেষ বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না।

'দি ডিজাইনার সেট্স দি স্টেজ'
অনুসরণে

গর্ডন ক্রেগ: মঞ্চবিপ্লব

মূল রচনা: শেল্ডন চিনি

অনুসরণে: বরুণ দাশগুপ্ত

এক যুগের বিপ্লবী পরবর্তী যুগে বিশিষ্ট নাগরিক রূপে চিহ্নিত হন, হয়ে থাকেন—কারণ ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের মত তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকে। গর্ডন ক্রেগও পশ্চিমী মঞ্চজগতের এমনই এক বিপ্লবী নাম।

বর্তমানকালের অনেকে একথা মনে করতে পারেন যে, কুড়ি বছর আগে পশ্চিমী মঞ্চের প্রয়োগকলা-ক্ষেত্রে Craig যে তীব্র বিপ্লবের কথা বলেছিলেন, তা থেকে অনেক বিচ্যুতি ঘটেছে। হয়তো বা। আবার এমনও তো কত হয়েছে যে, কখনও কখনও ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদেরও কথার বিচ্যুতি ঘটে গেছে—কারণ মাঝে মাঝে গোটা পৃথিবীটাই এঁদের ইচ্ছার বিপরীতে চলেছে, আবার কখনও বা বক্তা নিজে উদার এবং বাস্তব মনোভাব নিয়ে পার্থিব গতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। ঠিক অনুরূপভাবে অনেক ছোটখাট নাট্যবিপ্লবী তাদের সংগ্রামী জীবনে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে Paris Opera এবং Odean-এর নির্দেশক Jacques এবং Gemier এর নাম স্মরণযোগ্য কিন্তু Gordon Craig-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কোনোরকমের আপোষের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে নি।

কুড়ি বছর আগে Craig-এর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে যদিও অনেক নাট্যরসিকই উন্মাদের প্রলাপ বলে অভিহিত করতেন—আজ কিন্তু স্রোত অন্যদিকে বইছে। আজকের দিনের যে সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও নাট্যকার নিজেদের প্রগতিশীল বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন—তাঁদের অনেকেই Craig এর সেই চিন্তাধারাকে বহুলাংশে গ্রহণ করেছেন, যদিও এঁরা প্রায়ই বলে থাকেন Craig কিন্তু বাস্তবধর্মী ছিলেন না। বর্তমান নাট্যকারেরা তাঁদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকার করছেন যে বিশ বছর আগের লেখা এবং চিন্তাধারা আজ তাদের প্রভাবিত করছে এবং অগ্রগতির পথ দেখাচ্ছে। তাঁরা একথাও বলেন যে স্থিত অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনকে অস্বীকার করে Craig সব সময়েই একটা চমকপ্রদ নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে চাইতেন।

যে নির্দেশক আপোষ করতে নারাজ—প্রচলিত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে জানে না—তাকে স্বভাবতই দূরে দূরে একাকী থাকতে হয়। সে কারণে তাঁকে বহিরাগত নির্দেশক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একথা প্রায় প্রবাদের মত প্রচলিত হয়ে আসছিল যে আধুনিক নাট্যজগতে একজন আপোষহীন সংগ্রামী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং আত্মবিশ্বাসী শিল্পী হিসাবে Craig ধীরে ধীরে বিশিষ্ট বহিরাগত নির্দেশক হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছিলেন। এবং তাঁর এই চিন্তাধারা, এই মনোভাব এতো দৃঢ় ছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর নিজের দেশীয় থিয়েটার থেকে নির্বাসন নিয়ে বহিরাগত সমালোচকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়—এই বিপ্লবাত্মক মনোভাব তাঁর জীবনে বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্য নিয়ে এলো। তিনি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মত জীবন এবং জীবন-শিল্পের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়লেন।

Gordon Craig সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা দিন দিন এতো বেড়ে যাচ্ছিল এবং এই আলোচনা শেল্ডন চ্যিনিকে এতোই উৎসুক করে তুলেছিল যে শেষ পর্যন্ত একদিন নিজের চোখেই তাঁকে দেখতে যেতে হ'ল—কি সেই শিল্প! কি সেই প্রয়োগরীতি!—যাচাই করে দেখতে হবে। Broadway-এর কাছে সেই কুহেলিকাচ্ছন্ন Gordon Craig-এর বৈপ্লবিক চিন্তাদর্শে বিশ্বাসী Max

Reinhardt-এর মত আগন্তুক নির্দেশক এবং Robert Edmond Jones ও Norman Bel Geddes-এর মত স্থানীয় পটশিল্পী এবং Lee Simonson ও Woodman Thompson-এর মত মঞ্চ পরিকল্পক—Craig-এর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে চমকপ্রদ শিল্পসৃষ্টি করলেন, তাতে চিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :
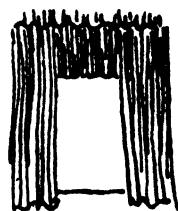
মঞ্চে পর্দা ব্যবহারের একটি স্কেচ

ইটালীর শেষ বসন্তের একদিন যখন আমি Via della Costa di-Sevvetto-এর চিত্রালী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলাম তখন আমি একথা কখনও ভাবতে পারি নি,—বরং ভাবছিলাম Piazza Ferrari থেকে যে trolly car-এ করে এখানে এসেছি তার কথা—ইটালীর পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটের কথা ইত্যাদি। হঠাৎ আমি দেখবার আগেই সিঁড়ি পথে আমাকে দেখেই Gordon Craig ছুটে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। সেই Gordon Craig -পাঁচবছর আগে যাকে Amsterdam Exhibitionএ শেষ দেখি। চুলে এখন আরও পাক ধরেছে—কিন্তু সেই একই লম্বা চওড়া মানুষটি, ছবির মত পরিচ্ছন্ন, মাথায় সেই কালো টুপি—লম্বা লম্বা অবিন্যস্ত সাদাটে চুল যাতে পুরোটা ঢাকা পড়ে না, দৃঢ়চেতা—আর দশজনের মধ্যে সহজেই যাকে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়।

Craig আমাকে আসতে লিখেছিলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচঘণ্টার উপর আলোচনা হ'ল—Broadway Theatreএ আমি কি করছি, George Tean Nathanকে ইদানীং দেখেছি কিনা, Californiaয় নতুন কি হচ্ছে, Stark Young কি ধরনের মানুষ, আমি Hollywoodএ কখনও গেছি কিনা—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন Craig আমাকে করলেন এবং আমিও নানারকম প্রশ্ন তাঁকে করেছিলাম।

আগের দিনে বহির্বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ছিল না—তাই Moscow এবং Sanfransisco-এর মধ্যে অভিনয়ে অভিনবত্বের কথাও

লোকের জানা ছিল না। এবং সেই কারণেই বাস্তব নাট্যজগতে সম্যক নেতৃত্বের কথাও কেউ চিন্তা করেন নি। Craig তাঁর গৃহে এমন একটি Theatre Library করেছিলেন সেখানে যে কোনো নির্দেশক বা শিল্প-পরিকল্পক সবরকম জ্ঞানপিপাসা মেটাতে পারতেন। Craig-এর ছেলে Teddy এ ব্যাপারে তাঁর সুযোগ্য সহকারী—এবং প্রতিভাসম্পন্ন সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

আমি Craigকে এমন অবস্থায় দেখেছি যাকে New York, London, Berlin ও Moscow-এর ভাষায় বলা হয়—"retrest"। কিন্তু আসলে মানুষটি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের থিয়েটারে এতো সজীব, নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এতো ওয়াকিবহাল, কাজে এতো উৎসাহী—ঠিক গত বিশবছর ধরে তিনি যেমনটি ছিলেন। Copenhagen-এর Royal Theatreএ তখন Ibsen-এর The Pietenlers অভিনয় হচ্ছিল। শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন Craig। সে সময়ে আমি তাঁকে সমস্ত শিল্পীবৃন্দের সঙ্গে মিলেমিশে আলাপ আলোচনান্তে খুশী হতে দেখেছি—খুশী হতে দেখেছি এজন্যে যে Craig সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে সত্যিকারের সহযোগিতার মনোভাব এবং বিশেষ করে সকলের মধ্যেই দায়িত্বশীলতার ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। চিনি নিজের অভিজ্ঞতা, থেকে একথা লিখেছেন।

নিঃসর্তে আর্থিক সাহায্য এবং সহযোগিতা পেলে Craig তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ধরনের নাট্যশালা গড়ে তুলবেন একথা যেমন বলতেন, তেমনি যাঁরা তাঁর প্রতিভাকে দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে আসছিল, তাদের কথাও সচরাচরই উল্লেখ করতে ভুলতেন না। যারা কেবলমাত্র বাণিজ্যিক সুবিধাদির জন্য নাটকের বিষয়কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতেন তাদের প্রতি Craig কটাক্ষ করতে কখনই ছাড়েন নি এবং তাঁর চিন্তাধারায় এধরনের compromise-এর কোনো অবকাশই ছিল না। কিন্তু Robert Edmond Jones এর মত ব্যক্তি যিনি বড় বড় খ্যাতনামা ব্যবসায়ী থিয়েটারে শিল্পনির্দেশনা থেকে শুরু করে নাট্য পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন তিনিও Craigকে কখনও অবজ্ঞাকারী বা ছিদ্রান্বেষী

ভাবেন নি। বাস্তবিকপক্ষে শিল্পজগতের প্রতি এই প্রতিভাময় শিল্পীর মনোভাবে যদি কোথায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায়—যদি তাঁর মূলগত বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার কিছুমাত্র কমতি কোথাও থেকে থাকে তা হচ্ছে তাঁর দীর্ঘ বিবেচনাবোধে, বক্তব্যের অতি নির্ভুলতায় এবং নিশ্চিত কর্তৃত্ববোধে পুরাতনের প্রতি Craig কিছু কম উৎসাহী ছিলেন না।—তিনি সব সময়ই পুরাতনের খোঁজ করতেন—যেখান থেকে নতুনেরা কিছু শিখতে পারে। সহনশীলতা ছিল তাঁর বড় গুণ।

গর্ডন ক্রেগ অঙ্কিত নিজস্ব প্রতিকৃতি

১৯০৫ সালে 'নাটকের শিল্পকলা' সম্বন্ধে তাঁর প্রথম এবং সর্বজনগ্রহনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি দীর্ঘ দশবছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে তাঁর অভিনয়, প্রযোজনা এবং শিল্পনির্দেশনা জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। ঠিক এই সময়েই শিল্পনির্দেশক হিসাবে Craigএর পরিচিতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে—তিনি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করতে শুরু করেন। একঘেয়ে মঞ্চসজ্জা দেখে দেখে ক্লান্ত দর্শক নাট্যজগতের অস্তমিত আকাশে এক নতুন আলোর সন্ধান পান। নাট্যজগতের এই নব শিল্পায়ন, এই নবরূপ শতকরা প্রায় নিরানব্বইজন দর্শককে আনন্দ দেয়। তাঁর লেখাগুলিও নতুন স্বাদের—সহজ সরল কথায় রচিত এবং গতানুগতিকতার জগৎ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। একদিকে তাঁর আঁকা পশ্চাদপট শিল্পাদি যেমন খুব quiet এবং delicate ধরনের, তেমনি আবার অন্যদিকে তাঁর লেখাগুলিও সতেজ, তথ্যপূর্ণ এবং উত্তেজনাপূর্ণও বটে। বাস্তবিকপক্ষে ২০ বছরের মধ্যে Craig-এর লেখা গ্রন্থগুলি এবং তাঁর নিজস্ব ম্যাগাজিন "The Mask" পড়ে মনে হয় যেন একটা অদ্ভুত গতিবেগসম্পন্ন চেতনা দ্বারা পরিচালিত! প্রত্যেক পাঠকই এগুলি পড়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান—সত্যই Compromise এবং hypocricyকে ধিক্কার দেন—Constructive theatre work হোক এই প্রত্যাশা করেন। কিন্তু Craig সব

সময়েই বলতেন—এই পরিবর্তন হঠাৎ আনা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন—সর্বাধ্যক্ষের প্রতি আজ্ঞাবহী মনোভাব, সম্যক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধৈর্যশীল অধ্যাবসায়—পুরনো মঞ্চের পিছনের পর্দা পাল্টে বা Stylistically কোনো নাটকের মঞ্চায়ন করে নয়।

Craig-এর অত্যন্ত সজীব ও উত্তেজনাপূর্ণ তথ্যের কথা বলতে গেলে যে কেউ বুঝতে পারবেন কেন মঞ্চায়নে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন ধারনার আলো দ্রুততালে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই পুরাতন যুগে Craig নিজেই অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু তার অনেকগুলিই সকল দিক থেকেই আদর্শ প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে নি। তবুও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে বিচার করলে অতি সহজে অনুধাবন করা যেত যে থিয়েটারে স্বাভাবিকতা সবেমাত্র প্রবেশ করছে। মঞ্চসজ্জা আমূল পরিবর্তিত হয়ে সরল; সহজ শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল। পৃথিবীব্যাপি সমালোচকেরা একই সুরে বলতে শুরু করলেন যে Craig-এর যদি কিছু অবদান থাকে তা হচ্ছে নতুন ধাঁচের মঞ্চসজ্জা। থিয়েটারের প্রগতির ব্যাপারে Germany তাঁর কাছ থেকে যা লাভ করেছে—তা অঙ্ক কষে বলা যায় না। আমেরিকাতেও ১৯১২ সন থেকে নাট্যকার, মঞ্চ ও নাট্য-নির্দেশকগণ—যাঁরা Craig-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনাকে গ্রহণ করেছেন—তাঁরাই মঞ্চস্থাপত্যে পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু আজ এটা সত্য যে আমরা তাঁর আদর্শের অর্দ্ধেকটাই গ্রহণ করেছি, নাটকে তাঁর ভাবধারার একটা অংশই প্রয়োগ করেছি। সেজন্যই আমাদের মঞ্চশিল্পীরা এক বছরের মধ্যেই নতুন কাজে হাত দিতে পারে না। কিন্তু Craig বিশ্বাস করেন যে নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত—তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু করলেন।

নবনাট্যে যাঁদেরই কিছু অবদান আছে Craig নির্দ্বিধায় তাঁদের কথা বলেন। Duncaes Yvette Guilbert, Adolphe Appia, Bakst, Roller ইত্যাদি শিল্পীর কথা, Stanislavski, Reinhardt, Jssuer, Antoine, Dantcheuko প্রভৃতি পরিচালকের কথা, Copean, Pitoeff, Gemiser এবং Russian Ballet এর প্রচলক প্রভৃতির কথা সগর্বে তিনি

প্রকাশ করেন। Professionalদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হ'লে তিনি উৎসাহ বোধ করেন। কারণ তাঁর যা কিছু শিক্ষা ও পরিকল্পনার উৎস ব্যবসায়ী মঞ্চ থেকে তাঁর অনেক কল্পনার ছবি আমরা দেখেছি ঐ পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি বলতেন যে সুসংবদ্ধ মঞ্চ-পরিকল্পনা থেকেই অভিনেতা সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। তাঁর কথাবার্তায়, "The Mask" এর লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বারবার এই কথাই বলেছেন যে, স্থায়ী পুরাতন ব্যবসায়ী মঞ্চ থেকেই অভিনেতা সম্পূর্ণতা লাভ করবে তার শিক্ষায়। দলগত অভিনয়ের স্বার্থে তিনি এইভাবে নৈতিক চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি বলেছেন—"আমি প্রথমেই বলব যে সহযোগিতাই হচ্ছে ভদ্রতা। কেননা যখন আমাদের পারস্পরিক বিচার বিবেচনার প্রশ্ন উঠবে—তা যেন কৃত্রিম উপায়ে না হয়। তা নাহ'লে জীবনের যে কোনো স্তরে কি পরিবারে, কি সমাজে, কি নাট্যে—সর্বত্রই জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে। তিনি

কোপেনহেগেনে Royal Theatre Troupe এর সঙ্গে Ibsen-এর 'The Pretendors' নাটকে কাজ করার সময়ে এই ভদ্রতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখেছিলেন কাজে এবং ব্যবহারে।

তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় ও নিজস্ব ভঙ্গীমায় নাটক মঞ্চায়নের প্রশ্নে তিনি বলেছেন যে, তাঁর আদর্শের গভীরতা তার প্রথম দিকের পরিবেশনার মধ্যে ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে তার এই উক্তি থেকে—"১৯১১ সালে পর্দার সাহায্যে মস্কোতে Hamlet নাটক যখন পরিবেশন করেছিলাম—আমার প্রথম অভিব্যক্তি তা থেকেই প্রগতির পথে পা বাড়াল। আমার বর্তমান পরিকল্পনার রূপায়ণ আপনারা শীঘ্রই দেখতে পাবেন। আরো বেশী স্বাধীনতা, আরো বেশী ধৈর্যের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।"

সমসাময়িক মঞ্চের প্রতি Craig-এর দৃষ্টিভঙ্গী এবং তা থেকে কতখানি মুখ্য পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছিলেন—এ সমস্ত বিষয় থেকে অনেকখানি বোঝার সুযোগ রয়েছে। মঞ্চে নতুন কলাকে সংযোজন করে সমস্যাকে আঘাত করতে তিনি চান নি। নাটমঞ্চের ব্যবস্থার অসুস্থ অবস্থাগুলোকেই মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। "The Mask" এর কোনো একটা সংখ্যায় তিনি নাকি বলেছেন—"নব-আন্দোলনে যোগদানকারী আমাদের প্রচুর দায়িত্ব রয়েছে রঙ্গালয়ের আরও পরিবর্তনের ব্যাপারে। মঞ্চের পৃথিবী এখন যথেষ্ট রোগগ্রস্ত এবং সেজন্যই এর পরিবর্তনের মধ্যেই সেই রোগ মুক্তির সম্ভাবনা।"

Craig যা কিছুই লিখেছেন সেগুলিই বলেন। তাঁর লেখার মধ্যে আছে দ্রুত গতিশীল চিন্তা। কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ একটা পরিকল্পনাকে বা ছবিকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি। অবশ্য সকল সময়েই তিনি কথোপকথনের মধ্যে স্বকীয় চিন্তাকেই প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা শেষে সাক্ষাৎ-কারীর যে কি মানসিক বিভ্রান্তি ঘটে তা কল্পনা করা যায়। আলোচনা শেষ করে Quatation-এর মত তার পর পর কথাগুলি সাজিয়ে চিন্তার টুকরো টুকরো অংশগুলোকে একত্রিত করলে তবে বোঝা যায় তিনি কি চান। আমার মনে হয় আমি মোটামুটি এ কাজে কৃতকার্য হয়েছি।

কি মঞ্চ ব্যাপারে, কি দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কর্তৃত্বের প্রতি

তাঁর অসীম শ্রদ্ধা আছে। নেতাকে দলের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ এবং কল্পনা-সৃষ্টিকারী হতে হবে। দলের আর সকলেই শুধুমাত্র আদেশ ও নির্দেশ পালন করবেন। অনেকে বলেন যে, কেবলমাত্র বিশ্বাসী অনুসরণকারীর অভাবেই নিজস্ব নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা তিনি করতে পারেন নি।

স্বাভাবিক সৃষ্টি এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উত্তরাংশে অনেক গভীর চিন্তার ধারা প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও কিছুই হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চলচ্চিত্র যদিও Craig এবং Chaplin-কে একসঙ্গে আনন্দ দিচ্ছে না—কিন্তু তা Craig-এর মনেও চিন্তা করবার আগ্রহ জাগাচ্ছে। উভয় ব্যক্তিই মঞ্চের সার্থকতায় সোচ্চার—যদিও Chaplin পুরাতন গৌরবমণ্ডিত কৌতুক-কলার বর্তমান ঐতিহ্যবহনকারী।

যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ও ধারার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হচ্ছে তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং ধারণাই হবে বিদ্রোহের প্রথম পদক্ষেপ। কোনো পট-ভূমি ও পরিকল্পনা ছাড়াই হয়তো বিদ্রোহ অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

যদিও তিনি রঙ্গালয়ের থেকেও বিশ্বস্ত অনুসরণকারী দলের কথাই বেশী বলেন—তাহ'লেও লক্ষ্যে পৌছুবার জন্য ও দু'টোই তাঁর মনে বিদ্যমান ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর ধ্যান-ধারণা রূপ নিতে চলেছে বলে যে ইঙ্গিত তিনি দেন তা নাকি পৃথিবীর অনেক অংশ থেকে মাঝে মাঝে গুজবের মত শোনা যায়। যেমন Carolinas থেকে শোনা গিয়েছিল, Haly থেকে শোনা যাচ্ছে, হয়ত London বা California থেকে শোনা যাবে। তিনি Copenhagen'এ যে আদর্শ ও মাধুর্য উপলব্ধি করেছিলেন—তদনুরূপ কোনো দল এখানে নেই যা বছরের পর বছর নাটক মঞ্চস্থ করে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি আমাদের মঞ্চে কাজ করুন আর নাই করুন, আমাদের অগ্রগমনের পথে তাঁর প্রভাব আজও সর্বোচ্চরূপে পরিগণিত।

'গর্ডন ক্রেগ: দি চীফ রেভেলিউশনারী'
অনুসরণে।

মঞ্চে আলোক-সম্পাতের ক্রিয়াকাণ্ড

মূল রচনা : ডোনাল্ড ওয়েনস্লেজার
অনুসরণে : তাপস সেন

সবচেয়ে সুপরিকল্পিত মঞ্চ প্রযোজনায়ও কিন্তু আলোকসম্পাতের ব্যাপার এখন একটা ভয়ানক এলোমেলো, সময়সাপেক্ষ এবং প্রায় আদিম যুগের গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হয়। শিল্পের, বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হোক না কেন, আলোক পরিকল্পনার ব্যাপারটা কিন্তু মঞ্চে শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি নিয়ে; একটা জগদ্দল পাথরের অশ্বস্তির মতন আলোকশিল্পী ও মঞ্চ কলা-কুশলীদের ঘাড়ের ওপর চেপে থাকে।

সব ঠিক ঠাক। আগামীকাল সকালেই শুরু হবে প্রথম দৃশ্যপট এবং মঞ্চের সঙ্গে টানা রিহার্সাল। হাতে কিন্তু সময় নেই। সুচারু আলোকসম্পাত পরিচালনা করবার সময় নেই বললেও চলে। যদিও আলোকসম্পাতের কাজটা হচ্ছে সুনিপুণ, কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, ঠিক যথাসময়ে ও যথাস্থানে তার নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্ষেপণ হওয়া দরকার। যদি কেউ, যিনি এই ব্যাপারের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন, তিনি যদি আলোকসম্পাতের এই প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থিত হন, তাঁর মনে হবে যে, আলোকসম্পাতের ব্যাপারটা নেহাৎই একটা খামখেয়ালী এবং অর্থহীন। আলো বাড়ানো-কমানো, নেভানো-জ্বালানো,

রঙের অদল-বদল। এ যেন শুধুই ধৈর্যের একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু না।

নাটকীয় সূক্ষ্ম ভাবাবেগ এবং ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হয়, তার জন্য যথেষ্ট উপকরণ এখনও আছে কিনা, সেটাও ভাববার মত কথা। যখন বলা হয়, একটি দৃশ্যকে আলোকিত করা (Lighting the Scene), তার মানে এই নয় যে, শুধু দৃশ্যপট বা দৃশ্যসজ্জাকে আলোকিত করা।

আলোকসম্পাতের প্রকৃত মানে হচ্ছে, যে সব জায়গায় অভিনেতারা অভিনয় ও চলাফেরা করেন, সেই জায়গাগুলোতে প্রথমে ঠিকমত আলোক-বিন্যাস করা। মানে, অভিনেতার মুখ, চোখ এবং এ্যাকশান্ (Action) দেখাবার জন্যে আলোর প্রক্ষেপণকে অভিনয়ের জায়গাগুলোতে কেন্দ্রীভূত করা। এটা খুব স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকসময়ই এই মূল নীতিটি অনুসরণ করা হয় না। দৃশ্যসজ্জাকে প্রাধান্য না দিয়ে অভিনেতাদের আলোকিত করলেই মঞ্চ বা দৃশ্যসজ্জা আপনিই প্রতিফলিত আলোতে প্রয়োজন মতন দৃশ্যমান হবে। দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ সাধারণ মঞ্চসজ্জাই অভিনেতাদের অভিনয়াংশের প্রতিফলিত আলোতেই মোটামুটি তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। এখানে মঞ্চসজ্জা নাটকের এ্যাকশানের (Action) সঙ্গে একটা সঠিক সম্পর্কের পরিমাপ মতই দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, যে সব নাটকে বা দৃশ্যে পরিবেশের আসবাব-পত্রের আরও জোরালো ভূমিকা থাকে, সেখানে নিশ্চয়ই আলোক পরিকল্পনায় দৃশ্যসজ্জাকে তার মর্যাদা অনুযায়ী আলোকসম্পাতের প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।

আলোর সঙ্গে একটি দৃশ্যের শিল্পসম্মত আত্মিক সম্পর্কটা কি? আমরা জানি, আলো তরঙ্গের গতি নিয়ে সতত সঞ্চারমান। ঠিক তেমনিই, নাটকও তরঙ্গের মতই নিয়ত সঞ্চারমান। আলোর মতনই নাটকও কোনো সময় স্থির স্থাণুবৎ হয়ে বসে থাকে না। থাকতে পারে না। সব সময়েই নাটকের ভাবাবেগের তীব্রতা, গতি প্রকৃতি মেজাজের তারতম্য, ওঠা-নামা, একটা চলমান প্রাণস্পন্দনে আকর্ষণীয়। মঞ্চে প্রক্ষিপ্ত আলো সেই গতি এবং উচ্ছ্বাসের

অনুরণন তুলবে। অভিনেতার শারীরিক এবং মানসিক বিচিত্র টানা পোড়েনগুলোকেও কোন এক অজানা আশ্চর্য অনুভূতির স্ফুলিঙ্গে যেন এক অন্তরের আলোতে উদ্ভাসিত বা ম্লান করে তোলে।

একটা বিশেষ নাটক, কমেডি হোক বা ট্রাজেডি হোক অথবা সঙ্গীত-প্রধান তার মধ্যে একটা সতত সঞ্চারমান প্রবাহ দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে চলতে থাকে। হিসেব করে মেপেজুকে সূক্ষ্মভাবে আলোর তারতম্য ঘটিয়ে অভিনেতার অবরুদ্ধ অনুভূতির বিস্ফোরণে দর্শকের মনকে সেই অবরুদ্ধ অনুভূতির তরঙ্গে তোলপাড় করে তোলা যায়। আলোর প্রভাব নাটকের হাসি-কান্নার দোলায় যে কাণ্ড-কারখানা করে, সেটা হ'ল সূর্যের কিরণ ও আমাদের জীবনযাত্রার চেতনালোকে যে হাজারো রকম বিচিত্র প্রকাশের বৈচিত্র্য নিয়ে আসে তারই প্রতীক।

আলোর গতি প্রকৃতি ও তার নাটকীয় প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে অনুসন্ধানকরার আগে আমরা একটু পেছনে যদি যাই, যাই যদি সেই অন্ধকার ভাবলেশহীন সময়ে, যখন আমাদের পরিচিত, পৃথিবীর পরিচিত বা অপরিচিত কোনো চেহারাই ছিলনা, ছিলনা কোনো থিয়েটার, ছিলনা কোনো নাটক। অবশ্য তখনকার সেই সময়ের ঘটনাবলী খুবই নাটকীয়। মানে নাটকীয় উপকরণে সমৃদ্ধ। সে নাটকের শুরুও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। বিধাতা পুরুষ বললেন, "আলো, আলো" (Let there be light) এবং বিশ্বচরাচর আলোকবন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আলোর যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিচিত্র—তা রূপে রঙে ধরা পড়ল। আলো থেকে অন্ধকার স্বাতন্ত্র্য লাভ করল পৃথিবীর আলোয় অভিজ্ঞতায় দিন। এবং অন্ধকার হল রাত্রির রহস্যময় অজানা আশঙ্কার অভিজ্ঞতা।

সৃষ্টির সেই "প্রথম রজনীর" (Opening Night) বোধ হয় সেই সচেতন প্রথম আলোকসম্পাত এই পৃথিবীতে সেই প্রথম। এই যে আলোকসম্পাতের "প্রথম রজনী"-তে (এবং দিনেও বটে) আমাদের মঞ্চের পাদপ্রদীপে অভিনয়ের "প্রথম রজনীর-"র যে অস্থির এলোমেলো বিভ্রান্তি ছিল, হয়ত সেই প্রথম প্রত্যূষের আলোক পরিস্ফুটন রাত্রির অন্ধকারকে আলোয় মিশিয়ে দেওয়ার

হিসেব পুরোপুরি সঠিকভাবে হয় নি? ঠিক নির্ভুলমাত্রায় 'নির্ভুল কিউ'-তে (cue) আলোকশিল্পী তাঁর আলো কি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন? হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যে বিদ্যুৎরেখা জগতের নাট্যশালায় সৃষ্টি করেছিলেন নাটকে, অভিনয়ে—শব্দের সমন্বয়ে, ঝড়ের বজ্রপাতের সাউণ্ড-এফেক্টের সঙ্গে ঠিকমত তা মিলেছিল কি?

বিরামহীন একটানা ছন্দে আলোর দিন এবং অন্ধকারের রাত্রি আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে। ঠিক ট্রাফিক লাইটের আলোক সঙ্কেতের মতনই আলো আমাদের জীবনের গতিপথে কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা হয়ত কখনও কখনও সেই আলো অন্ধকারের নিয়মকেও উপেক্ষা করে নিজ বুদ্ধিতে অন্ধকারে আলো জ্বালাই এবং আলোতে অন্ধকারের সৃষ্টি করি। কিন্তু এখনও আমাদের আলোর কেরামতি প্রকৃতির আলোর যাদুকরী বিস্ময়কে টেক্কা দিতে পারে নি। সেই সব অদ্ভুত জীবন্ত সমুদ্রের অতল গহ্বরের অন্ধকার উপত্যকায় উপত্যকায় যাদের বাস, স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের মাথায় তারা তাদের নিজেদের 'হেড লাইট' (Head light), 'সার্চ লাইট' (Search light) বয়ে চলেছে। নিউজিল্যাণ্ড-এর পাথরের গুহায় অন্ধকারে এক ধরনের পোকা আছে, যারা সেই গুহার খিলানের মধ্যে তাদের ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা জ্বেলে তারা অন্ধকারের মধ্যে নিরাপদে থাকে। জোনাকীর স্নিগ্ধ আলোর জন্যে সূর্যের সঙ্গে তার কোনো বৈদ্যুতিক কনেক্‌শন্‌ (Electric Connection) করতে হয় না। মানুষ এই যে আলোর অকল্পনীয় ঐশ্বর্য ও শক্তি সূর্যের কাছ থেকে আনছে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিল না। এই, মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতেই আইজ্যাক্‌ নিউটন (Issack Newton) তাঁর ঘরের জানলার পর্দা সরিয়ে সূর্যের আলোক-রশ্মিকে একটি 'প্রিজম্‌' (Prism)-এর মধ্যে চালিত করে সূর্যের সাতরঙা আলো দেখতে পেয়েছিলেন।

আজও যে আলোর পরিচিত গণ্ডীর বাইরে আমরা খুব খানিকটা এগিয়েছি তা বলা যায় না। যদিও বিজ্ঞানের কাল এবং স্থান (Time and space), নানারকম 'থিওরী' (Theory) থাকা সত্ত্বেও সূর্যগ্রহণের সময়কার সূর্যবলয় আজও এক আশ্চর্য বিস্ময়। আজও আমরা আচমকা বিদ্যুতের আলোর

বল্‌গাছাড়া বাঁধনহীন ঝলকানিতে হতচকিত হয়ে পড়ি। সন্ধ্যার আকাশে বিচিত্র রঙীন মেঘের আলপনায় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া রঙের রেখাগুলো এক অপূর্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করে। যদিও, আমরা এখন বলতে পারি যে, কবে সূর্যগ্রহণ হবে, যদিও আমরা ল্যাবরেটারীতে (Laboratory) কৃত্রিম উপায়ে 'বিদ্যুৎ চমকানো' তৈরী করতে পারি, যদিও আমরা মেরু প্রদেশের অরোরা বোরিয়ালিস (Aurora Borialis)-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে পারি, তবু আমরা আলোর মহান্ মহিমার কাছে নিজেদের মন্ত্রমুগ্ধ করে সমর্পণ করেছি নিজেদের।

একথা তো কেউই অস্বীকার করতে পারব না যে, সূর্যই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই 'সৃষ্টির' "প্রথম প্রভাত" (First Morning) থেকে আমরা সূর্যরশ্মির সস্নেহ স্পর্শ লাভ করেছি। সূর্যের আলোই বোধ হয় একমাত্র বস্তু, যেটা কোনোরকম 'শুল্ক' বা 'মাশুল' না দিয়েই পাওয়া যায় (Universaly Tax Free)। সমস্ত পৃথিবী সূর্যের আলো এবং তার শক্তিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করছে ও বিচিত্ররূপে রঙে প্রতিফলিত করছে। আমাদের শরীরও কি গাছপালা-ফুললতা-পাতার মত অনেকখানি আলো দিয়ে গড়া নয়? আমাদের সমস্ত কিছুই যায় চলা-ফেরা, ওঠা-নামা কি আলোরই নানান প্রকারের অভিব্যক্তি নয়? চোখের জলন্ত দৃষ্টি, আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ, আবেগ কম্পিত ওষ্ঠাধর, ক্রোধে রক্তিম মুখভঙ্গি, বিস্ময়-জ্ঞানের, স্পষ্ট বিশাল সমস্ত অবয়বের মধ্যে এককথায় বলতে গেলে আলোই হ'ল মনের, ভাবের নেওয়ার—আদান-প্রদান, দেওয়া অন্যতম এজেন্ট (Agent)। আমাদের মনের অন্ধকার গহন কোণগুলোকেও আলো স্বচ্ছ করে তোলে। অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেই ঘটে সুন্দর অভিনয়, সার্থক শিল্পসৃষ্টি। আমরা কথায় বলি যে, একজন অভিনেত্রী তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়ে, তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে মঞ্চে একটি চরিত্রতে আলোকপাত করেন। তাঁর সেই অভাবনীয় ব্যক্তিত্বকে, তাঁর বিচারশক্তি ও প্রতিভার তীব্র উজ্জ্বল 'স্পট লাইটে' (Spot Light) আলোকময় করে তোলেন।

শুধু থিয়েটারেই নয়! আলো চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং স্থপতিবিদ্‌দের (Painter, Sculptors & Architect) কাছে এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

রেমব্রাণ্ট (Rembrant), ভ্যানগগ্ (Vangogh) তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে আলোর নতুন নতুন ম্যাজিক (Magic) দেখিয়েছেন। বহু নাম না জানা ভাস্কর অপ্সরার নৃত্যচঞ্চল মূর্তি খোদাই করে গেছেন মন্দিরের প্রাঙ্গনে, গাত্রে এবং গুহার দেওয়ালে। এই সমস্ত পাথরের স্থির সৃষ্টি মুহূর্তে কম্পমান আলোকরশ্মিতে মেঘলা দিনের আবছায়াতে নৃত্যচঞ্চল হয়ে ওঠে।

স্থাপত্যশিল্প ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে নিয়ত পরিবর্তনশীল আলোকসম্পাতে। একই সূর্যের কিরণসম্পাত বিভিন্ন আবহাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মিশরের পিরামিড (Piramid), জাভার বোরবুদুড় (Barabudur), ভেনিসের সাণ্টামারিয়া (Santamaria) ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়াল (Linclon Memorial), আগ্রার তাজমহল (Taj Mahal), কোণারকের সূর্যমন্দির (Sun Temple), নিজ নিজ বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে মানুষের মনকে, চোখকে হৃদয়কে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে রেখেছে। এই সব চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি আলোর নানান অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আলোকে তাঁরা গতি এবং ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন। আলোর স্পর্শে মর্মরে, ব্রোঞ্জে, কাঠে, তুলির রঙে তাঁরা প্রাণসঞ্চার করেছেন। এই যে স্থাপত্যে, চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যে আলোর ব্যঞ্জনা—আমাদের মঞ্চের নাটকের ক্ষেত্রে আলোর কল্পনাকে এরাই সম্ভব করেছে।

আলোর সেই অনির্বচনীয় অনুরণনের ক্ষমতাকে মঞ্চে হাজির করা হ'ল। সাহসের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে, শিল্পীর, স্থপতির, কবির কল্পনাকে কাজে লাগানো হ'ল, ঠিক যেমন করে তুলি বা ছেনির ব্যবহার হয় তেমনি করেই আলোকশিল্পীর সঙ্গে মিলে আলোকে ধরে তাকে মুক্তি দিতে হবে গতিসৃষ্টির জন্য। আলোর আল্পনায় নতুন নতুন প্যাটার্ন (Pattern) তৈরী হবে। আলোকে ফাঁকা স্টেজের মধ্যে নানাভাবে—দৃশ্যমান আলো, উত্তপ্ত আলো, স্নিগ্ধ আলো, কালো আলো (অন্ধকার) নব নব সজ্জায় মঞ্চকে প্রচলিত করুক। সব সময় মনে রাখতে হবে ম্যাজিক (Magic) হচ্ছে থিয়েটারের মূলমন্ত্র। এবং থিয়েটার মানুষের কল্পনাকে রূপ দেবার ল্যাবরেটারীও (Laboratory) বটে। নাট্যকারকে আলোর নতুন নতুন

ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। অভিনেতার চোখে জ্বলবে নতুন আলো, দৃশ্যপট হয়ে উঠবে জীবন্ত।

আচ্ছা, এত সব কাণ্ডকারখানা এত দৃশ্যে গতি, চাঞ্চল্য সেই পুরনো ধরনের সুইচ বোর্ড (Switch Board) দিয়ে কি সম্ভব? আলোর ওপর আমাদের আরও বেশী করে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করতে হ'লে এই সব সাবেকি সুইচ-বোর্ড (Switch Board) দিয়ে কখনই সম্ভব নয়। তার জন্য উন্নততর আর সূক্ষ্ম এবং নিপুণ কার্যক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন।

আলো আজ আর শুধু দৃশ্যকে বা অভিনয়কেই শুধু দৃশ্যমান করে তোলার জন্য নয়। আলোর নতুন সংজ্ঞা শুধুই দেখানোর জন্য নয়। অনুভূতি, আবেশ আবেগ ও সম্পর্কের জটিলতর রহস্যগুলোকে নব নব অর্থে উদ্ভাসিত করে তোলার নামই হল "আধুনিক আলোকসম্পাত" (Modern Lighting)। আজকে থিয়েটারের আলোর যে ভূমিকা, বর্তমানে যান্ত্রিক উপকরণে হয়ত পুরোপুরি পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আগামীকালের আলো নিয়ন্ত্রণই সেই প্রথম প্রভাতের আলোকের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেদিন হয়ত আলোকসম্পাতের প্রাথমিক কাজগুলো আজকের মতন এত অস্থির, এত এলোমেলো ও পরিকল্পনাহীন বলে মনে হবে না।

'লেট দেয়ার বি লাইট'

অনুসরণে

লেখক পরিচিতি

ক.

হাওয়ার্ড লিণ্ডসে: বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেতা, নাট্যকার এবং প্রযোজক। সুদীর্ঘকাল ধরে লিণ্ডসের সৃষ্টিশীল প্রতিভা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 'লাইফ উইথ ফাদার' এবং 'লাইফ উইথ মাদার' তারই অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উমানাথ ভট্টাচার্য: কেবল জনপ্রিয়তাই নয়, শক্তিমান নাট্যকার হিসাবেও পরিচিত। 'ঠগ', 'জল', 'নীচের মহল' প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখ্য নাটকের রচয়িতা। শ্রীভট্টাচার্য একজন নামকরা অভিনেতা ও সুদক্ষ পরিচালকও বটেন।

আর্নল্ড ওয়েস্কার: জনৈক দর্জির পুত্র। বয়স এখন তেত্রিশের মতন। জীবনে বহু বৃত্তি অবলম্বন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 'দি কিচেন' তাঁর প্রথম নাটক। জনপ্রিয়তা ও সমালোচকদের দৃষ্টি একইসঙ্গে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তাঁর 'চিকেন সুপ উইথ বার্লি' নাটকের মাধ্যমে। 'দি রুটস', 'আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম' তাঁর পরবর্তী নাটক।

অমিতা রায়: আগে গল্প কবিতা প্রবন্ধ রচনা করতেন। নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ আছে। সম্প্রতি শ্রীমতী রায় একটি বিদেশী নাটকের বঙ্গরূপ প্রকাশ করেছেন। নাটকটির নাম 'নাম-না-জানা তারা'।

জাঁ পল সার্ত্র: দর্শনের অধ্যাপক, দার্শনিক এবং একালের স্মরণীয় প্রতিভাধর, অটুট মনোবলসম্পন্ন সাহিত্যিক। বহু অবিস্মরণীয় ছোটগল্প

উপন্যাস ও ব্যক্তিগত ভাবনার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল প্রবন্ধের রচয়িতা। সম্ভবত সাত্র্´ই প্রথম সার্থক নাট্যকার। অস্তিত্ববাদ আন্দোলনের প্রবর্তক-নেতা সাত্রে´র সাম্প্রতিক উল্লেখ্য নাটক 'লুজার উইন্স'।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস: শক্তিমান নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। নাট্যরচনা প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বাসের ভাবনাটি স্বতন্ত্র। তত্ত্বমূলক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনার দিতে ঝোঁক। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে এঁর অধিকাংশ নাটক রচিত। প্রকাশিত নাটক 'আমার মাটি' 'জননী', প্রভৃতি।

পল গ্রীণ: উত্তর ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ছোটগল্প, উপন্যাস রচনার সুদক্ষ হাতে তিনি অনেকগুলি সার্থক নাটকও রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'ইন আব্রাহামস বসম্' ১৯২৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিল। পরবর্তীকালের উল্লেখ্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'দি হাউস অব কন্নেলী' এবং 'দি লস্ট কলোনী'।

অঞ্জলি লাহিড়ী: অধ্যাপিকা এবং অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবনে নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর সহধর্মিণী। নাটকের একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর গবেষণারত।

জন বোয়েন: ১৯৩৪ সালে কলকাতায় জন্মেছিলেন, এখন লণ্ডনে আছেন। 'দি ট্রুথ উইল নট হেল্প্ আস', 'আফটার দি রেইন' প্রভৃতি চারটি উপন্যাস রচনা করে একালের একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। নাটক লেখেন পরে। উল্লেখ্য দু'টি নাটক: 'এ হলি-ডে এ্যাব্রড', 'দি এসে প্রাইজ'।

মনোজ মিত্র: বয়সে তরুণ, পেশা অধ্যাপনা। এ-দশকের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার। সুঅভিনেতা হিসেবেও মনোজ পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত প্রতিটি নাটক স্বতন্ত্র শিল্পভাবনার পরিচয় রয়েছে। প্রথম প্রকাশিত নাটক: নীলকণ্ঠের বিষ। পরে প্রকাশিত হয়েছে 'অবসন্ন প্রজাপতি' ও 'বেকার বিদ্যালঙ্কার'।

জন অসবোর্ন: ১৯৫৬ সালের ৮ই মে তারিখে অভিনীত যে নাটককে আধুনিক বৃটিশ থিয়েটারের কাল-বদলের মাধ্যম ধরা হয় তার নাম 'লুক ব্যাক ইন

অ্যাঙ্গার'। অসবোর্ন একজন সার্থক অভিনেতা এবং একটি প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। পরে অসবোর্নের প্রতিটি নাটক ভিন্নতর জাগরণ ও বিপ্লব আনে। এর মধ্যে রয়েছে 'দি এনটারটেনার', 'দি ওয়ার্ল্ড অব পল স্লিকি'। 'লুথার' তাঁর সাম্প্রতিক নাটক।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য : পেশা অধ্যাপনা, বয়সে তরুণ। সাহিত্যে সুবন্ধুর প্রথম পরিচিতি আধুনিক কবি হিসাবে। পরে প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান সাহিত্য এবং নাটকের ক্ষেত্রে। হালে ইনি কয়েকটি সুন্দর ছোট নাটক (একাংক) রচনা করেছেন। এঁর ভাবনা বৈপ্লবিক।

ধ.

ডায়োঁ ব্যোসিকা : পুরো নাম ডায়োঁনাইসিয়াম লাডনার ব্যোসিকা। ব্যোসিকা খুব অল্প বয়সে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর 'লণ্ডন এস্যুরেন্স' নাটক ২০ বছর বয়সেরও আগে লেখা। এ সময় থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল ইনি ইংলিশ স্টেজে একটানা প্রভুত্ব করে গেছেন। ১৮৫৭ সালে তিনি প্রথম অভিনেতা হিসাবে আবির্ভূত হন, পরে স্টেজ ম্যানেজার। বহুবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অভিনয় করেছেন। সেখানেও এঁকে নিয়ে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

বিভুতি মুখোপাধ্যায় : প্রথম জীবনে গল্প কবিতা লিখতেন, পরে নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। নাট্যসাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য সম্প্রতি ডক্টরেট পেয়েছেন। নাট্যাভিনয় ও নির্দেশনাজনিত বহু রচনার লেখক। এঁর প্রকাশিত নাটক : 'পাকেচক্রে', 'অমৃত যন্ত্রণা', নাট্যকলা বিষয়ক গ্রন্থ 'অভিনয় প্রযোজনা পরিচালনা' এবং 'মহলা ও মঞ্চ'।

রবার্ট লুইস : বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যপরিচালক। নাট্যকলায় প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক হিসাবে স্বীকৃত, স্তানিস্লাভস্কি নাট্যরীতি ও থিয়োরীর ওপর এঁর গবেষণা যেমন বিশ্ববিখ্যাত তেমনি স্বকীয় রীতি প্রবর্তনার দিক থেকেও বিশিষ্ট। নির্দেশক হিসেবে এঁর প্রতিটি নাট্যোপহারই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত 'টী হাউস অব

অগাষ্ট মুন', 'বিগ্রাডুন', 'ক্যাণ্ডিড', 'মাই হার্টস ইন দি হাইল্যাণ্ড' ও 'দি হ্যাপী টাইম'।

অতনু সর্বাধিকারী: ছোটগল্পকার ও শক্তিশালী নাট্যকার। কয়েকটি সার্থক ছোট নাটক (একাংক) লিখে ইনি আলোকে আসেন। পরে তাঁর কয়েকটি বড় নাটক অভিনীত হয়। বয়সে তরুণ অথচ দর্শনের অধ্যাপক। এঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক 'লঘু-গুরু'।

সিড্রিক হার্ডউইক: মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে লণ্ডনে অভিনেতা হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার কাল থেকেই ইনি নাট্যামোদীদের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বার্মিংহাম থিয়েটারে তাঁর অভিনীত প্রতিটি নাটকের চরিত্রই প্রকৃত সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। রঙ্গমঞ্চের মতন, চলচ্চিত্রেও ইনি প্রভূত জনপ্রিয়।

অরুণ রায়: মিনার্ভা রঙ্গগৃহে যখন 'ফেরারী ফৌজ' মুক্তি পেল, সেদিন থেকেই ইনি দর্শকমন জয় করে নেন। এবং অরুণ এই প্রথম আলোকে আসেন। মিনার্ভা মঞ্চ থেকে সরে এসে বর্তমানে ইনি আর একটি নতুন নাট্যসম্প্রদায় গঠনে উদ্যোগী। পরিচালনা ও প্রযোজনার ব্যাপারে অরুণ রায় আধুনিক পথের অনুসারী।

স্যার মাইকেল রেডগ্রেভ: বৃটিশ নাট্যকলার ক্ষেত্রে এক মহান শিল্পী হিসেবে ইনি শ্রদ্ধেয়। সুদীর্ঘ ২৭ বৎসরের অভিনেতা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এর মধ্যে অবিস্মরণীয় সৃষ্টির মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে 'দি এ্যাকটরস ওয়েজ এণ্ড মীন্‌স' এবং 'মাস্ক অব ফেস'।

বিমল রায়: অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। নিষ্ঠাশীল নাট্যকার। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দ্বাদশাধিক নাটক প্রকাশ করেছেন। অভিনেতা পরিচালকরূপেও বিমল সুপরিচিত। এঁর প্রকাশিত উল্লেখ্য নাটক 'অভিনয়,' 'বিশুর বিয়ে', 'অসমাপ্ত', 'শেষের পরে' প্রভৃতি।

স্যার আলেক গিনেস: বৃটিশ মঞ্চের এক সুমহান শিল্পী। অভিনেতা

হিসাবে রেডগ্রেডের মতনই তিনি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধার পাত্র। আজ থেকে প্রায় ৪০ বৎসর আগে ইনি মঞ্চে আবির্ভূত হন। সেদিন থেকেই ইনি প্রকৃত চরিত্রস্রষ্টা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। মঞ্চের মতন চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসাবেও এঁর সমান খ্যাতি রয়েছে।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী : এই দশকের অন্যতম শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে ইনি স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তক ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। একটিমাত্র নাটক লিখেছেন, যা নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্ররীতির প্রবর্তন করতে চলেছে। পেশা সাংবাদিকতা। 'প্রজাপতির রঙ', 'প্রথম পরশ' প্রভৃতি এঁর গল্পগ্রন্থ। প্রকাশিত উল্লেখ্য উপন্যাস : উপকণ্ঠ, অতসী, দিবস রজনী ও নিশিরঙ্গ।

উইলিয়াম জিলেট : যেমন যশস্বী নাট্যকার, তেমনি অভিনেতা হিসাবেও ইনি অত্যন্ত বিখ্যাত ; এ দু'টোই বৃটিশ মঞ্চকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী করেছে। জর্জ মারলিসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়, তামাম ইংরেজী জানা জগতে জিলেট একটি অবিস্মরণীয় নাম।

রমেন লাহিড়ী : অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্বমূলক নাট্যরচনায় অধিকতর আগ্রহী। রমেন জানেন, কোন সৃষ্টি নাট্যকারকে অমর করে। ফলতঃ এঁর নাটক বিদগ্ধ মহলেও সমাদৃত। অভিনেতা হিসাবে ইনি যেমন বিখ্যাত, তেমনি নাট্যপরিচালকরূপেও সুদক্ষ। এঁর প্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে অলুকদ্বন্দ্ব, ঢেউ, পরোয়ানা, শততম রজনীর অভিনয় প্রভৃতি উল্লেখ্য।

এ্যালবার্ট ফিন্নে : বত্রিশ বছর বয়স্ক সুদক্ষ ও সুদর্শন অভিনেতা। বৃটিশ ড্রামাটিক স্কুলে ইনি অভিনয় শিক্ষা করেন। ১৯৫৮ সালে চার্লস লটন-এর সঙ্গে 'দি পার্টি' নাটকে অভিনয় করেছিলেন প্রথম। পরে শ্রীলটনের সঙ্গে স্ট্রাটফোর্ড অন আভনে প্রায় সকল শেক্সপিরীয় নাটকে অভিনয় করে অসম্ভব খ্যাতিলাভ করেন।

ভুলেন্দ্র ভৌমিক : ছোটগল্পকার। নাট্যকার হিসাবেও পরিচিত। ব্যঙ্গাশ্রয়ী ও মননশীল নাট্যরচনাতে উৎসাহী। এঁর 'অথ কিম

নাটকের অভিনয় সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। পরে ইনি আরও কয়েকটি সুন্দর নাটক লিখেছেন।

ওটিস স্কিনার: যশস্বী অভিনেতা। শেক্সপিরীয়ান নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্ররূপকার হিসাবে ইনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে ইনি বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বীরু মুখোপাধ্যায়: সুদীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত নাট্যকার। জনপ্রিয় নাট্যকারদের মধ্যে ইনি পুরোভাগে রয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি পেশাদারী পরিচালক। অভিনেতারূপেও বীরুর সুনাম রয়েছে। বহু নাটকের রচয়িতা এই নাট্যকারের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক: রাহুমুক্ত, সংক্রান্তি, চারপ্রহর প্রভৃতি।

আথেঁ স্কেলর: ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতম মহিলা কৌতুকাভিনেত্রী। 'হুজ হু ইন দি থিয়েটার' গ্রন্থে স্কেলরের শ্রেষ্ঠতম অভিনীত নাটকের তালিকা দিতে পুরো চারটি পৃষ্ঠা লেগেছে। এই মহিলা কমেডিয়ান অভিনয়ের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'দি ক্র্যাফট অব কমেডি' উল্লেখ্য।

মনোজ মিত্র: পূর্ব অংশে দ্রষ্টব্য

গ.

জন ভন ক্রুতেঁ: বলিষ্ঠ, শক্তিশালী নাট্যকার। বৃটিশ মঞ্চে বহু উৎকৃষ্ট নাটক উপহার দিয়ে ক্রুতেঁ অসংখ্য অনুগামীর সৃষ্টি করেছেন যেমন, তেমনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়র সম্মান পেয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করেন। 'ইয়ং উডলে', 'দি দামাস্ক চিক', 'দি ভয়েস অব টারটল' এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

দীপক রায়: যে নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করে, শিবরাম চক্রবর্তীর সেই নাটক 'যখন তারা কথা বলবে' পরিচালনা করে ইনি সমালোচক ও দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দীপক আবার নতুন নাটক নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন। ইনি এক নতুন স্ফুলিং প্রবর্তনার অন্যতম অংশীদার।

হেরম্যান রীচ আইজ্যাকস্‌ : এঁর খ্যাতি মূলত অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবে। 'থিয়েটার আর্টস' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন। নাটকের ওপর বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা আইজ্যাকস্‌ লিখেছেন। নাট্যাভিনয়কেই ইনি শ্রেষ্ঠতম শিল্পরীতি মনে করেন।

বিদ্যুৎ গোস্বামী : দক্ষ অভিনেতা হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে ইনি সুপরিচিত। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহ ও কণ্ঠমাধুর্য এঁর সম্পদ। পরিচালক হিসাবে ইনি অগণন দর্শক ও বিদগ্ধ সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। সম্প্রতি একটি বিশিষ্ট দলে যোগ দিয়ে ইনিও অভিনয়ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্ফুলিং প্রবর্তনার অংশীদার হয়েছেন।

স্টেলা এডলার : গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুকাল। অভিনেত্রী হিসাবে আবির্ভূত হবার পর থেকেই অজস্র নাট্যামোদীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। স্টেলার বাবা এবং মাও ছিলেন নাট্যশিল্পী। চলচ্চিত্র ও ব্রডওয়েতে বহু অভিনয় করেছেন।

ভরত আচার্য : জনৈক বিখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকারের ছদ্মনাম।

মার্গারেট ওয়েবস্টার : যশস্বী অভিনেত্রী। মার্গারেট ইংলণ্ডের প্রাচীন অভিনেতৃ পরিবারের কন্যা, কিশোরীকাল থেকেই অভিনয়কলার সঙ্গে যুক্ত। বৃটিশ নাট্যামোদীদের হৃদয় জয় করে ইনি আমেরিকায় চলে আসেন। এখানে তিনি শেক্সপিরীয়ান নাটকের বিখ্যাত পরিচালকরূপে স্বীকৃত।

শোভা সেন : অভিনেত্রী। মঞ্চে প্রথম আবির্ভাবকাল থেকেই ইনি সুচিহ্নিত ও একটি বিশিষ্ট প্রতিভারূপে স্বীকৃত। বহু চলচ্চিত্রে উল্লেখ্য চরিত্রসৃষ্টি করার পর শ্রীমতী সেন আবার মঞ্চে আসেন। এখানেও তিনি সমান শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা প্রযোজক পরিচালক উৎপল দত্তর সহধর্মিনী।

রবার্ট লুইস : পূর্ব অংশে দ্রষ্টব্য

সমরেশ মজুমদার : মূলত ছোটগল্প লেখক হিসাবে পরিচিত। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠবার্ষিক বাংলার ছাত্র। কয়েকটি নাটক অভিনয় করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

রবার্ট এডমাণ্ড জোন্স : সিন ডিজাইনার হিসাবে জোন্স সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা কুড়োতে পেরেছেন। তাঁর অতুলনীয় শিল্পভাবনার দক্ষ প্রকাশ ঘটেছে 'দি জেষ্ট', ব্যারিমুরের 'হ্যামলেট', 'মরনিং বিকামস ইলেকট্রা' নাটকের মঞ্চস্থাপত্যে। ও-নীলের নাটকগুলির তিনি প্রায় একচ্ছত্র পরিচালক। বিখ্যাত গ্রন্থ : 'দি ড্রামাটিক ইমাজিনেশন'।

কিরণ মৈত্র : হাল আমলের জনপ্রিয় নাট্যকারদের মধ্যে শীর্ষস্থানাধিকারী, বহু নাটকের রচয়িতা, এক পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত। কিরণের কয়েকটি সার্থক ছোট নাটক (একাংক) তাঁকে সুচিহ্নিত করেছে। অভিনেতা পরিচালকরূপে সুখ্যাত। বারো ঘণ্টা, সংকেত, নাম নেই, বিশ পঞ্চাশ, তৃষ্ণা, গ্রহের ফের প্রভৃতি এঁর উল্লেখ্য নাটক।

অ্যাডলফ আপিয়া : শিল্পী এবং দার্শনিক। মঞ্চের দৃশ্যাঙ্কনে সারা পৃথিবীতে ওঁর জুড়ি নেই। স্পেস-সেট-এর প্রবর্তক। মঞ্চ ও মঞ্চ-স্থাপত্য বিষয়ে লেখা এর বিভিন্ন রচনা বিশ শতকের মঞ্চের ক্ষেত্রে ব'লষ্ঠ বিপ্লব আনে।

দুর্গা গোস্বামী : ছোটগল্প রচনায় উৎসাহী। নাট্যকলায়ও এঁর প্রচুর আগ্রহ আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা পরিচালক বিদ্যুৎ গোস্বামীর স্ত্রী। নাটকের ওপর পড়াশুনা করছেন।

***জর্জ ডিভাইন :**

শংকরদাস বাগচী : পেশায় আইনজীবী যদিও তবু সমগ্র বাংলা দেশে এঁর খ্যাতি জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে। নাট্যরচনায় বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে ইনি স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। 'ভবিষ্যৎ ভারত' ও 'মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ' এঁর রচিত নাটক।

মর্টন ইউস্টিস : প্রথম জীবনে ইউস্টিস একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরে ১৯৩৩ সাল থেকে '৪২ সাল অবধি 'থিয়েটার আর্টস' পত্রিকাটি

সম্পাদনা করেন। বহু উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রবন্ধের রচয়িতা। ১৯৪৫ সালে ফ্রান্সে আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ হাল আমলের অপেশাদারী মঞ্চে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' পরিচালনা করে। অভিনয় ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই ইনি খ্যাতি লাভ করেছেন। অজিতেশ তাঁর দ্বিতীয় নাট্যোপহার 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'র নির্দেশনায় তার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পেশা শিক্ষকতা। সম্প্রতি ইনি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করতে আরম্ভ করেছেন।

ঘ.

রিচার্ড পিলব্রাউঃ বৃটিশ মঞ্চস্থাপত্যের ইতিহাসের পিলব্রাউ এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। সুদীর্ঘকাল এই কর্মে নিয়োজিত থেকে যে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তারই ছায়া পড়েছে তাঁর অমর রচনা ও গ্রন্থসমূহে। মঞ্চস্থাপত্যে তিনি আধুনিক ভাবনার অন্যতম প্রবর্তক।

সুনীত মুখোপাধ্যায়ঃ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। কয়েকটি সুন্দর ছোট নাটক রচনা করেছেন। বড় নাটকও লিখেছেন। অভিনেতা কয়েকটি নাটকও পরিচালনা করেছেন। এঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক 'পঞ্চমিত্র'।

শেল্ডন চ্যিনিঃ 'থিয়েটার আর্টস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। থিয়েটার প্রসঙ্গে শেল্ডন বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'দি থিয়েটার—টু থাউজেণ্ড ইয়ার্স' উল্লেখ্য। আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গেও ইনি গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

বরুণ দাশগুপ্তঃ সুখ্যাত নাট্যপরিচালক, অভিনেতা পরন্তু বরুণ মূলত একজন সুপরিচিত অংকন ও চিত্রশিল্পী। বহু সার্থক নাটকের পরিচালক। সম্প্রতি এঁর পরিচালিত রসরাজের 'বাবু' অগণন দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

আরভিং পিচেলঃ

কৃষ্ণা ভট্টাচার্যঃ কবিতা লেখেন, লেখায় হাতটি খুব ঝরঝরে; দক্ষ

অভিনেত্রীও বটেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক বাংলার ছাত্রী ছন্দা নানাদিক থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয়।

চারু খান: অঙ্কনশিল্পী ও চিত্রীরূপে সুপরিচিত। বয়সে তরুণ চারু মঞ্চস্থাপত্য প্রসঙ্গে কিছু স্বতন্ত্র ভাবনা ভাবছেন। এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি মনোনিবেশ করছেন।

ডি ওয়েনস্লেজার: ব্রডওয়ের সব চাইতে ব্যস্ত ও সৃষ্টিশীল মঞ্চস্থপতি। 'ইয়েল স্কুল অব ড্রামা' শিক্ষায়তনের ইনি অধ্যাপক। ডোনাল্ড ওয়েনস্লেজার একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ও আলোর কারিগররূপে বিশ্ববিখ্যাত।

তাপস সেন: প্রথাগত নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে তাপসের আগমন। মূলতঃ মঞ্চের আলো গবেষক ও বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হ'লেও, মঞ্চস্থাপত্য বিষয়ে এঁর জ্ঞান এবং বোধ প্রচুর। 'অঙ্গার' নাটকে আলোর কাজের অভিনবত্ব ও সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করে ইনি তাঁর প্রথম প্রতিভার পরিচয় দেন।

*চিহ্নিত নামগুলির পরিচয় সঠিক জানা যায় নি